রসময় শ্রীরামকৃষ্ণ

অজয় দাশগুপ্ত

বুক হোম
৩২ কলেজ রো, কলিকাতা ৭০০ ০০৯

প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৩৮

প্রকাশক :
বিশ্বজিৎ মজুমদার
গ্রন্থগৃহ
২২ সি কলেজ রো, কলকাতা ৯

মুদ্রক :
হীরালাল মুখোপাধ্যায়
কন্‌টেম্পোরারী প্রিণ্টার্স
১৩ কলেজ রো, কলকাতা ৯

প্রচ্ছদ :
সুবোধ দাশগুপ্ত

রসময়

শ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন লীলা যেমন গভীর তেমনি ব্যাপক। সামান্য মানুষের পক্ষে তার পরিমাপ করা কল্পনার বাইরে। মানুষের মধ্যে তিনি প্রকাশিত হয়েছেন অতি-মানবীয় প্রেক্ষাপটে—যদিও নিজেকে কখনো প্রচার করবার জন্য সামান্য চেষ্টা করেন নি। ভক্ত ও পারিপার্শ্বিক সকলকে তিনি যে সব উপদেশ দিয়েছেন তাও বিচিত্র। তিনি বলেছেন, যত মত তত পথ। কোনো পথ সম্পর্কেই তাঁর আগ্রহ কম ছিল না। এই উপদেশ দানের ভঙ্গিটিও অনবদ্য। কোনো শাস্ত্রবাক্য নয়—নীরস ধর্মকথা- বা আচার-আচরণ নয়; তা শুধু পরিপূর্ণ ছিল অমৃত-রসে। সহজ সরল কথা, স্বাভাবিক উপমা, লঘু গল্পকথা। যার ভেতর কত না মজার উপাদান। এই গ্রন্থে শ্রীরামকৃষ্ণর লীলা জীবনের অমৃত রসকথা ও কাহিনীকেই তুলে ধরা হয়েছে স্বচ্ছ প্রতিবিম্বে। এই একটি গ্রন্থ পড়লেই সকলে সেই রসের সাগরে অবগাহন করে তৃপ্ত হতে পারবেন। গ্রন্থটি রচনার জন্য জীবনী রচয়িতা পূর্ববর্তী গ্রন্থকারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা রইল অপরিসীম।

গ্রন্থকার

শ্রীমতী স্নেহলতা সেনগুপ্ত

পরম শ্রদ্ধাস্পদাসু
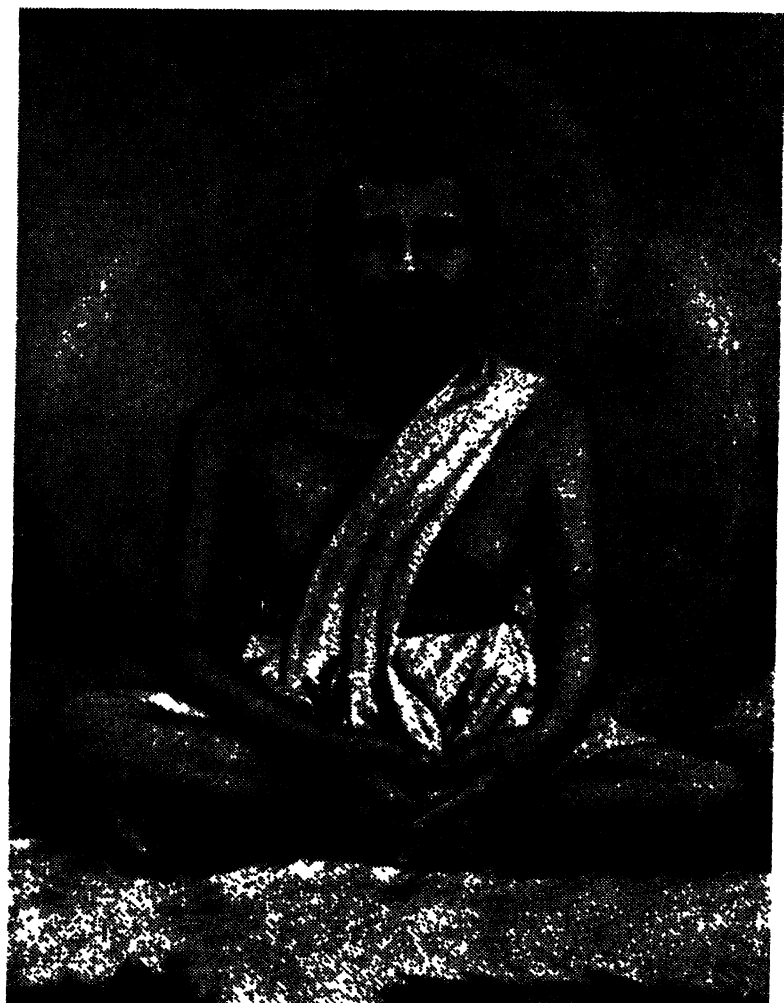
সাধক বা যোগীদের কথা মনে পড়লেই তাঁদের একটা ভাবগম্ভীর রূপ আপনা থেকে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সংসারত্যাগী সাধু মাত্রই স্বল্পবাক্, উদাসীন, সমস্ত কিছু থেকে নির্লিপ্ত। দক্ষিণেশ্বরের পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত।

শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর জীবন এক আশ্চর্য লীলায় ভরা। তিনি সাধক কিন্তু গম্ভীর নন, তিনি সংসারের সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে অথচ সংসার সীমানার মায়ার মধ্যে তাঁর জীবন কাটিয়ে গেছেন। সমস্ত জগৎকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন, মানুষকে পরিহার করে ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটে না বরং মানুষের মধ্যে থেকে ত্যাগ দয়া আর ভক্তি দিয়ে ভগবান হওয়া যায়। শিষ্যদের তাই বার বার তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, ঈশ্বর সর্বত্র আছেন। তাঁকে পেতে হলে দূরে যাবার দরকার নেই।

শ্রীরামকৃষ্ণ অনর্গল কথা বলেছেন ভক্তসঙ্গে। তাঁর মুখ দিয়ে বেদ-বেদান্ত সনাতন হিন্দুধর্মের সব কিছু ঝরনার মতো বেরিয়ে এসেছে। অথচ এই শাস্ত্রকথা তিনি বলেছেন সহজে, সরলভাবে। ভক্তদের বুকের মধ্যে রসিয়ে রসিয়ে তা গেঁথে দিয়েছেন সহজ উদাহরণ দিয়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন রসিক। রসের সমুদ্র। তাঁর পরিহাসপ্রিয়তা দিয়েছে সমস্ত ভক্তজনকে নির্মল আনন্দ অজস্র ধারায়। লোককথা লোক-পরিচিত দৃষ্টান্ত তুলে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। শাস্ত্রবাক্যকে সহজপাঠ্য করেছেন তাঁর অপরিমেয় বোধ দিয়ে।

তিনি রসের সাগর হয়ে বিরাজ করেছেন। সেই সাগরে ভক্তদের স্নান করিয়ে তাদের ভিতর ও বাহিরকে ধুইয়ে দিয়েছেন অনায়াস সরলতায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রাম-বাংলার মানুষ। প্রকৃতির মধ্যেই ছিল তাঁর বিচরণ। সেখান থেকেই জ্ঞান আহরণ করেছেন তিনি। তথাকথিত শিক্ষা, বা পুঁথিগত বিদ্যা, তা তাঁর ছিল না। অথচ সমস্ত জ্ঞান যেন সঞ্চিত ছিল তাঁর অন্তরে। সেই জ্ঞান তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন লোকশিক্ষার জন্য, ভক্তদের জন্য, হিন্দু-ধর্মকে বিশ্বজনীন করবার জন্য।

হুগলী জেলার কামারপুকুর গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব হয়। ১২৩৯ সালের ফাল্গুন মাসের ১০ তারিখে তিনি এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। দিনটি ছিল বুধবার। তাঁর পিতার নাম ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়। মার নাম চন্দ্রমণি দেবী। পিতা ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। মা ছিলেন দয়া আর সরলতার জীবন্ত প্রতিমা।

ছেলেবেলায় শ্রীরামকৃষ্ণের নাম ছিল গদাধর। অন্যান্য বালকের মতো তাঁকেও পাঠশালায় পাঠানো হয়। কিন্তু লৌকিক লেখাপড়ায় তাঁর মন ছিল না। তাই পড়াশুনা বেশি এগোয় নি। পাঠশালা ছেড়ে বালক বয়সেই তিনি গৃহদেবতা রঘুবীরের পুজোয় মন দেন।

জীবনের সমস্ত পর্যায়কে, ধর্মের সমস্ত কথাকে রস মিশিয়ে পরিবেশন করতেন তিনি। পাঠশালার স্মৃতিকে তিনি বলেছেন, 'শুভঙ্করী ধাঁধাঁ লাগত'। বইপত্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছোটবেলা থেকে না থাকলেও তিনি ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী। ভাল গান গাইতেন। যাত্রা শুনে শুনে সেই গান তুলে সকলকে শোনাতেন।

সাধু-সন্ন্যাসীর প্রতি তাঁর একটা সহজাত আকর্ষণ ছিল। বাড়ির পাশে ছিল ধনী লাহাদের অতিথিশালা। সেখানে বহু সাধুরা আসতেন। বালক শ্রীরামকৃষ্ণ সেই সাধুদের সেবা করতেন। তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। সাধুরা যা বলতেন নিবিষ্ট মনে তাই শুনতেন। তাঁর গ্রহণ ক্ষমতা ছিল অকল্পনীয়। সাধু-সন্ন্যাসীর মুখে যোগশাস্ত্রের কঠিন বিষয়গুলি তিনি অনায়াসে মনের মধ্যে নিয়ে নিতেন। এছাড়া কথকদের মুখে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত শুনে শুনে সমস্ত মুখস্ত

করে ফেলেছিলেন।

ভক্ত সঙ্গে শিক্ষাদানকালে এই জমা করা সমস্ত জ্ঞান উজাড় করে দিয়েছেন অপূর্ব রস মিশিয়ে। রসিক না হলে রসের সমুদ্রে ডুব দেওয়া যায় না। ঈশ্বর তাঁর কাছে রসের মহাপাত্র—তিনি মহানন্দে সেই রস পান করেছেন। শুধু নিজে পান করেন নি, ভক্তদেরও পান করিয়েছেন। খুব কঠিন তত্ত্বকে পরিহাসের লঘুতায় অবিশ্বাসীর মনে ঢুকিয়ে দিতেন। ঘোর নাস্তিককেও তিনি আস্তিক করে তুলতে পেরেছেন তাঁর এই মনোরম অমৃতবাণী দিয়ে।

যে সময়ে পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ বাংলাদেশে আবির্ভূত হন তখন একটা বিরাট পরিবর্তন চলছিল। হিন্দুধর্মে কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরিবেশ থেকে য়ুরোপের শিক্ষায় শিক্ষিত একদল বাঙালী মুক্তি পাবার জন্য টগবগ করে ফুটছে। রাজা রামমোহন প্রদর্শিত ব্রাহ্ম-ধর্মে উদ্দীপিত হচ্ছিল শিক্ষিত বাঙালীরা। তাঁদের ধারণা, হিন্দুধর্ম শুধু পুতুল পূজা মাত্র—পশ্চিমের বিজ্ঞান চিন্তাই বিশুদ্ধ জ্ঞান।

সেই হিন্দুধর্ম বিমুখ বাঙালীদের স্বধর্মে ফিরিয়ে আনবার জন্যই বুঝি শ্রীরামকৃষ্ণ জন্ম নেন। সনাতন হিন্দুধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠায় তাই তাঁর দান অনন্য। তথাকথিত পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা একাজ হত না। তাই নিরহঙ্কার ভগবানরূপী এই গুরু অশিক্ষিতের ভান নিয়ে আবির্ভূত হলেন। রসিকতা আর পরিহাসপ্রিয়তায় তাবড় তাবড় শিক্ষিত বাঙালী সমাজকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দিয়েছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ রসিক। তিনি কবি। সমস্ত জ্ঞানের সমন্বয় তিনি। রসিকতা রস আর সুন্দর সুন্দর চিত্রকল্প দিয়ে ভক্তগণকে আকর্ষণ করলেন। ধর্মের শক্ত খোলসকে মুক্ত করে ভিতরের নরম শাঁসটুকু বার করে আনলেন। চিত্রকল্পের সঙ্গে অপূর্ব প্রতীক। এই সব চিত্রকল্প আর প্রতীক আবার সরলতায় ভরা। যা বুঝতে কারো বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝেছিলেন সহজ কথা আর অকপট সারল্য ছাড়া পণ্ডিতের অভিমান ভাঙা যায় না। লোককথার রূপকল্প ছাড়া শিক্ষিতের অহঙ্কারকে সরিয়ে দেওয়া যায় না। তাই তিনি নিজের জ্ঞানকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সাধারণ কথার মাধ্যম নিয়েছিলেন। সর্বসিদ্ধ সাধক হয়েও সাধারণ জীবন যাপন করেছেন। গাম্ভীর্য দূরত্ব নির্লিপ্ততা এসব নিয়ে নিঃসঙ্গ হন নি।

আপাতদৃষ্টিতে অশিক্ষিত, আধপাগলা এই মহাপুরুষ ছিলেন পরম জ্ঞানী। সাংসারিক কোনো শিক্ষায় তিনি জ্ঞানলাভ করেন নি, তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন তাঁর অন্তর্চেতনায়। যে শিক্ষায় মানুষ কখনো শিক্ষিত হতে পারে না। একমাত্র ঈশ্বর সদৃশ অতিমানবের পক্ষেই তা সম্ভব।

তিনি যে সাধারণের মধ্যে অসাধারণ, তিনি যে পুরুষের মধ্যে পরমপুরুষ, তিনি যে মানবের মধ্যে অতিমানব তা তাঁর লীলারূপ দেখলেই বোঝা যায়। জ্ঞানে ধ্যানে সাধনে প্রবুদ্ধ অথচ বহির্জীবনে বালক-স্বভাব শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষিত বাঙালীর সামনে একটি চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছিলেন। একদল য়ুরোপীয় শিক্ষিত মানুষের অহঙ্কারকে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিয়েছিলেন।

যে ভাবে সব বালকেরা বড় হয় সেইভাবে জীবনযাত্রা শুরু করলেও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে মৌলিকত্ব দেখা দেয় এগার বছর বয়সেই। তিনি যে ঈশ্বর সদৃশ তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়।

একদা মাঠ দিয়ে বাড়ির কাছাকাছি আনুড় গ্রামে যাচ্ছিলেন গদাধর। তখন তাঁর বয়স মাত্র এগার। মাঠের মধ্যে হঠাৎ এক জ্যোতি দর্শনে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তাঁর মুখের বর্ণনায় সবাই বলেছিল, এই ভাব মূর্চ্ছা—কিন্তু আসলে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে সেই প্রথম ভাব-সমাধি হয়েছিল।

অল্প বয়সে গ্রাম ছেড়ে, প্রকৃতির কোল ছেড়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব

তাঁর বড় ভাই রামকুমারের সঙ্গে কলকাতায় এলেন।

রামকুমার তাঁকে কলকাতায় আনেন দুটি কারণে। এক গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণের লেখাপড়া কিছু হচ্ছিল না। দুই, অর্থোপার্জনের জন্যই রামকুমার কলকাতায় এসেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন গদাধর এ ব্যাপারে তাঁকে কিছু সাহায্য করবে। কলকাতায় আসবার সময় তিনি যুবক প্রায়। তখন তাঁর বয়স সতের কি আঠারো। এ সময়ে তিনি কিছু দিন যজমানি করে দাদাকে সাহায্য করেন।

১২৬২ সালে স্নানযাত্রার দিন রানি রাসমণি দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কালী বাড়ি স্থাপন করেন। রামকুমার সেখানকার প্রথম পূজারী নিযুক্ত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত শুরু করেন এই সূত্রে।

গঙ্গার তীরে প্রাকৃতিক স্নিগ্ধতার মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ভবিষ্যৎ জীবনের সূচনা হয়। একুশ বাইশ বছরে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণীর পূজারী নিযুক্ত হলেন। এই সময়েই তাঁর মানসিক পরিবর্তন দেখা দেয়। লোকে তাঁকে প্রথম প্রথম পাগল বলেই ধরে নেয়। তিনি কেমন আত্মমগ্ন হয়ে পড়েন। নিজেকে ভুলে যান, ভুল হয়ে যায় পরিবেশ, পূজা পদ্ধতি। তাঁর এই পরিবর্তন পরিবারের সবাইকে চিন্তিত করে তোলে।

সংসারবিমুখী তাঁর মনকে বাঁধবার জন্য সকলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিবাহের চেষ্টা করতে থাকেন। তাঁদের ধারণা বিয়ে করলে পাগলামীর ভাব কেটে যাবে। তিনি আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন।

পাত্রী খোঁজা চলতে লাগল। শ্রীরামকৃষ্ণ সবই শুনছেন দেখছেন। একদিন তিনিই বললেন, 'এত খুঁজবার দরকার কি?' হাসলেন তিনি; স্বভাবজাত রসিকতায় জানালেন, 'জয়রামবাটিতে মুখুয্যেদের ঘরে কনে কুটোবাঁধা হয়ে আছে।'

সত্যিই আশ্চর্য! জয়রামবাটিতে পাত্রী পাওয়া গেল। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মেয়ে শ্রীসারদামণি। তখন সারদামণির বয়স মাত্র ছয়

সাত বছর। এই বালিকার সঙ্গে যুবক শ্রীরামকৃষ্ণের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ফিরলেন। কিন্তু সবাই যা ভেবেছিল তা হল না। তার পাগলামী বেড়ে গেল। এ এক অদ্ভুত পাগলামী। ঈশ্বরের জন্য পাগল। পুজো করতে করতে বিগ্রহের সঙ্গে আত্মীয়তা। বাহ্য চেতন শূন্য। আকুলতার এক মানবীয় রূপ।

তার দ্বারা আর পুজো করা হল না। উন্মাদের মতো তিনি ঘুরে বেড়ান। ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোনো কিছুতে মন নেই। মুখে খালি মা মা ধ্বনি। রাসমণির জামাই মথুরামোহন কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন এ পাগলামী সাধারণ নয়—ইনি মানুষ নন—মানুষের চেহারায় পরম-পুরুষ। মথুরবাবু তার ধারণার বশবর্তী হয়ে সেবা করতে লাগলেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। পুজোর ভার পড়ল শ্রীরামকৃষ্ণের ভাগনে হৃদয় মুখুয্যের ওপর। হৃদয়নাথ একই সঙ্গে ভবতারিণীর পুজো ও মামার দেখাশোনা করতে লাগলেন।

সংসার পুজো সব গেল। শুরু হল সাধনার জীবন। সে এক অত্যাশ্চর্য তপস্যা। ঈশ্বরের জন্য ঈশ্বর ছাড়া কেউই এভাবে সাধনা করতে পারে না। নিজের ভেতরে চোখ রেখে নিজেকে চেনা ও ঈশ্বর লাভ যে কি জিনিস তারই বিকাশ সকলকে অবাক করে দিল।

সাধনার সময় যাঁরাই দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন তারাই তাঁর ভাবে মুগ্ধ হয়ে নিজের যতটুকু জ্ঞান তা দান করে শ্রীরামকৃষ্ণকে পূর্ণ হতে সাহায্য করেছেন। দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীরা আসতেন। এঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণী ভৈরবী, তোতাপুরী পরমপুরুষকে আত্মীয়জ্ঞানে নিজেদের মতো সাধনা করিয়েছিলেন।

দেখতে দেখতে তিনি সিদ্ধিপ্রাপ্ত হলেন। তাঁর উন্মাদনা কমে এল। বিসদৃশ আচরণ বন্ধ হল। শ্রীরামকৃষ্ণ মা জগদম্বার দেখা পেলেন। তিনি বালকত্ব প্রাপ্ত হলেন। সরল সদাহাস্যময় পরমপুরুষে রূপান্তরিত হয়ে ভক্তরঞ্জনের জন্য দেহধারণ করে রইলেন।

১৮৭৯-১৮৮০ থেকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ ভক্তদের আনাগোনা দক্ষিণেশ্বরে শুরু হয়। তিনি এই ভক্তদের কাছে পাবার জন্য চীৎকার করে ডাকতেন। বলতেন, 'ওরে তোরা কে কোথায় আছিস, তাড়াতাড়ি চলে আয়। আমি যে তোদের জন্য বসে আছি।'

দক্ষিণেশ্বর নতুন ভারতের অভাবনীয় এক তীর্থে পরিণত হতে লাগল। ভবিষ্যতের জ্যোতিষ্কমান পুরুষেরা শ্রীরামকৃষ্ণের আহ্বানে তাঁর পদতলে সমবেত হল। শুরু হল শ্রীরামকৃষ্ণের রসময় জীবন। রসমুগ্ধ অমৃতবাণী দিয়ে শরণাগতদের তিনি আপন করে তুলতে লাগলেন। ১৮৭৫ সাল থেকেই ভক্তমণ্ডলের আসর তৈরি হচ্ছিল। বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, নেপালের কাপ্তেন, সিঁথির গোলাপ, মহেন্দ্র কবিরাজ, কৃষ্ণনগরের কিশোরী ও মহিমাচরণ রায় প্রভৃতিরা ছুটে এলেন। ভক্ত ধরবার জন্য ঠাকুরও নিজে ছুটলেন। তিনি কেশব সেনের নাম শুনে বেলঘরিয়ায় ভক্ত সঙ্গে তাঁর ধ্যান দেখতে গিয়ে ছিলেন। ১৮৮১-৮২ সালে রামকৃষ্ণ এক বিরাট ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে সৌবপিতার মতো অবস্থান করলেন। নানা দিক থেকে নানা ভক্ত এসে তাঁকে ঘিরে ধরল।

শ্রীরামকৃষ্ণ দিকে দিকে প্রচারিত হলেন। কলকাতা তথা তাবৎ বাংলার বুদ্ধিজীবি সমাজ এই আধপাগলা সাধকের নাম শুনল। শুধু নাম শোনাই নয়—অবাক হল সাধারণ অশিক্ষিত একটি মানুষের অতীন্দ্রিয় কাজ-কারবার দেখে। যার কোনো শিক্ষা নেই তাঁর মুখ দিয়ে অনবরত বেরিয়ে আসছে বেদের বাণী। যিনি কোনো শাস্ত্র পড়েন নি তিনি যা বলছেন তাই পরম শাস্ত্রীয় বলে মনে হচ্ছে। শিক্ষিত বিদ্বান শাস্ত্রজ্ঞ মানুষদের সমস্ত বিচারবোধকে শুদ্ধ করে দিয়ে তিনি হাসছেন। পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারকে গ্রাম্য কথকতায় খণ্ড খণ্ড করে দিচ্ছেন অনায়াস দক্ষতায়। ঈশ্বর যেন সারল্যের প্রতিমূর্তি হয়ে নিজেই নিজের গুণকীর্তন করছেন।

তাই একদা গ্রামের এক গদাধর চাটুয্যে আশ্চর্য তপশ্চর্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস রূপে জগতে পরিচিত হলেন। পরমহংস যিনি জলমেশানো দুধ থেকে ক্ষীর তুলে তুলে নিজে আস্বাদ করছেন ও ভক্তদের করাচ্ছেন।

কলকাতায় তখন ব্রাহ্ম সমাজের জয়জয়কার। দেখতে দেখতে সেই সমাজের প্রধানরা তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ল। একটা অদৃশ্য বিপ্লব এল। ধর্ম বিপ্লব। শ্রীরামকৃষ্ণ একা এই বিপ্লবকে সার্থক করে তুললেন। হিন্দুধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করলেন সংস্কারযুক্ত এক নতুন আলোর সিংহাসনে। এই প্রতিষ্ঠার পেছনে যে শিক্ষা তিনি দিয়েছেন তার সবটাই রসস্নিগ্ধ। পরিহাস আর লঘুতায় ভরা। কোথাও কচকচি নেই, না বোঝার বেড়া নেই। সেই শিক্ষা যেন লোকরঞ্জনের জন্য লৌকিক রসমাধুরীর নির্যাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ সব রকমের সাধনায় সিদ্ধ হয়েছিলেন আগে। তাই সকলকে সর্ব ধর্ম সমন্বয় বোঝাতে পেরেছেন অত সহজে। সব ভাবে সব পথে তিনি সাধনা করে দেখেছেন যত মত তত পথ ; তাই ভক্তদের, অন্তরঙ্গদের মনে এই কথাই ছড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁব ভেতর ধর্ম সম্পর্কে জানবার ব্যাকুলতা ছিল প্রচণ্ড—যার জন্য তিনি হিন্দু-ধর্মের নানা দিক ছাড়াও মুসলমান, খ্রীস্টান, শিখ প্রভৃতিদের মতো সাধন করেছেন। মাকে একদিন আকুল হয়ে ডেকে বলেছেন, 'মা তোর খ্রীস্টান ভক্তরা তোকে কেমন করে ডাকে একদিন দেখব আমাকে নিয়ে চল।' যেমন পিপাসা তেমনি নিবৃত্তি। সত্যই একদিন গীর্জার দরজায় দাঁড়িয়ে প্রার্থনা দেখেছিলেন তিনি।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকাশ্যে নতুন এক আলোকোদ্ভাস রূপে দেখা দেন। দেখতে দেখতে আজ একশ বছর বাদে তিনি সারা পৃথিবীতে ছায়া হয়ে আছেন ভক্তজনের মধ্যে। তিনি ঈশ্বর কি ঈশ্বররূপী তা তিনিই জানতেন। তবে আজ ঘরে ঘরে

ঈশ্বররূপেই তিনি পূজিত হচ্ছেন। পুরুষের মধ্যে তিনি ছিলেন পরমপ্রকাশ। নতুন এক দিগপ্রদর্শক।

এক দিনে তা হয়নি। একটু একটু করে বিশ্বাস জন্মেছে। আর সে বিশ্বাসকে নিজে সোজা সহজ রসের কথার ভেতর দিয়ে প্রোথিত করেছেন মানুষের মনে। সেই রসের সাগরের কতটুকুর সন্ধান আমরা জানি! তবু যতটুকু সম্ভব তারই আরতি করেই গুণমুগ্ধজন নিজেকে ধন্য মনে করে।

সাধন ভজন শেষ করে তিনি ব্যাকুল হয়ে কিছুদিন ভক্তদের খুঁজে বেড়ান। ভক্তরা একে একে আসতে থাকেন। বয়স্ক, গৃহী, গৃহত্যাগী, স্বনামধন্য, অখ্যাতনামা, তরুণ, কিশোর—এমন কি মহিলা ভক্তরাও তাঁকে চিনে ফেলল।

শিক্ষিত, অশিক্ষিত, জ্ঞানী, অজ্ঞানী সব ভক্তকেই তিনি তাঁর অনুপম ভাষায় বিশ্বাসী করে তুলেছিলেন। সেই ভাষায় ছিল অগাধ মমতা আর অনাবিল পরিহাসপ্রিয়তা। মজার মজার তুলনা দৈনন্দিন জীবন থেকে ছেঁকে নিয়ে তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব, তাঁর মহিমা বুঝিয়ে দিতেন জলের মতো। অন্যের সরস উক্তিতে হাসতেন বালকের ন্যায়। প্রথমে তাঁর কথাগুলো মেঠো মনে হলেও অল্পেই ভক্তজন বুঝতে পারত তার গভীরতা। সামান্য আলাপেই যে কোনো মানুষ অবাক হয়ে যেত শ্রীরামকৃষ্ণর অন্তরের গভীর জ্ঞানে।

এই জ্ঞান পুঁথিগত নয়; এ হল অনুভূতিসঞ্জাত। নিজে নিজেই বিচার-বিবেচনায় সমস্ত শাস্ত্রকে তিনি কণ্ঠস্থ করে তুলেছিলেন। জিবের আগায় যেন সরস্বতী আপনি প্রসন্ন হয়ে বাসা বেঁধেছিলেন। যার ফলে বেদ বেদান্ত গীতা উপনিষদ তাঁর আয়ত্ব ছিল অধীত বিদ্যার মতো।

তিনি ঠিক প্রচারক বা সংস্কারক ছিলেন না। সনাতন ধর্মর প্রতি অবিশ্বাসীদের মনে নতুন বিশ্বাস উৎপাদন করতেই জন্ম নিয়েছিলেন।

নির্দিষ্ট কোনো মত বা পথ বাৎলে নিজেকে মহান করতে চান নি। সর্ব মতের সমন্বয় সাধন ও সর্ব পথের শেষ ঈশ্বরে এ কথাই সহজভাবে বলতে চেয়েছিলেন।

১৮৮০ সাল বা তার কিছু আগে থেকেই সকলের মধ্যে নিজেকে বিলিয়ে দেবার ব্রত তিনি শুরু করেন। তিরোধানের পূর্ব পর্যন্ত এই কাজে তাঁর বিরাম ছিল না। জীবনের শেষ ক-বছর দুরারোগ্য রোগে ভুগেও কর্তব্য ভুলে যান নি। যাদের প্রতি একবার কৃপাদৃষ্টি দিয়েছিলেন তাদের সকলকেই শেষদিন পর্যন্ত শিক্ষা দেন অননুকরণীয় ভঙ্গিতে। এই ভঙ্গির ভেতর ছিল রসের খনি। সেই রস যাঁরা প্রত্যক্ষ পান করেছেন তারাই জানেন কি অমৃত তিনি নিয়ে এসেছিলেন। রসিক শ্রীরামকৃষ্ণর জীবন তাই মাধুর্যে ভরা।

সকাল থেকে সন্ধ্যে অজস্র ভক্ত দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে যেত। অনেকে থাকত। আবার ভক্তদের খুশি করবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে কলকাতায় ও আসেপাশে নানা ভক্ত গৃহে যেতেন। রাত্রে বিশ্রামের পূর্ব পর্যন্ত অনর্গল কথার ভেতর দিয়ে ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু হয়ে সকলকে ঈশ্বর মহিমা কীর্তন করতেন। ঈশ্বর আছেন—তিনিই সব, এ ছাড়া অন্য কোনো কিছু সত্য নয় এ কথা সকলের মধ্যে গভীরভাবে গেঁথে দিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণর কর্মধারা, অনর্গল আনন্দভাব, বালকের মতো স্বভাব অথচ নির্লোভ জীবন সে সময়ে বহু মানুষের কাছে এক আশ্চর্য রহস্যের ব্যাপার ছিল। অনেকেই মনে করত মানুষে কখনো এত দয়া এত করুণা এমন জ্ঞান বিকাশলাভ করতে পারে না। তাঁর ভক্তরা, এখন হিন্দু বাঙালী মাত্রেই তাঁকে অবতার বলে মনে করেন। তিনি ছিলেন পরমপুরুষ আধুনিক যুগের এক অনন্য ঈশ্বর। ভক্তরা বহু সন্দেহ পার হয়ে বহু দ্বিধা অতিক্রম করে তাঁকে মেনে তাঁর শরণাগত হয়েছিলেন।

কথায় কথায় গল্পে তিনি বহুভাবে বলেছিলেন, এসব হবে তা তিনি জানতেন। এমন হবে বলেই তাঁর আবির্ভাব ঘটেছে। আবার ছেলেমানুষের মতো বহুবার সংশয় প্রকাশ করেছেন নিজেকে নিয়ে। ভক্তদের দিয়ে বলাতে চেয়েছেন, তারা তাঁকে কি ভাবে। তাঁর ভক্ত পরিমণ্ডলে কে কে আসবে, কে কি ভাবে লীলা করবে এও তিনি জানতেন। জানতেন বলেই অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস নিয়ে ভক্তদের সম্পূর্ণ করে তুলেছেন। তাদের কঠোর তপস্যার ফাঁকে রসময় হয়ে সাধনাকে এগিয়ে দিয়েছেন।

দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ি আজ তীর্থস্থান। ১৮৮০ সালের পর থেকেই এই নতুন তীর্থের আভাস পাওয়া গিয়েছিল। এই সময় থেকে ও পরবর্তী লীলাকাল পর্যন্ত মুক্তিকামী মানুষেরা প্রত্যহ হাজির হত এই পুণ্যভূমিতে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দুহাত বাড়িয়ে তাদের গ্রহণ করতেন ও নিত্য উপদেশ দিতেন। শুধু হিন্দু নয়, অন্য ধর্মাবলম্বীরাও হাজিরা দিত। তারাও তাঁর প্রাণের কথা শুনে নিজেদের আত্মাকে শান্ত করে তুলত। বিশেষ করে রবিবার বা ছুটির দিনগুলিতে ভক্ত সমাগম বেশি হত।

শ্রীরামকৃষ্ণর গুণমুগ্ধ ভক্তদের মধ্যে প্রধান একজন ছিলের কেশবচন্দ্র সেন। শিক্ষিত মার্জিত রুচির এই বিরাট পুরুষ ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালীর একজন মনের মানুষ ছিলেন। ব্রাহ্ম ধর্মের প্রধান পুরুষদের অন্যতম কেশব সেন হিন্দু ধর্মের এই পাগল ঠাকুরের প্রতি একটু একটু করে সম্মোহিত হয়ে পড়েছিলেন। পরিহাসে রসিকতায় গল্পচ্ছলে ঈশ্বর আছেন, তিনি সাকার ও নিরাকার দুই-ই একথা কেশব সেনকে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বাস করিয়েছিলেন। কেশব সেনের হৃদয় জয় করে সে যুগের বাঙালী মনীষার অনেকখানিই তিনি অনায়াসে জয় করে নিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হয়তো চেয়েছিলেন একজনের হৃদয় পরিবর্তন করিয়ে একসঙ্গে তিনি বহুর মনের ভেতর

পাকা আসন করে নেবেন।

একবার কেশব সেন ও জোসেফ কুকের সঙ্গে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ স্টীমারে করে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত প্রণেতা শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তার কয়দিন পরে প্রথম ঠাকুরে কাছে যান। সেটা ১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারী মাস। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত শিক্ষকতা করতেন। পরে তাই তিনি মাস্টার নামেই পরিচিত হন।

বেড়াতে বেড়াতে নিতান্ত কৌতূহলবশতঃ মহেন্দ্র গুপ্ত ঠাকুরকে দেখতে যান। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের নিয়ে কথা বলছিলেন। তাঁর সহজ সরল প্রতিটি কথা ভক্তরা পান করছিল চুপচাপ বসে।

প্রথমে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখে মাস্টার অবাক হয়ে গেলেন। সোজা সহজ কথা। অকপট বিশ্বাস। ঠাকুর বলছেন, 'যখন একবার সেই হরি বা রাম নাম করলে পুলক হয়, চোখ দিয়ে জল বেরোয় তখন বুঝবি সন্ধ্যাদি কাজ আর করতে হবে না। কর্ম-ত্যাগের অধিকার তখন জন্মেছে। নিজে নিজেই কর্মত্যাগ হয়ে যাচ্ছে। সেই সময় শুধু রাম বা হরিনাম কিংবা ওঁ-কার জপ করলেই হবে।'

প্রথম কথা শুনেই মাস্টার মুগ্ধ। তিনি তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে এসে-ছিলেন। মধুর কথার ভাব ভাবতে ভাবতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। সন্ধ্যা হয়েছে। মন্দিরে আরতির ঘণ্টা বাজছে। মহেন্দ্র গুপ্ত খানিক গঙ্গাতীরে বাগানে ঘুরলেন। তাঁর মনে হল ওই কথা যেন তাঁকে পেছন থেকে পুনরায় ওই ঘরের দিকে টানছে।

পায়ে পায়ে তিনি আবার ফিরে এলেন যে ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ থাকতেন সেই ঘরে। তখন ধুনো দেওয়া হয়েছে। মহেন্দ্র গুপ্তদের সঙ্গে ঠাকুরের সেবারতা বৃন্দে ঝির দেখা। মাস্টার তাকেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'সাধু কি ঘরের ভেতর আছেন?'

'হ্যাঁ', বৃন্দে ঝি উত্তর দিল।

'উনি কি অনেক বই-পত্র পড়েন?'

'বই!' বৃন্দে ঝি অবাক। 'আর বাবা বই-পত্র! সব ওঁর মুখে।'

এই সত্য মাস্টারকে আরো বিস্মিত করে দিল। তিনি নিজে প্রচুর পড়েন। অথচ যেখানে এসেছেন, যার মুখে অমৃতকথা শুনলেন তিনি পড়েন না! অথচ এই উপলব্ধি!

পুনরায় দুজনে ঘরে ঢুকলেন। ঘব ফাঁকা। শ্রীরামকৃষ্ণ একাকী তক্তপোষের উপর বসে। মাস্টার হাতজোড় করে প্রণাম করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁদের বসতে বললেন। দুজনেই মেঝেতে বসলেন। সামান্যক্ষণ পরিচয়ের পালা চলল। কথা বলতে বলতে ঠাকুর অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন। তখন তিনি ব্যাপারটা বোঝেন নি। পরে জেনেছেন এর নামই ভাব। রস মিশিয়ে ঠাকুর এ ব্যাপারে বলেছেন, 'এ হল যেমন কেউ ছিপ ফেলে মাছ ধরতে বসে তেমনি। মাছ টোপ খেতে এলেই যেই ফাতনা নড়ে ওঠে তখন ছিপ হাতে মানুষটি যেমন সব কিছু ছেড়ে ফাতনার দিকে একাগ্র হয় এ ঠিক তাই। তখন অন্য জ্ঞান থাকে না।'

এই ভাবের প্রভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে বাইরের চেতনা হারিয়ে ফেলতেন। ডুবে যেতেন নিজের অন্তরে। গভীর সমাধিতে। দু-এক কথার পরে প্রথম দিনের আলাপ শেষ হল। মহেন্দ্র গুপ্ত বিদায় নিলেন। ঠাকুর বললেন, 'আবার এস।' কি মধুর আহ্বান! সমস্ত মন জুড়ে কে যেন বলল, 'আবার এস।'

আরেক দিন সকালে মহেন্দ্রনাথ আবার গেলেন। তাঁকে দেখেই ঠাকুর বলে উঠলেন "তুমি এসেছ! এখানেই বস।' বারান্দায় বসে ঠাকুর তখন দাড়ি কামাবেন। সহাস্য মুখে বসেছিলেন। তিনি মাস্টারের সঙ্গে অন্তরঙ্গ আলাপ জুড়ে দিলেন। কথা বলতে বলতে শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'হ্যাঁগা, কেশব কেমন আছে? ওর বড় অসুখ হয়েছিল।'

'বোধহয় ভাল আছেন।' মাস্টার জবাব দিলেন। 'অসুখের কথা আমিও শুনেছিলাম।'

'জানি, ওর জন্য মার কাছে ডাব চিনি মেনেছিলুম। কেঁদে কেঁদে মাকে বলেছিলুম, মা ওর অসুখ ভাল করে দাও। ও না থাকলে কলকাতায় গিয়ে কার সঙ্গে আমি কথা বলব।' শ্রীরামকৃষ্ণ অন্য কথায় গেলেন, 'হ্যাগো কুক সাহেব না কে একজন এসেছে? খুব নাকি লেকচার দেয়? আমাকে কেশব একদিন জাহজে বেড়াতে নিয়েছিল। কুক সেখানেও ছিল।'

'তার কথা আমি জানি না—শুনেছি মাত্র—' মাস্টার জবাব দিলেন।

কথা থেকে কথান্তরে শিশুর মতো যান। আলাপী ব্যক্তি মাত্রই তাঁর অন্তরঙ্গ। মাস্টারকে হঠাৎ বললেন, 'প্রতাপের ভাই এসেছিল। সে বলে, এখানে থাকবে। বিয়ে করেছে, অনেকগুলো ছেলেমেয়ে সবাইকে শ্বশুরবাড়িতে রেখেছে। কাজকর্ম নেই। আমি বললুম, 'দেখ দিকি ছেলেপুলে হয়েছে তাদর কি ওপাড়ার লোক এসে মানুষ করবে, খাওয়াবে-দাওয়াবে? লজ্জা করে না মাগ ছেলেকে অপরে খাওয়াচ্ছে—অনেক বকতে তবে এখান থেকে গেল।'

মহেন্দ্র গুপ্ত অবাক। তিনি বুঝলেন এই সর্বত্যাগীর কাছে গৃহীর প্রথম শিক্ষা গার্হস্থ্য ধর্ম পালন। সংসার থেকে ঈশ্বরের নামে পলায়ন নয়।

'তুমি কি বিয়ে করেছ?' ঠাকুরের প্রশ্ন।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

শ্রীরামকৃষ্ণ শিউরে উঠলেন। ভাইপোর নাম ধরে ডাকলেন। 'ওরে রামলাল, যাঃ বিয়ে করে ফেলেছে।' ঠাকুর হয়তো তাঁকে অবিবাহিত আশা করেছিলেন। একটু থেমে তিনি আবার জানতে চাইলেন, 'ছেলেপুলে হয়েছে?'

মহেন্দ্রনাথ এবার একটু ভীত স্বরেই বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

তবু ঠাকুর স্নেহময়। বললেন, 'দেখ তোমার লক্ষণ ভাল ছিল। আমি চোখ কপাল এসব দেখলে বুঝতে পারি। বেশ তোমার স্ত্রী কেমন? বিদ্যাশক্তি না অবিদ্যাশক্তি?'

'এমনিতে ভালই। তবে জ্ঞানহীনা।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বিরক্ত হলেন। মুখে বললেন, 'তুমি বুঝি জ্ঞানী?'

মাস্টার তখন পর্যন্ত জ্ঞান আর অজ্ঞান কি তা জানতেন না। তাঁর ধারণা যাঁরা লেখাপড়া করেন, বই পড়েন তাঁরা জ্ঞানী। আসলে ঈশ্বরকে জানার নাম জ্ঞান—না জানার নাম অজ্ঞান। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে এই কথাই জানাতে চেয়েছিলেন। তাঁর মন থেকে শিক্ষাভিমান দূর করবার জন্য আবার বললেন, 'তুমি কি জ্ঞানী!'

মহেন্দ্রনাথ চুপ। তাঁর অহঙ্কার তখন পলাতক।

পরমপুরুষ নির্বিকার। তিনি জগৎকে শিক্ষা দেবার জন্য জীবন ধারণ করে আছেন। যাঁরা সমাধিস্থ হয়ে একবার সেই সচ্চিদানন্দকে জানতে পারে তাঁরা আর মায়ার জগতে আসতে পারে না। কেউ কেউ আসে। আসে অন্যকে মুক্তি দেবার জন্য। জগৎকে ঈশ্বরের নামে প্লাবিত করবার জন্য।

ঠাকুর শিক্ষা দেবার জন্যই দেহ ধারণ করে আছেন। তিনি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, 'তুমি নিরাকার না সাকারে বিশ্বাস কর?'

মাস্টার অবাক। এ কেমন প্রশ্ন! সাকারে বিশ্বাস থাকলে নিরাকারে বিশ্বাস জন্মে কি! দুই যে বিপরীত। সাদা রঙ কি কালো হয়! কালো রঙ সাদা! তবু শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলতে চান তাই জানবার জন্য বললেন, 'নিরাকারে আমার বিশ্বাস।'

'ভাল কথা।' ঠাকুর বললেন, 'একটাতে বিশ্বাস থাকা দরকার। নিরাকারে বিশ্বাস, তা ভালই। তবে এটা সত্য ওটা মিথ্যা এই বুদ্ধি যেন না হয়। দুই-ই সত্য। যেটায় তোমার বিশ্বাস সেটা ধরেই থাকবে।'

দুই-ই সত্য! এ কেমন কথা! মাস্টার ভাবতে লাগলেন এমন কথা তো কোনো গ্রন্থে পড়েন নি। তিনি তাই যুক্তির অবতারণা করলেন। 'সাকার নয় বুঝলাম, তাই বলে তিনি তো মাটির প্রতিমা নন—'

'মাটি কেন গো! চিন্ময়ী প্রতিমা।' সহজ সরল উক্তি।

মহেন্দ্রনাথেব শিক্ষার অহঙ্কার তবু তা মানতে রাজী নয়। তিনি বললেন, 'চিন্ময়ী প্রতিমা কথাটা বুঝতে পারলাম না। যারা মাটির প্রতিমা পুজো করে তাদের কি বলা উচিত নয়, মাটিকে পুজো করো না।'

পরমপুরুষ একটু বিরক্ত হলেন। তিনি উত্তর দিলেন, 'তোমাদের কলকাতার লোকেদের এই এক অভ্যেস, খালি লেকচার দেওয়া, বুঝিয়ে দেওয়া! আপনাকে কে বোঝায় তার ঠিক নেই। তুমি বোঝাবার কে হে—যাঁর জগৎ তিনি বোঝাবেন। তিনি তো মনের কথা টের পান। যদি মাটিব প্রতিমা পূজায় কোনো ত্রুটি হয় তা কি তিনি জানেন না? তিনি কি বোঝেন না তাঁকেই ডাকা হচ্ছে এইভাবে। তবে? তোমার অত বোঝবার দরকার কি! তুমি নিজের যাতে জ্ঞান ভক্তি হয় তার ব্যবস্থা কবো।'

জীবনে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত আর কোনোদিন শ্রীরামকৃষ্ণর সামনে তর্ক করেন নি। ওই এক কথায় তাঁর অহঙ্কাররূপ তর্কের শেষ হয়েছিল। এত সুন্দব এত সহজ কথা যে এর আগে তিনি শোনেন নি। শ্রীঠাকুর পরিহাস করে তাঁকে আবার বোঝালেন, 'প্রতিমা যদি মাটিরই হয় সে পুজোরও প্রয়োজন আছে। নানা ধরনের পুজো ভগবান নিজেই ব্যবস্থা করেছেন। মানুষ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা। যেমন ধরো, কোনো মার পাঁচটি সন্তান। বাড়িতে মাছ এসেছে। মা মাছ নানা রকম করে রান্না করেছেন। যার পেটে যা সয়! কারও জন্য পোলাও, কারও অম্বল কারো চচ্চড়ি—যার মুখে যেটা ভাল লাগে—এবার বুঝলে তো?'

এমনি ছিল আলাপ। শিক্ষার পাঠ। মুখে মুখেই সন্দেহের নিরসন। ভক্তের মনে সন্দেহ থাকলে হয় না। সেই সঙ্গে তার অহঙ্কারকেও নরম করতে হবে। অহঙ্কার সন্দেহ এ দুই থাকলে সাধনার ব্যাঘাত হবে।

আবার ওই মাস্টারকেই ঠাকুর জ্ঞানী শিক্ষিত বলে মানতেন। অহঙ্কার বাদ দিয়ে তাঁর শুদ্ধজ্ঞানকে।

মাস্টার জানতে চাইলেন, 'ঈশ্বরে কি করে মন যাবে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ জবাবে বললেন, 'সবসময় তাঁর নাম-গুণগান করতে হবে। যারা ঈশ্বরের ভক্ত তেমন ভক্ত সাধুদের সঙ্গে মিশতে হবে। সংসার আর বিষয়ের মধ্যে থাকলে ঈশ্বরে মন হয় না। তাই মধ্যে মধ্যে নির্জনে নিরালায় যেতে হবে। একান্তে তাঁর চিন্তা খুব চাই। নিরিবিলি না হলে প্রথম দিকে ঈশ্বরে মন রাখা খুব শক্ত। যে রকম চারা গাছ হলে চার পাশে বেড়া দিতে হয়—নাহলে ছাগল গরুতে খাবে। তারপর গাছ যখন বড় হয়—বেড়ার আর দরকার নেই। এবার গুঁড়িতে হাতি বেঁধে রাখ কিছু হবে না।'

নীরস উদাহরণ নয়। মধুশ্রাবী উপমা, তাৎক্ষণিক হৃদয়ে গেঁথে যায়। তিনি এমন কথা অনর্গল বলে যেতেন। ভক্তকে নিঃসন্দেহ করে বোঝাতেন। 'ধ্যান করবে মনে কোণে ও বনে' সবসময় কোনটা সৎ কোনটা নয় বিচার করবে। ঈশ্বর মানেই সৎ, নিত্য—আর সব অনিত্য, অসৎ।

'তাহলে সংসারে থাকব কিভাবে?'

সেই অতুলনীয় উপমা। অপরিমেয় সুধাসার। 'সব কাজ করবে কিন্তু মন থাকবে ঈশ্বরে। স্ত্রী পুত্র পিতামাতা সবাইকে নিয়ে থাকবে। সকলের সেবা করবে। যেন তারা কত নিজের। কিন্তু মনে জানবে তারা তোমার কেউ নয়। বড়মানুষের বাড়ির দাসীর মতো থাকবে। সে মনিবের ছেলেকে নিজের মতো মানুষ করে।

বলে আমার রাম, আমার হরি। কিন্তু মনে মনে জানে এরা কেউ তার নয়। কচ্ছপ জলে ভেসে বেড়ায়। কিন্তু তার মন পড়ে আছে আড়ায়—যেখানে তার ডিম রয়েছে। সব কাজ করো, শুধু মনকে খোলা রাখ ঈশ্বরে। ঈশ্বরভক্তি না নিয়ে সংসার করলে আরো জড়িয়ে যাবে। বিপদ দুঃখ তাপ এ সব কিছুতে ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। আর যত বিষয় চিন্তা করবে তত বাড়বে আসক্তি। তেল হাতে মেখে নিয়ে তবে কাঁঠাল ভাঙতে হয়, না হলে আঠা হাতে জড়িয়ে যাবে। তেমনি ঈশ্বরভক্তিরূপ তেল হাতে মেখে সংসার কবতে হয়। সেখানে ভয় নেই। কিন্তু এই ভক্তি পেতে হলে নির্জনতা চাই। মাখন তুলতে হলে নির্জনে দই পাতা দরকার। নাড়াচাড়া করলে দই জমবে না। নির্জনে বসে দই মন্থন করলে মাখন পাওয়া যায়। তাই নির্জনতার একান্ত প্রয়োজন। সংসার মানেই কেবল কামিনী-কাঞ্চন। সংসার হল জল আর মন হল দুধ। মনকে সংসারে ফেলে রাখলেই দুধে জলে মিশে একাকার হয়ে যাবে। খাঁটি দুধের অস্তিত্ব থাকবে না। অথচ দুধ থেকে একবার মাখন তুলে ওই জলে রাখ—মাখন ভাসবে। তাই নির্জনে সাধনা করে আগে জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে—তারপর সংসারে যাও। মাখন জলে মিশবে না। সেই সঙ্গে বিবেচনা বোধ। ঈশ্বরই একমাত্র জিনিস। কামিনী-কাঞ্চন অনিত্য। টাকায় কি হয়? ঈশ্বর পাওয়া যায় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না—এর নাম বিচার।'

মহেন্দ্রনাথ জানতে চেয়েছিলেন, 'ঈশ্বরের দেখা পাওয়া যায় কি?'

শ্রীরামকৃষ্ণ—'নিশ্চয়ই।'

'কি করে তাঁর দর্শন হয়?'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, 'খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁর দেখা পাওয়া যায়। মাগ-ছেলের জন্য লোকে কত কাঁদে, টাকার জন্য কাঁদে, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে? তাঁকে পেতে হলে ডাকার মতো' ডাকতে

হয়। তিন টান এক করে ডাক—বিষয়ীর বিষয়ের উপর, সতীর পতির উপর আর মায়ের সন্তানের উপর। যদি এই তিন টান কেউ এক সঙ্গে করে ডাকে সে ঈশ্বর লাভ করে। আসল কথা ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে। সব ভালবাসা একত্র করে যতটা হয় ততটা যে দিতে পারে তার ঈশ্বর দর্শন হয়। আকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হবে। বেড়ালের বাচ্চা যেমন মিঁউ মিউ করে মাকে ডাকে। মা তাকে যেখানে রাখে, সে সেখানেই থাকে। কখনো হেঁসেলে, কখনো বিছানায়। তার কষ্ট হলে শুধু মিঁউ মিঁউ করে ডাকে। মা যেখানেই থাকুক ডাক শুনে ছুটে আসে।'

দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রনাথ এসেছেন। তখন তাঁর বয়স উনিশ। কলেজে পড়ছেন। হিন্দুধর্মে তেমন আস্থা নেই। সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে যাতায়াত করেন। উজ্জ্বল গভীর দুটো চোখ। কথার মধ্যে অস্বাভাবিক তেজস্বীতা। পরিপূর্ণ ভক্তের চেহারা। আরো ভক্ত আছেন। সকলে ঘিরে রয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। তিনি হাসি মুখে কথা বলছেন। নরেন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে পরমপুরুষের আনন্দ যেন উপচে পড়ছে। নানা ধরনের কথা চলছে। এক সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নরেন্দ্র তুই কি বলিস? সংসারী মানুষ কত কি বলে? কিন্তু দেখ, হাতি যখন চলে যায় পেছনে কত পশু কত রকম চীৎকার করে। হাতি ফিরেও তাকায় না। তোর যদি কেউ নিন্দা করে তুই কি মনে করবি?'

'মনে করব আমার পেছনে কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে।' নরেন্দ্রনাথের স্পষ্ট উত্তর।

'নারে অতদূর নয়। অতটা ভাবিস না।' শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় সবাই হেসে উঠল। 'ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান। তবে ভাল লোকের সঙ্গে মেশা চলে। দুষ্ট লোক থেকে দূরে থাকতে হয়। বাঘের ভেতরও

নারায়ণ রয়েছেন তা বলে বাঘের সঙ্গে কোলাকুলি করা যায় না।' এই উপমায় আবার সবাই হেসে উঠল। কি প্রাঞ্জল বক্তব্য! 'যদি বলো বাঘ তো নারায়ণ তাহলে পালাব কেন? তার উত্তর যারা পালাতে বলছে তারাও নারায়ণ, তাদের কথাই বা শুনব না কেন?'

এই বলে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'একটা গল্প শোন, কোনো এক বনে একজন 'সাধু থাকেন। তাঁর অনেক শিষ্য। তিনি শিষ্যদের একদিন বললেন; 'সর্বভূতে নারায়ণ আছেন এ কথা মনে রেখে সবাইকে নমস্কার করবে। একদিন এক শিষ্য হোমের জন্য কাঠ আনতে বনে গেল। এমন সময় চীৎকার শোনা গেল, কে কোথায় আছ পালাও, একটা পাগলা হাতি যাচ্ছে। সবাই পালাল কিন্তু শিষ্যটি পালাল না। সে ভাবল হাতিও যে নারায়ণ তাহলে পালাব কেন? এই ভেবে দাঁড়িয়ে সে নারায়ণের স্তবস্তুতি করতে লাগল। তখন মাহুত চেঁচাতে লাগল, 'পালাও পালাও' তবু সে নড়ল না। আর হাতিটা তাঁকে শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে একধারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। শিষ্যটি প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল। খবর পেয়ে গুরু অন্যান্য শিষ্যদের নিয়ে তাকে আশ্রমে আনলেন। ঔষধ আর সেবার পর তার জ্ঞান ফিরল। জ্ঞান ফিরতে একজন তাকে জিজ্ঞেস করল, হাতি আসছে শুনে পালালে না কেন? সে উত্তর দিল, গুরুদেব যে আমায় বলে দিয়েছিলেন নারায়ণই মানুষ পশু হাতি সিংহ সব হয়েছেন। তাই আমি হাতি নারায়ণ আসছে দেখে পালাই নি। গুরু শিষ্যের কথা শুনে বললেন, বাবা হাতি নারায়ণ আসছিলেন এ কথা সত্য, কিন্তু বাবা মাহুত নারায়ণ তো তোমাকে পালাতে বলেছিলেন—যদি সবই নারায়ণের তবে তার কথা বিশ্বাস করলে না কেন? মাহুত নারায়ণের কথাও তো শুনতে হয়।'

রসভরা অপূর্ব এই গল্প শুনে সবাই অনাবিল হেসে উঠল।

ঠাকুর বলতে লাগলেন, শাস্ত্রে আছে আপো নারায়ণঃ—জল মাত্রই

নারায়ণ। কিন্তু কোনো জলে ঠাকুর পুজো হয়, কোনো জলে অন্যান্য কাজ হয় ঠাকুর পুজো চলে না। তাই সাধু অসাধু ভক্ত অভক্ত সকলের হৃদয়েই নারায়ণ আছেন। তবু অসাধু অভক্ত খারাপ লোকের সঙ্গে মেলামেশা চলে না। কারো সঙ্গে হয়তো মুখের আলাপটুকু চলে, কারো সঙ্গে তাও না।'

একজন ভক্ত জানতে চাইলেন, 'দুষ্ট লোক যদি খারাপ করতে আসে তা হলে কি চুপ করে থাকব?'

'তা কেন!' তিনি উত্তর দিলেন, 'লোকের সঙ্গে বাস করতে গেলেই দুষ্ট লোকের হাত থেকে বাঁচবার জন্য একটু তমোগুণ দেখানো প্রয়োজন। তাই বলে সে অনিষ্ট করবে এই চিন্তায় উল্টে তার ক্ষতি করা কখনোই উচিত নয়। তাহলে একটা কাহিনী শোন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার গল্প শুরু করলেন। 'এক মাঠে একদল রাখাল গরু চরাত। সেই মাঠে ভীষণ বিষধর এক সাপ ছিল। সকলেই সাপের ভয়ে খুব সতর্ক থাকত। একদিন এক ব্রহ্মচারী ওই মাঠ দিয়ে যেদিকে সাপটি থাকত সেদিকে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে রাখালেরা দৌড়ে এল। বলল, ঠাকুর ওদিক দিয়ে যাবেন না। ভীষণ বিষাক্ত একটা সাপ আছে। সব শুনে ব্রহ্মচারী বললেন, তা হোক বাবা, আমি মন্ত্র জানি, সাপে আমার ভয় নেই। এই বলে তিনি ওদিকে চলে গেলেন। রাখালেরা ভয়ে কেউ এগোল না। ব্রহ্মচারীকে দেখে সাপ তো ফণা তুলে ছোবল মারতে এগিয়ে গেল। কিন্তু সে কাছে পৌঁছনোর আগেই ব্রহ্মচারী মন্ত্র পড়লেন। তখন সাপটা কেঁচোর মতো হয়ে গেল। সে ব্রহ্মচারীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল। ব্রহ্মচারী তাকে বললেন, ওরে শুধু পরের হিংসে করে বেড়াস, আয় তোকে মন্ত্র দেব। এই মন্ত্রে তুই ভগবান পাবি তোর মনে কোনো হিংসে থাকবে না। এই বলে তিনি সাপকে মন্ত্র দিলেন। সাপ মন্ত্র পেয়ে গুরুকে প্রণাম করল, ঠাকুর বলুন এখন আমি কি করে সাধনা করব। গুরু বললেন, এই

মন্ত্র জপ করো, আর কখনো হিংসে কোরো না। এখন আমি যাচ্ছি। আবার আসব। ব্রহ্মচারী চলে গেলেন। কিছুদিন কাটল। রাখালেরা দেখল যে সাপটা আর কামড়াতে আসে না। ঢিল ছুঁড়লেও কিছু বলে না। সে যেন কেঁচো হয়ে গেছে। একদিন একজন রাখাল তার কাছে গিয়ে তার ল্যাজ ধরে খুব ঘুরপাক দিয়ে মাটিতে আছড়ে ফেলে দিল। সাপের মুখ দিয়ে রক্ত উঠল সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। রাখালেরা সাপটা মরে গেছে মনে করে সবাই চলে গেল। অনেক রাতে সাপের জ্ঞান ফিরল। সে অতি কষ্টে ধীরে ধীরে তার গর্তের ভেতরে ঢুকে পড়ল। তার শরীর চূর্ণ—নড়বার ক্ষমতা নেই। অনেকদিন বাদে শুকিয়ে গিয়ে সে রাত্রে লুকিয়ে লুকিয়ে খাদ্যের জন্য বাইরে আসত, দিনে ভয়ে বেরত না। প্রায় এক বছর বাদে ব্রহ্মচারী সেই পথে পুনরায় এলেন। এসেই তিনি সাপের খোঁজ নিলেন। রাখালেরা বলল, সে সাপটা মরে গেছে। ব্রহ্মচারী কিন্তু ওদের কথায় বিশ্বাস করলেন না। তিনি জানেন যে মন্ত্র ওকে দিয়েছিলেন তার সাধন না হলে ও মরতে পারে না। তিনি খুঁজে খুঁজে তাঁর দেওয়া নাম ধরে সাপটিকে ডাকতে লাগলেন। গুরুদেবের গলা শুনে সাপ গর্ত থেকে বেরিয়ে এল ও ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করল। ব্রহ্মচারী প্রশ্ন করলেন, তুই কেমন আছিস ? সাপ উত্তর দিল, আজ্ঞে ভাল আছি। ব্রহ্মচারী তখন বললেন, তাহলে তুই এত রোগা হয়ে গেছিস কেন ? সাপ বললে, আপনি হিংসে করতে বারণ করেছেন তাই পাতাটা ফলটা খেয়ে বোধ হয় রোগা হয়ে গেছি। মন্ত্রের জোরে সাধনায় ওর ততদিনে সত্ত্বগুণ হয়েছে তাই কারো ওপর ক্রোধ নেই। সে ভুলেই গেছে যে রাখালেরা ওকে প্রায় মেরে ফেলেছিল। ব্রহ্মচারী বললেন, শুধু না খাওয়ার জন্য এমন হয়নি, অবশ্য আরো কারণ আছে ভেবে দেখ। সাপটার তখন মনে পড়ল রাখালেরা আছাড় মেরেছিল। সে তখন বলল, মনে পড়েছে ঠাকুর, রাখালেরা একদিন আছাড় মেরেছিল। তারা অজ্ঞান

জানে না যে আমার মনের কি অবস্থা! আমি যে কাউকে কামড়াব না কারো ক্ষতি করব না তা কি করে জানবে? ব্রহ্মচারী বললেন, ছিঃ তুই নিজেকে রক্ষা করতে জানিস না—তুই এত বোকা! আমি তোকে কামড়াতেই বারণ করেছি তা বলে ফোঁস করতে নয়। ফোঁস করে তাদের ভয় দেখাস নি কেন?' দুষ্ট লোকের সামনে ফোঁস করতে হয়। ভয় দেখাতে হয়, যদি তারা অনিষ্ট করে। তাই বলে তাদের গায়ে বিষ ঢালতে নেই, অনিষ্ট করতে নেই।'

গল্প শেষ করে ভক্তদের প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলছেন, 'চার ধরনের জীব রয়েছে। বদ্ধ, মুমুক্ষু, মুক্ত ও নিত্য।' একটা উপমা দিয়ে বোঝালেন জীবতত্ত্ব। 'ধরো পুকুরে জাল ফেলা হয়েছে। দু-চারটা মাছ এমন সেয়ানা যে কখনোও জালে পড়ে না। এরা হল নিত্যজীব। আবার অনেক মাছ জালে পড়ে, তাদের মধ্যে কিছু মাছ পালাতে চায়; এরা মুমুক্ষু জীব। সব মাছ পালাতে পারে না—দু চারটে পালিয়ে যায়। কিছু মাছ পালাতে চায় না। তারা পাকের মধ্যে চুপ করে মুখ গুঁজে পড়ে থাকে—তারা জানে না যে জেলে তাদের হুড়হুড় করে টেনে তুলবে—এরা হল বদ্ধজীব।'

একটু থেমে ঠাকুর আরো বললেন, 'বদ্ধজীবেরা সংসারে কামিনী-কাঞ্চনে বাধা পড়ে আছে। মনে করে ওতেই বুঝি সে সুখে আর নির্ভয়ে থাকবে। বুঝতে পারে না ওতেই তাদের মৃত্যু হবে। মৃত্যুশয্যায় শুয়েও সে প্রদীপের সলতে বেশি জ্বলতে দেখলে বলে, 'তেল পুড়ে যাবে, সলতে কমিয়ে দাও। এমনি মায়া। এরা ভগবানের কথা ভাবে না। ফালতু কাজে সময় নষ্ট করে।'

পরমপুরুষের জ্ঞানগর্ভ কথায় সবাই চুপ। সকলে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে তাদের গুরু কি গভীর বিষয় কত সহজে ব্যক্ত করলেন। জ্ঞানের কি অপূর্ব সমন্বয়। সব জ্ঞান যেন অশিক্ষিত ওই মানুষটির মধ্যে জমাট বেঁধে গেছে। অথচ গুরুগম্ভীর কোনো আড়ম্বর নেই, রসিয়ে রসিয়ে

নিজের উপলব্ধিকে তুলে ধরা।

একজন ভক্ত জানতে চাইল, 'তাহলে কি সংসারী লোকের কোনো উপায় নেই?'

'উপায় অবশ্যই আছে। নির্জনে সাধনা, সাধুসঙ্গ আর তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়, বিশ্বাস দাও। বিশ্বাস জন্মালেই হয়ে গেল। বিশ্বাসের মত আর জিনিস নেই। এই দেখ না রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ—লঙ্কায় যেতে তাঁকে সেতু বাঁধতে হল। আর হনুমান তাঁর নাম মাত্র করেই এক লাফে সমুদ্র পেরিয়ে গিয়েছিল।'

সবাই হেসে উঠল ওঁর বলার ঢঙে। উনি আবার বললেন, 'বিভীষণ একটি পাতায় রাম নাম লিখে একটি লোককে দিয়ে বলেছিল, এই পাতা কোমরে বেঁধে নিয়ে যাও সমুদ্র পেরিয়ে যাবে। বিশ্বাস করে জলের উপর দিয়ে চলে যাও—কিন্তু মনে রেখ অবিশ্বাস করলেই ডুবে মরবে। লোকটি সত্যি বেশ সমুদ্রের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। হঠাৎ তার খুব ইচ্ছে হল পাতায় কি লেখা আছে একবার দেখে। কাপড়ের খুঁট খুলে সে দেখল শুধু রাম নাম লেখা। একি শুধু রাম নাম! যেই অবিশ্বাস অমনি ডুবে গেল।'

গল্পের মর্মার্থ সবাই বুঝতে পারল। কি সুন্দর কথা। বিশ্বাসই মূলমন্ত্র।

'যার ঈশ্বরে বিশ্বাস রয়েছে—সে যদি মহাপাপ করে ভগবানকে ডেকে বলতে পারে আমি এরকম আর করব না, তার আর ভয় নেই।' সকলের মাঝে নরেন্দ্রনাথ বসেছিলেন। হঠাৎ পরমপুরুষ তাঁকে দেখিয়ে আর সকলকে বললেন, 'একে দেখ, এখানে এ এক রকম আবার অন্য জায়গায় অন্য মূর্তি। এরা নিত্য সিদ্ধের সারি। সংসারে কখনো বাঁধা পড়ে না। একটু বয়স হলেই অন্তর্চক্ষু খুলে যায় তখন ভগবানের দিকে যায়। সংসারে এরা আসে শুধু জীব শিক্ষার কারণে। সংসারের

কোনো বস্তু এদের ভাল লাগে না। কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি জন্মায় না।…বেদে এক রকম পাখির কথা আছে, হোমা পাখি। তারা মাটিতে পড়ে না। খুব উঁচু আকাশে থাকে। সেই আকাশেই ডিম পাড়ে। ডিম নিচে পড়তে থাকে। কিন্তু এত উঁচু যে ডিম অনেকদিন ধরে পড়তে থাকে। পড়তে পড়তেই ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। বাচ্চা পড়তে পড়তে তার চোখ ফোটে, ডানা গজায়। তখন সে বুঝতে পারে নিচে পড়লেই চুরমার হয়ে যাবে তাই তাড়াতাড়ি চোচা করে মার দিকে দৌড় লাগায়। আবার সে উঁচুতে পৌঁছে যায়।'

শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শেষ হতেই নরেন্দ্রনাথ উঠে গেলেন। তাঁকে যেতে দেখে অন্যদের তিনি বললেন, 'ছাখো নরেন গাইতে বাজাতে পড়া-শোনায় সব কিছুতেই ভাল। সেদিন কেদারের সঙ্গে তর্কে কেমন কচকচ করে কেদারের কথাগুলো কেটে দিতে লাগল।' সবাই হেসে উঠল এই শুনে। ঠাকুর নিজেও হাসলেন। হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁগা ইংরাজীতে কি তর্কের কোনো বই আছে?'

মহেন্দ্রনাথ জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ আছে, স্থায়শাস্ত্র।'

'আচ্ছা কি রকম?' শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝতে চাইলেন লজিক কি!

মহেন্দ্রনাথ একটু মুশকিলে পড়লেন। তবু তিনি কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে স্থায়শাস্ত্রকে বোধগম্য করে তুললেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যমনস্ক হয়ে শুনলেন মাত্র। কোনো কিছু বললেন না। ওই কথার শেষও হল ওখানে।

গল্পে গল্পে বিকেল হয়ে গিয়েছিল। সবাই সভাভঙ্গ দিয়ে একটু বেরিয়ে নিল। অপরাহ্নকালে আবার সকলে তাঁর ঘরের দিকে চলল। ঘরের বারান্দায় তখন অদ্ভুত এক ব্যাপার দৃশ্যমান হয়েছে। নরেন্দ্র গান গাইছেন। দু চারজন ভক্তসহ ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু সেই দাঁড়ানো এক আশ্চর্য ব্যাপার। চোখের পাতা পরছে না। নিশ্বাস

প্রশ্বাসের অনুভব নেই। একজন ভক্ত না জানা ভক্তদের বললেন এর নাম সমাধি। প্রচণ্ড ভক্তি ও বিশ্বাসের ঘনীভূত ফল। নিজের মধ্যে নিজে আত্মস্থ হওয়া। সকল আমিত্ব বর্জনের পর অমেয় সাগরে অবগাহন। মুখে একটুকরো ভুবনমোহন হাসি। আনন্দময় রূপদর্শনে আত্মহারা তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণর এরকম সমাধি প্রায়ই হত। ভক্তিতে প্রেমে বিশ্বাসে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন। তখন সমস্ত জাগতিক মায়া সরে যেত। নিস্পন্দ দেহ ও একাগ্র মন নিয়ে ঠাকুর একীভূত হতেন ঈশ্বরে। তাঁর এই সহজ অবস্থান্তর জন্ম জন্মান্তরের তপস্যায়ও মানুষ অর্জন করতে পারে না। অথচ তিনি কি অবলীলায় নিজেকে এই স্তরে নিয়ে যেতেন।

ভক্তদের শিক্ষার জন্যই তাঁর সমাজে বিচরণ। সাধারণ সরল জীবনযাপন। রসের নাগরি নিয়ে বসে সকলের তৃষ্ণা মেটাতেন। হাসি ঠাট্টা আর গল্পের মধ্যে দিয়ে ভক্তি আর বিশ্বাসের দিকে ঠেলে দেওয়া। তীক্ষ্ণ সচেতন ছিল তাঁর রসবোধ। কখন কিভাবে কোন কথায় কি শেখাবেন তা ছিল কণ্ঠস্থ। তাই ভক্তরা কখনো বিমুখ হত না অমৃত পানে।

একদিন বিকেলে সকলকে নিয়ে তিনি বসে আছেন। মাস্টার মহেন্দ্র গুপ্ত এমন সময় এলেন। তিনি সবে এই রসের সাগরের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ঠাকুর অল্পবয়সীদের বলে উঠলেন, 'ঐ রে আবার এসেছে।' কথা শেষ করে হাসিতে উদ্ভাসিত হলেন। দেবতুল্য অমল হাসি। সকলে হেসে উঠল। মহেন্দ্র গুপ্ত ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। এবার ঠাকুর তাঁর হাসির কারণ ব্যক্ত করলেন সবাইর কাছে। 'দেখ, একটা ময়ূরকে একজন একদিন বেলা চারটের সময় আফিম খাইয়ে দিয়েছিল। তারপর দিন ঠিক ওই সময়ে ময়ূর এসে হাজির। তার আফিমের মৌতাত ধরেছে—তাই আবার

আফিম খেতে এসেছে।'

মহেন্দ্রনাথের অবস্থা দেখে সবাই হাসতে লাগল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর তরুণবয়সী ভক্তদের সঙ্গে সমবয়সীর মতো ঠাট্টা ইয়ার্কি করে চলেছেন। এ এক আনন্দের বাজার। সবাই এখানে আনন্দের ভাগ নিতে আগ্রহী। ভক্তি রূপ আনন্দ। মহেন্দ্রনাথ অপরিচিত। সকলকে চেনেন না। তাই গম্ভীর হয়ে বসে সকলের ভাবভঙ্গি দেখছেন। তাঁর এই গাম্ভীর্য পরমপুরুষের দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি তাড়াতাড়ি রামলালকে বললেন, 'দেখ এর একটু উমেব বেশি তাই গম্ভীব। সবাই হাসছে ও কিন্তু চুপ করে বসে আছে।' শ্রীরামকৃষ্ণ নবাগত মহেন্দ্রনাথকে আপন কবার জন্য বললেন, 'হ্যাঁগা তুমি আব নবেন্দ্রনাথ একটু ইংবাজীতে কথা কও, বিচার করো, আমি শুনব।' ভক্তব লজ্জা ভাঙার জন্য ভগবানেব অনুবোধ। দুজনেই তাঁর বালকোপম ইচ্ছায় হেসে উঠলেন। আলাপে মগ্ন হলেন। তর্ক নয়—মাস্টারের তর্ক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল প্রথম দিনেব কথাতেই। এঁর সামনে তর্ক অসম্ভব। সমস্ত তর্কের শেষ ঘনীভূত হয়ে সামনে শরীবী। এখানে তর্ক মানে মূঢ়তা।

বিকেল পড়তেই একে একে সবাই বিদায় নিল। মহেন্দ্রনাথ গেলেন না। নবেন্দ্রনাথও ছিলেন। নবেন্দ্র হাতমুখ ধুতে অন্যদিকে যাওয়ায় একা মহেন্দ্রনাথকে শ্রীবামকৃষ্ণ বললেন, 'প্রথম প্রথম একটু বেশি বেশি আসবি। প্রথম আলাপেব পর নতুন সবাই ঘনঘন আসে। যেমন নতুন পতি—' ঠাকুবের বলার ভঙ্গিতে নরেন্দ্রনাথ ও মহেন্দ্রনাথ উভয়ে হেসে উঠলেন। নবেন্দ্রনাথ অন্য দিক থেকে ফিবে এসেছিলেন। 'ফিরে আসবি তো?' অনুরোধ নয় আকুলতা। নরেন্দ্রনাথই উত্তব করলেন, 'চেষ্টা কবে দেখব।'

তিনজনে ফিরছেন ওর ঘরের দিকে। ঠাকুর বলছেন, 'চাষা হাটে গরু কিনতে গিয়ে তার ল্যাজের নিচে হাত দেয়—হাত দিতেই যে গরু তিড়িং বিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে সেই গরু কেনে। নরেন্দ্র সেই গরুর

জাত। ওর ভিতরে খুব তেজ!' শ্রীরামকৃষ্ণ কথা শেষ করে নিজে হাসছেন। 'নরেন্দ্রর সঙ্গে আলাপ করে আমায় বলো, ও কেমন ছেলে।'

বিদায় নেবার আগে মহেন্দ্রনাথের ইচ্ছে আরেকবার ঠাকুরের শ্রীমুখের গান শোনেন। কি দরদ ওই গানে। মন প্রাণ নিংড়ে নেয়। তিনি সরাসরি তাই ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ আর গান হবে?'

একটু ভেবে ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'না।' হঠাৎ তাঁর কি মনে পড়ল। তাড়াতাড়ি বললেন, 'তুমি এক কাজ করো, কলকাতায় আমি বলরামের বাড়ি যাব, তুমি সেখানে যেও, গান হবে।'

পায়চারি করতে করতে এক সময় তিনি বললেন, 'আচ্ছা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তোমার আমাকে কি বোধ হয়? তুমি কি মনে করো, আমার ক-আনা জ্ঞান হয়েছে?'

'আনা টানা বুঝি না—' মাস্টার উত্তর দিলেন, 'তবে এমন জ্ঞান প্রেম ভক্তি বিশ্বাস বা বৈরাগ্য আর কখনো দেখি নি।'

শ্রীরামকৃষ্ণর জন্মস্থান কামারপুকুর। কামারপুকুরের কাছেই বীরসিংহ গ্রাম। এখানে বিদ্যাসাগর জন্মেছিলেন। ছোটবেলা থেকে পরমপুরুষ বিদ্যাসাগরের দয়ার কথা শুনে এসেছেন। দক্ষিণেশ্বরেও লোকের মুখে মুখে তাঁর দয়া আর পাণ্ডিত্যের কথা। মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলেই পড়ান শুনে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'আমাকে একদিন তাঁর কাছে নিয়ে যাবে? তাঁকে একবার খুব দেখতে ইচ্ছে হয়।'

মাস্টার এই কথা বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন। তিনিও শুনে খুব আনন্দিত হয়ে সম্মতি জানালেন। ঠিক হল এক শনিবার বিকেল চারটের সময় মহেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার শুধু জানতে চেয়েছিলেন, তিনি কি ধরনের পরমহংস? গেড়ুয়াধারী? উত্তরে মহেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'তিনি এক অদ্ভুত পুরুষ

লাল পেড়ে কাপড় পরেন, জামা পরেন, আবার বার্নিশ করা চটি জুতো পায় দেন। কোনো বাইরের চিহ্ন নেই—মনে হয় সাধারণ সংসারী মানুষ অথচ ঈশ্বর ছাড়া কিছুই জানেন না—দিনরাত ওই এক চিন্তাতেই পড়ে আছেন।'

যাবার দিন ঠাকুরের সে কি আনন্দ! যেন পরমাত্মীয় দর্শনে যাচ্ছেন। সারা পথ গাড়িতে গান করছেন। গাড়ি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়ি থেকে নামলেন। মাস্টার পথ দেখিয়ে আগে আগে যাচ্ছেন। চলতে চলতে হঠাৎ তিনি জামার বোতামে হাত দিয়ে মহেন্দ্রনাথকে বলছেন, 'জামার বোতাম খোলা রয়েছে, এতে কোনো দোষ হবে না?'

'আপনি ওড় জন্য ভাববেন না—' মহেন্দ্রনাথ তাঁকে নিশ্চিন্ত করলেন, 'আপনার কিছুতে দোষ হবে না। আপনার বোতাম দেবার দরকার নেই।' ছোট ছেলেকে বোঝালে সে যেমন নিশ্চিন্ত হয় ঠাকুরও তেমনি নিশ্চিন্ত হলেন।

সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে প্রথম ঘরটিতেই একটি টেবিলের পাশে বিদ্যাসাগর মহাশয় বসেছিলেন। ঘরে তাঁর দু একজন বন্ধু ছিল। ভক্তগণসহ ঠাকুর ঘরে ঢুকতেই বিদ্যাসাগর মহাশয় দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে অভ্যর্থনা করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এক দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরকে দেখছেন ও মৃদু মৃদু হাসছেন। যেন তাঁর ভাবে মনে হচ্ছিল পূর্ব পরিচিত কাউকে দেখছেন।

বিদ্যাসাগর শ্রীরামকৃষ্ণের চেয়ে বয়সে বড়। পরনে থান কাপড়, গায়ে হাতকাটা ফ্লানেলের জামা। বিরাট একটি মাথা—উঁচু কপাল, সামান্য বেঁটে তিনি। এই পুরুষকে চোখের সামনে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হচ্ছিলেন। তখনো তিনি দাঁড়িয়ে। কিছুক্ষণ ভাবের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইলেন। ভাব দমনের জন্য মাঝে মাঝে বলছেন, 'জল খাব।' খবর পেয়ে বাড়ির অন্যান্য আত্মীয় বন্ধুরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখবার জন্য

এসে দাঁড়াল। ভাবাবিষ্ট অবস্থাতেই তিনি বেঞ্চের উপর বসতে বসতে পাশে বসা একটি ছেলেকে দেখে তার অন্তরের ভাব বুঝতে পারলেন। একটু সরে বসে স্বগত বললেন, 'মা এ ছেলের বড় সংসারে অশান্তি। তোমার অবিদ্যার সংসার, এ অবিদ্যার ছেলে!' ছেলেটি পড়াশুনায় সাহায্য প্রার্থনার জন্য বিদ্যাসাগরের কাছে এসেছিল।

তাঁর স্বগতোক্তিও কি লোকশিক্ষা! তিনি কি বলতে চাইলেন যে, লোক ব্রহ্মবিদ্যার জন্য ব্যাকুল নয়, অর্থকরী বিদ্যা তার কাছে ভার মাত্র—এর সার্থকতা নেই।

বিদ্যাসাগর একজনকে জল আনতে বললেন। মহেন্দ্রনাথের কাছে জানতে চাইলেন কোনো রকম খাবার শ্রীরামকৃষ্ণ খাবেন কিনা। মাস্টার স্বীকৃতি জানালে বিদ্যাসাগর ভিতরে গিয়ে কিছু মিষ্টি নিয়ে এলেন। ঠাকুর সেই মিষ্টি গ্রহণ করলেন। সকলেই মিষ্টিমুখ করল। সামনে অন্য একটি ছেলেকে দেখিয়ে পরমপুরুষ বললেন, 'এ ছেলেটি খুব সৎ, ফল্গুনদীর মতো—উপরে বালি কিন্তু একটু খুঁড়লেই জল পাওয়া যাবে।'

একঘর লোক। সকলে দুই মহাপুরুষের আলাপ শুনছে। ঠাকুর কথা শুরু করলেন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে, 'এতদিনে আজ সাগরে এসে মিললাম। খাল বিল নদনদী বহু দেখেছি। এবার সাগর দেখছি।' তাঁর এই অপূর্ব কথায় সবাই হেসে উঠল।

বিদ্যাসাগরও হেসে উত্তর দিলেন, 'তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান।' এবারও উপস্থিত সবাই হাসিতে মুখর হল।

শ্রীরামকৃষ্ণ অপ্রতিভ হলেন না। সরস্বতী তাঁর জিহ্বার আগায়। তিনি বলে উঠলেন, 'নাগো তা কেন? নোনা জল কেন, তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর।' হাসির লহরী ঘরের বাতাসকে কাঁপিয়ে দিল। 'ক্ষীর সমুদ্র।' কি কথার কি সুন্দর উত্তর। কি উপমা! রসবোধের অপূর্ব প্রকাশ।

এবার আর বিদ্যাসাগর মহাশয় কোনো কথা বলতে পারলেন না।

শুধু বললেন, 'তা বলতে পারেন বটে।' তিনি চুপ করে গেলেন। শুনতে চান দেবময় বাণী। ঠাকুর বলতে লাগলেন তাঁর সেই সহজ স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিমায়। 'তোমার কাজ হল সাত্ত্বিক কাজ। সত্ত্বের রজঃ। সত্ত্বগুণ থেকে দয়া জন্মায়। দয়ার জন্য যে কাজ তা রাজসিক বটে, তবু এতে দোষ নেই, এ সত্ত্বেও রজোগুণ।' কথাটা বোঝাবার জন্য ব্যাখ্যা দিলেন তিনি, 'শুকদেবাদি লোককে শিক্ষা দেবার জন্য দয়া রেখেছিলেন—ভগবান বিষয়ে জানানোর জন্য। তুমি বিদ্যা অন্নদান করছ এও খুব ভাল—নিষ্কাম করতে পারলেই এতে ঈশ্বর পাওয়া যায়। কেউ নাম করার জন্য, পুণ্য করার জন্য করে। তাদের কাজ নিষ্কাম নয়। আর তুমি তো সিদ্ধ আছই।'

বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রশ্ন করলেন, 'তা আপনি বুঝলেন কেমন করে?'

হেসে উত্তর দিলেন ঠাকুর 'আলু পটল সেদ্ধ হলে নরম হয়; তা তুমি তো খুব নরম। তোমার এত দয়া।'

'কলাইবাটা সেদ্ধ কিন্তু খুব শক্ত হয়।' হেসে বিদ্যাসাগর উত্তর দিলেন।

'তুমি তা নও গো—' শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন, 'শুধু পণ্ডিত যারা তারা দরকচা পড়া। না এদিক না ওদিক। শকুনি খুব উঁচুতে ওঠে কিন্তু ওর নজর ভাগাড়ে। যারা শুধু পণ্ডিত—তারা ওই শুনতেই, তাদের আসক্তি কামিনী-কাঞ্চনে, শকুনির মতো মড়া খুঁজছে। অবিদ্যার সংসার আসক্তিতে ভরা, দয়া ভক্তি বৈরাগ্য এসব বিদ্যার ঐশ্বর্য।' সবাই চুপ। বিদ্যাসাগর এই পরমপুরুষের বাণী শুনছেন মনোযোগ দিয়ে।

বিদ্যা অবিদ্যা নিয়ে বলতে বলতে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের কথায় এলেন। মহাপণ্ডিত বিদ্যাসাগর। তিনি ষড়্দর্শন পড়েছেন। ঈশ্বরের বিষয় তাতে জানা যায় না। সমস্ত দর্শনের মধ্যে দিয়ে ওই মহাপণ্ডিত যা উপলব্ধি করতে পারেন নি—আজ তাই বুঝি জানতে বসেছেন একজন

নিরহঙ্কার নিরক্ষর মানুষের মুখ থেকে। শাস্ত্রের কথার কচকচি নয়, শব্দের কাঠিন্য বলে কিছু নেই। সমস্তটাই রসানুভূতির। সহজতম বিশ্বাসের প্রজ্ঞা। 'ব্রহ্ম বিদ্যা অবিদ্যার পার। তিনি মায়াতীত।' ঠাকুর বলছেন অনবদ্য ভঙ্গিতে, 'এ জগতে বিদ্যামায়া অবিদ্যামায়া দুইই বর্তমান। একদিকে জ্ঞান ভক্তি অন্যদিকে কামিনী-কাঞ্চন। যেমন সৎ আছে তেমনি অসৎ। ভালমন্দ দুইই পাশাপাশি। কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। ভাল মন্দ সৎ অসৎ সবই জীবের পক্ষে—ওতে তাঁর কিছুই হয় না। যেমন প্রদীপের সামনে কেউ ভাগবৎ পড়ছে আবার কেউ টাকা জাল করছে। প্রদীপ নির্লিপ্ত, নির্বিকার। সূর্য শিষ্ট ও দুষ্ট উভয়কেই আলো দিচ্ছে। যদি জিজ্ঞেস করো দুঃখ পাপ অশান্তি তাহলে এসব কি? তার উত্তর হল, এ সবই জীবের পক্ষে। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। সাপের ভেতর বিষ আছে, কামড়ালে তাতে মারা যায়। সাপের কিছু হয় না। ব্রহ্ম কি—তার স্বরূপ মুখে বলা যায় না। সব জিনিস এঁটো হয়ে গেছে। বেদ পুরাণ তন্ত্র ষড়দর্শন সব উচ্ছিষ্ট। মুখে পড়া হয়েছে, উচ্চারিত হয়েছে তাই এঁটো—কিন্তু একমাত্র একটি জিনিস এঁটো হয়নি সে ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি আজ পর্যন্ত কেউ মুখে বলতে পারে নি।'

'বাঃ এই কথাটি তো বড় সুন্দর!' বিদ্যাসাগর মহাশয় তারিফ করলেন। 'আজ এই একটি নতুন কথা শিখলাম।'

'এক বাপের দু ছেলে।' ঠাকুর গল্প বলে চলেছেন। 'ব্রহ্মবিদ্যা শেখবার জন্য বাবা আচার্যর কাছে ছেলে দুটোকে দিলেন। ক-বছর বাদে তারা গুরুগৃহ থেকে বাড়ি ফিরল। বাবাকে প্রণাম করল দুজন। বাবার ইচ্ছা পরীক্ষা করে দেখেন ওদেন ব্রহ্মবিদ্যা কেমন হয়েছে। প্রথমে বড় ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা তুমি তো সব পড়েছ এবার বলোতো ব্রহ্ম কি রকম? বড় ছেলেটি বেদ থেকে শ্লোক তুলে তুলে ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝাতে লাগল। বাবা চুপ করে রইলেন। এরপর তিনি ছোট ছেলেকে একই প্রশ্ন করলেন। সে

কিন্তু কোনো কিছু না বলে মাথা নিচু করে রইল। বাবা এবার খুশি হয়ে উঠে বললেন, বাবা তুমিই একটু যা বুঝেছ। ব্রহ্ম যে কি তা মুখে বল যায় না। মানুষ ভাবে আমরা তাঁকে জেনে ফেলেছি। এক পিঁপড়ে চিনির পাহাড়ে গিয়েছিল। এক দানা চিনিতেই পেট ভরে গেল। আর এক দানা মুখে করে বাসায় ফিরতে ফিরতে ভাবল, এবার এসে পাহাড়টাই নিয়ে যাব। ক্ষুদ্র জীবেরা এমনই মনে করে। ধারণা করতে পারে না ব্রহ্ম বাক্য মনের অতীত। যে যতই বড় হোক না কেন, তাঁকে জানাবে কি করে? শুকদেবাদিরা হলেন ডেঁও পিঁপড়ে—চিনির আট দশটা দানা না হয় মুখে করেছেন। তবে বেদ পুরাণের বলাটা হল এই রকম—একজন সাগর দেখে এলে তাকে যখন কেউ প্রশ্ন করে কেমন দেখলে? সে মুখ বিস্তার করে বলে, আঃ কি দেখলুম! কি শব্দ কি ঢেউ! ব্রহ্মের কথাও তেমনি। বেদ আছে তিনি আনন্দস্বরূপ—সচ্চিদানন্দ। শুকদেব প্রমুখরা এই সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে দেখেছেন ছুঁয়েছেন এইমাত্র। এক মত বলে ওঁরা এ সাগরে নামেন নি। এখামে নামলে আর ফেরা যায় না। সমাধিস্থ হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয়—ব্রহ্ম দর্শন হয় কিন্তু সেই অবস্থান্তরে বিচার স্তব্ধ হয়ে যায় মানুয় চুপ হয়ে পড়ে। ব্রহ্ম কি জিনিস বর্ণনা করার ক্ষমতা থাকে না। নুনের পুতুল সাগর মাপতে গিয়েছিল। কত জল সে তা বলবে। কিন্তু খবর দেওয়া তার হল না। যেই নামল অমনি গলে গেল।'

ঠাকুরের এই কথায় আনন্দে উপস্থিত সবাই হাসতে লাগলেন। তার মধ্যেও একজন প্রশ্ন করলেন, 'যিনি সমাধিস্থ হন, যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে তিনি কথা বলেন না?'

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাসাগরকে উদ্দেশ্য করেই বলতে লাগলেন, 'শঙ্করাচার্য লোকশিক্ষার জন্য বিদ্যার 'আমি' ত্যাগ করেন নি। ব্রহ্ম-জ্ঞান হলে মানুষ চুপ হয়ে পড়ে। দেখার আগে পর্যন্তই বিচার—

তারপর আর কি থাকে। যতক্ষণ কড়ায়ে ঘি কাঁচা থাকে ততক্ষণ তার শব্দ—পাকা হলে আর শব্দ নেই। যেই আবার সেই ঘিয়ে লুচি পড়ে তখন আবার ছ্যাঁক ছ্যাঁক আওয়াজ হয়। লুচি পাকা হলেই শব্দ বন্ধ হয়ে যায়। তেমনি সমাধিস্থ লোক শিক্ষা দেবার জন্য নেমে আসে—কথাবার্তা বলে। ফুলে বসবার আগে পর্যন্তই মৌমাছি ভ্যান ভ্যান করতে থাকে, মধুপান শুরু হলে চুপচাপ। আবার মাতাল হয়ে দুচারবার গুনগুন করে এই পর্যন্ত। পুকুরে কলসীতে জল ভরবার সময় শব্দ হয়—কলসী ভরে গেলে শব্দ থাকে না তবে অন্য কলসীতে যদি ঢালা-ঢালি করা হয় আবার শব্দ হবে।'

সুন্দর উপমাগুলি শেষ হতে সবাই অনাবিল আনন্দে হেসে উঠল। এমন কথা, রসিয়ে রসিয়ে ব্রহ্মবিষয়ে এমন অদ্ভুত কথকতা তারা তো শোনে নি। এ কেমন সাধু! কেমন পণ্ডিত যে এত সহজে এমন শক্ত কথা মনের ভেতরে ঢুকিয়ে দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মহাপণ্ডিত শ্রোতা পেয়ে আনন্দে তাঁকে নিজের উপলব্ধি ব্যাখ্যা করলেন। এ জগতে যে ব্যাখ্যা তুলনারহিত। এমন বলবার ঢঙ, এমন ভঙ্গিমা এ জগতে দ্বিতীয় কেউ দেখায় নি। তিনি বলতে লাগলেন আবার, 'ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল। বিষয় বুদ্ধির সামান্য থাকলে ব্রহ্ম পাওয়া যায় না। ঋষিরা ব্রহ্মকে পাওয়ার জন্য কত পরিশ্রম করতেন। সারাদিন একা নির্জনে চলে যেতেন। ধ্যান চিন্তা করতেন। ফিরতেন রাত্রে। সামান্য ফল-মূল আহার করতেন। দেখা শোনা ছোঁয়া এই সব থেকে মনকে আলাদা রাখতেন। তবেই ব্রহ্মকে বোধে অনুভব করতেন। কলিতে প্রাণ অন্নগত, দেহবুদ্ধির লোপ হয় না। এ অবস্থায় সোহহং বলা ঠিক না। সবই করা হচ্ছে আবার 'আমিই ব্রহ্ম' এ কথা উপযুক্ত নয়। যাদের বিষয় থেকে মন যায় না, কোনোমতে আমি-র বিলুপ্তি ঘটে না তাদের আমি দাস আমি-ভক্ত এই অভিমান ভাল। ভক্তিপথে থাকলেও তাঁকে লাভ করা যায়।

জ্ঞানী নেতি নেতি বলে সবকিছু ত্যাগ করে তবেই ব্রহ্মকে জানতে পারে। যেমন সিঁড়ির ধাপ ছাড়িয়ে ছাদে পৌঁছান যায়। কিন্তু বিজ্ঞানী তিনি আরো বিশেষ কিছু দেখেন। তিনি দেখতে পান ছাদ যে জিনিসে তৈরি সিঁড়িও সেই জিনিস দিয়ে হয়েছে। নেতি নেতি করে যাঁকে ব্রহ্ম বলে মনে হচ্ছে তিনিই আবার জীবজগৎ হয়েছেন। বিজ্ঞানীর চোখে তাই যিনি নির্গুণ তিনিই সগুণ। ছাদে লোক অনেকক্ষণ থাকতে পারে না তাই আবার নেমে আসে। যাঁরা সমাধিস্থ হয়ে ব্রহ্মকে দেখেছেন তাঁরাই নেমে এসে দেখতে পান তিনিই এই জীব জগৎ! সা রে গা মা পা ধা নি—নিতে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যায় না। 'আমি' যায় না বলেই বোধ হয় তিনিই আমি, তিনিই এই জীবগতের সবকিছু। এরই নাম বিজ্ঞান। জ্ঞানীর পথও পথ, জ্ঞান ভক্তির পথও পথ আবার ভক্তির পথও পথ—সবই সত্য। সমস্ত পথ দিয়েই তাঁর কাছে পৌঁছানো যায়। তাই তিনি যতক্ষণ 'আমি' রেখে দেন ততক্ষণ ভক্তিপথই সোজা। বিজ্ঞানীর চোখে ব্রহ্ম অটল নিষ্ক্রিয় সুমেরুবৎ। তিনি নির্লিপ্ত। বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে তিনিই ভগবান যিনি ব্রহ্ম। যিনি গুণাতীত তিনিই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। যে বাবুর বাড়িঘর নেই সে আবার বাবু কিসের। ঈশ্বর ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ—সে ব্যক্তির ঐশ্বর্য না থাকলে কে তাঁকে মানত!'

পুনরায় সবাই হেসে উঠলেন ঠাকুরের কথায়। তিনি অক্লান্তে বলে চলেছেন। বলার ভঙ্গিমায় বালকের সারল্য অথচ ভগবানের ক্ষমতা। বলছেন, 'দেখ না এই জগৎ কি সুন্দর! কত রকম জিনিস এখানে। চাঁদ সূর্য তারা। কত রকম প্রাণী। বড় ছোট ভাল মন্দ। কারো শক্তি বেশি আবার কারো কম।'

বিদ্যাসাগর মশায় প্রশ্ন করলেন, 'তিনি কি কারুকে বেশি কারুকে কম শক্তি দিয়েছেন?'

'তিনি ভগবানরূপে সর্বত্র রয়েছেন। এমন কি পিঁপড়েতে পর্যন্ত

কিন্তু শক্তি বিশেষে। তাই যদি না হবে তবে একজন লোক দশজন লোককে হারিয়ে দেয় কি করে? আর তা না হলে তোমাকেই বা সবাই মানে কেন? তোমার কি শিং বেরিয়েছে দুটো?' নিজেই হাসলেন। 'তোমার দয়া বিদ্যা আছে, অন্যের চেয়ে তাই তোমাকে মানে দেখতে আসে, তুমি কি একথা মানো না?'

বিদ্যাসাগর মহাশয় উত্তর না দিয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু নেই। তাকে জানবার জন্য পাবার জন্যই বই পড়া।. পড়ার মধ্যে দিয়ে তাঁকে খোঁজা, বিজ্ঞানী ভক্তি নিয়ে থাকে কেন? এর উত্তর তাঁর আমি যায় না। সমাধি অবস্থায় গেলেও আবার এসে পড়ে। সাধারণ মানুষের অহং মরে না। অশ্বত্থ গাছ কেটে দাও, পরদিনই দেখবে আবার ফেকড়ি বেরিয়েছে।' সবাই হেসে উঠলেন। এমন সরস মন্তব্য এর আগে কে বলেছে ধর্ম-শিক্ষা দিতে গিয়ে। এখানেই শ্রীরামকৃষ্ণের বৈশিষ্ট্য; এখানেই তিনি সমস্ত মহাপুরুষদের উপরে চলে গেছেন। অফুরাণ কথার ঝুলি তাঁর। শেষ নেই। নতুন ভাবে উপমা নতুন গল্প।

তিনি বলতে লাগলেন, 'জ্ঞানলাভের পরও 'আমি' এসে পড়ে। কেউ হয়তো স্বপ্নে বাঘ দেখেছিল, তারপর জেগেও তার বুক দুরদুর যায় না। তাই ঈশ্বরকে তুহুঁ অর্থাৎ তুমি বলাই ভাল। হে ঈশ্বর তুমি প্রভু আমি দাস। আমি ছেলে তুমি মা। রামচন্দ্র হনুমানকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি আমায় কি ভাবে দেখ? হনুমান উত্তর দিয়েছিলেন, যখন আমি বলে আমার বোধ থাকে তখন দেখি তুমি পূর্ণ আমি অংশ তুমি প্রভু আমি দাস। আর যখন তত্ত্বজ্ঞান হয় তোমার আমার ভেদ থাকে না। তখন তুমিই আমি আমিই তুমি।

'আমি ও আমার এ দুই বোধ অজ্ঞান। আমার বাড়ি আমার টাকা আমার বিদ্যা এসব অজ্ঞান থেকে আসে। আর হে ভগবান, তুমি কর্তা, বাড়ি পরিবার ছেলেপুলে লোকজন বন্ধুবান্ধব এসব তোমার

জিনিস এ ধারণা জ্ঞান থেকে জন্মায়। মৃত্যুকে সব সময় মনে রাখা দরকার। মৃত্যুর পর কিছুই থাকে না। এখানে কতগুলি কাজ করতে আসা মাত্র। যেমন অনেকে গ্রামে থাকে—কলকাতায় কাজ করতে আসে। বড়লোকের বাগানের সরকার কেউ যদি বাগান দেখতে আসে তো তাকে বলে এ বাগানটি আমাদের, এ পুকুর আমাদের। কিন্তু কোনো দোষে বাবু তাকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলে তার আমের সিন্দুকটা নিয়ে যাবার যোগ্যতা থাকে না, দারোয়ান দিয়ে বাবুই ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়।'

সবাই হাসতে লাগলেন। এমন মজার মজার কথা এমন করে কে বলেছে এর আগে!

পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ বলে চলেছেন, 'ঈশ্বর দু-কথায় হাসেন। একবার যখন কবিরাজ রোগীর মাকে বলে, মা তোমার ভয় কি? আমি তোমার ছেলেকে ভাল করে দেব। হাসির কারণ, তিনি ভাবেন আমি মারছি এ কিনা বলে বাঁচাব। কবিরাজ নিজেকে কর্তা ভেবে ঈশ্বর যে কর্তা তা ভুলে গেছে। দ্বিতীয়বার ঈশ্বর হাসেন যখন দু-ভাই দড়ি ফেলে জায়গা ভাগ করে। ঈশ্বর তখন ভাবেন এই জগৎ পৃথিবী সব আমার, আর ওরা কিনা বললে এ জায়গা আমার এ জায়গা তোমার। তাঁকে কি বিচার করে জানা যায়! তাঁর দাস হয়ে তাঁর শরণাগত হয়ে ডাক।' বিদ্যাসাগরের দিকে হঠাৎ তাকিয়ে তিনি প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা তোমার কি ভাব?'

বিদ্যাসাগর মৃদু মৃদু হাসছেন। বললেন, 'আচ্ছা সেকথা একদিন একলা আপনাকে বলব।' বিদ্যাসাগরের উত্তরে সবাই আরেকবার হেসে উঠলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, 'তাঁকে পাণ্ডিত্য দিয়ে বিচার করে জানা যায় না। বিশ্বাস আর ভক্তি চাই। হনুমানের রাম নামে এত বশ্বাস তাই সাগর পার হয়ে গেল। অথচ স্বয়ং রামকে সাগর বাঁধতে

হল। বিশ্বাস আর ভক্তি। ভক্তিতে তাঁকে সহজে পাওয়া যায়।’ কথা বলতে বলতে ঠাকুর গান গাইতে শুরু করলেন। গানের ভেতরেই সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। দেহ উন্নত স্থির, হাত জোড়করা, চোখে কোনো স্পন্দন নেই। সবাই এই অদ্ভুত অবস্থা দেখছেন। স্তব্ধ বিদ্যাসাগরও সেই অম্লান জ্যোতির্ময় মূর্তির দিকে তাকিয়ে আছেন। একটু বাদেই তিনি ঠিক হলেন। মুখে হাসি ফুটল। কথা বলতে শুরু করলেন, ‘ভাব ভক্তি এর মানেই ভালবাসা। ব্রহ্ম আর শক্তিতে কোনো ভেদ নেই। যখন তিনি চুপচাপ নিষ্ক্রিয় তখন তিনি ব্রহ্ম, যখন মনে করি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন, তখন তাঁকে আদ্যাশক্তি বলি, কালী বলি। মা বলে ডাকি। মা বড় ভালবাসার জিনিস ঈশ্বরকে ভাল-বাসতে পারলেই তাঁকে পাওয়া যায়। ভাব ভক্তি ভালবাসা আর বিশ্বাস। পূজা যাগ-যজ্ঞ এসব কিছুই কিছু নয়। যদি তাঁর ওপর ভালবাসা দেখা দেয় তবে আর ওসবের দরকার হয় না। যতক্ষণ হাওয়া পাওয়া যায় না ততক্ষণই পাখার দরকার। যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি আসে তখন পাখা রেখে দেওয়া হয়। তুমি যেসব কাজ করছ তা সবই সৎকাজ। যদি আমি কর্তা এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিষ্কাম-ভাবে করতে পারে তাহলে তো কথাই নেই। নিষ্কাম কাজের মধ্যে দিয়ে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি অনুরাগ জন্মায়। এ রকম নিষ্কাম কাজের ভেতর দিয়ে শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর লাভ ঘটে। কিন্তু যত তাঁর ওপর ভক্তি ভাল-বাসা বাড়বে তত তোমার কাজ কমে যাবে। গেরস্থ বাড়ির বউর পেটে যখন ছেলে আসে শাশুড়ী তার কাজ কমিয়ে দেয়। যত মাস বাড়ে শাশুড়ী তত কাজ কমায়। দশমাসে আর কাজ করতেই দেয় না। পাছে ছেলের কোনো ক্ষতি হয় প্রসবে গোলমাল হয়। তুমি যেসব কাজ করছ এতে তোমার নিজের উপকার। নিষ্কামভাবে কাজ করে গেলে চিত্তশুদ্ধি হবে ভগবানে প্রেম জন্মাবে। সেই প্রেম থেকেই তাঁকে পেয়ে যাবে। মানুষ এই পৃথিবীর উপকার করে না, তিনিই করেছেন।

যিনি চাঁদ সূর্য করেছেন, যিনি মা বাপের স্নেহ, মহতের ভেতর দয়া ও সাধু ভক্তের মধ্যে ভক্তি দিয়েছেন। কামনাহীন হয়ে যে মানুষ কাজ করে যাবে সে নিজেরই কল্যাণ করবে। তোমার ভেতর সোনা আছে এখনো এ খবর পাওনি। একটু মাটি চাপা আছে। খোঁজ পেলেই কাজ কমে যাবে। গেরস্থ বউর ছেলে হলে তখন সেই ছেলেকে নিয়েই নাড়াচাড়া, সংসারের অন্য কাজ শাশুড়ী করতে দেয় না।'

গেরস্থর বউ তুলনায় সবাই হেসে উঠল। কি সুন্দর গ্রাম্য কথার যোগান। লোক শিক্ষার জন্য লোককথা। যে কথা সাধারণ মানুষের বুঝে নিতে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয় না তেমনি রসের কথা আমদানী করতেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তসঙ্গে।

'আরো এগিয়ে যাও। চরৈবতি। যত এগোবে তত লাভ। এক কাঠুরে বনে কাট কাটতে গিয়েছিল। সেখানে এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে দেখা। তিনি তাকে এগোতে বললেন। একটু এগোতেই সামনে দেখল চন্দন গাছ! আরো এগোল দেখল রুপোর খনি, আরো—এবার সোনার খনি। একদম বনের শেষ প্রান্তে কেবল হীরা মানিক—কাঠুরিয়ার সব লাভ হল।'

নিষ্কাম কর্ম করতে পারলে ঈশ্বরের ভালবাসা হয়—তাঁর দয়ায় তাঁকে লাভ হয়, দেখা যায়; তাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়, যেমন তোমার সঙ্গে কথা বলছি।'

শ্রীরামকৃষ্ণর এ কথায় সকলে বাক্যহীন হয়ে পড়ল। কি গভীর আত্মবিশ্বাস আর ঈশ্বরানুরাগ! তাঁর সঙ্গে কথা বলা—এযে কল্পনাতীত কিন্তু সন্দেহ করার অবকাশ কোথায়! এমন অকপট উক্তির সামনে সন্দেহ ফুৎকারে উড়ে যায়। নিজে ঈশ্বররূপী না হলে এমন কথা বলা যায় না। উনি মানুষ নন—মনুষ্যরূপী ভগবান। সেই ভগবান জীবের কল্যাণের জন্য কথা বলছেন। মন্ত্রমুগ্ধ করে শ্রোতাদের হৃদয়ে ভক্তিকে রোপণ করছেন।

রাত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ফিরবেন দক্ষিণেশ্বরে। যাবার আগে তিনি বলে উঠলেন, 'এসব যা কথা বললাম সবই বাহুল্য মাত্র। আপনি সব জানেন—তবে সে জানার খবর নেই। বরুণ রাজার ভাণ্ডারে কত শত রত্ন। কিন্তু তিনিও তা জানেন না। খবর রাখেন না।'

শেষ সময়ের রসিকতাটুকুতে সবাই হেসে উঠল। বিদ্যাসাগর মহাশয় হেসে উত্তর দিলেন, 'সে কথা আপনি বলতে পারেন।'

'হ্যাঁ গো—শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় বললেন, 'অনেক বাবুই চাকর-বাকরের নাম বলতে পারে না। আবার জানেও না বাড়ির কোথায় কি দামী জিনিস আছে।' সবাই আনন্দিত মনে চুপ করে আছেন। ঠাকুর বিদ্যাসাগরকে নিমন্ত্রণ করলেন, 'একবার রাসমণির তৈরি বাগান দেখতে যাবেন। খুব চমৎকার জায়গা।'

'যাব বৈকি। আপনি এলেন আর আমি যাব না!' বিদ্যাসাগর মহাশয় বলে উঠলেন।

'আমার কাছে! ছি ছি!' শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে উঠলেন।

তাঁর এই রহস্যময় উক্তি কেউ বুঝতে পারলেন না। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও ধরতে পারেন নি। তাই একটু অবাক হয়েই বললেন, 'এমন কথা বললেন কেন? আমি বুঝতে পারি নি। আমাকে বুঝিয়ে দিন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে উঠলেন। উত্তর দিলেন, 'আমরা যে জেলে ডিঙি।' সবাই অনাবিল হাসিতে উদ্ভাসিত হলেন। 'খাল বিল আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি তো জাহাজ, কি জানি যেতে গিয়ে যদি চড়ায় লেগে যায়।' বিদ্যাসাগর চুপ। এমন প্রাণখোলা রসের কথা তিনি বহু দিন শোনেন নি। কোনো খোশামুদি নয়—অন্তরের সহজ প্রকাশ। 'তবে এ সময় জাহাজও যেতে পারে।' শ্রীরামকৃষ্ণ কথা শেষ করলেন।

'হ্যাঁ এটা তো বর্ষাকাল!' বিদ্যাসাগর এবার হেসে উঠলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিদায় নিলেন। বিদ্যাসাগর প্রণাম করলেন নবযুগের নবীন শিক্ষাগুরুকে, যিনি ভক্তি আর বিশ্বাসের গভীরতায় বাংলাদেশে ধর্মের নতুন জোয়ার এনেছিলেন। দু-জনের মধ্যে আর কোনো দিন দেখা হয় নি। কথা দিয়েও কর্মব্যস্ত বিদ্যাসাগর যেতে পারেন নি। ঠাকুরেরও অবসর হয় নি দ্বিতীয় সাক্ষাতের। কিন্তু ওই একদিনের সাক্ষাতেই উভয় উভয়কে চিনেছিলেন হৃদয় দিয়ে।

একদিন বিকেলে পরমপুরুষ ভক্ত সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর ঘরে বসে আছেন। বিকেল চারটে। এমন সময় কেশব সেনের শিষ্যেরা এসে প্রণাম করল। তারা জানাল শ্রীযুক্ত কেশব সেন একখানা জাহাজ নিয়ে ঘাটে এসে অপেক্ষা করছেন—শিষ্যদের পাঠিয়েছেন তাঁকে নেবার জন্য। তিনি জাহাজ করে বেরিয়ে আসবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বালকবৎ। তাঁর সব কিছুতেই আনন্দ। সানন্দে তিনি কেশবের ডাকে সাড়া দিলেন। নৌকা করে গিয়ে জাহাজে উঠতে হবে। নৌকায় পা দিয়েই ঠাকুর সমাধিস্থ! শ্রীমহেন্দ্রনাথ এসেছেন কেশব সেনের সঙ্গে। তিনি জাহাজে দাঁড়িয়ে পরমপুরুষের ভাবান্তর দেখছেন। শ্রীমহেন্দ্রনাথ দেখতে এসেছেন দুই ধর্মগুরুর মিলন কি রকম হয়। কেশব সেন ইংরেজী শিক্ষিত ব্যক্তি। নব্য বাংলার একজন পুরোধা তিনি। ব্রাহ্ম সমাজের মাথা। হিন্দুর দেবদেবী পুজোকে তিনি পৌত্তলিকতা বলেছেন বহুবার। অথচ সেই তিনিই অগাধ শ্রদ্ধা করেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। এ এক অদ্ভুত বিস্ময়! শুধু শ্রদ্ধা নয়, অন্তরের আকর্ষণে ছুটে আসেন তাঁকে দেখতে।

নৌকা জাহাজের গায়ে ভিড়ল। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখবার জন্য ভিড় হয়েছে। কেশবচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে উঠলেন নিরাপদে ঠাকুরকে জাহাজে তুলতে। অনেক কষ্টে জ্ঞান ফিরিয়ে তাঁকে একটি কামরায় নেওয়া হল।

একটা চেয়ারে শ্রীরামকৃষ্ণ বসলেন। সামনে টেবিল। অন্য চেয়ারে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গী বিজয় গোস্বামী ও কেশব সেন। চেয়ারে বসে ঠাকুর আবার সমাধির মধ্যে ডুবে গেলেন। কামরার জানালা খোলা হল। পুনরায় সমাধি ভাঙল। ব্রাহ্ম ভক্তরা এই অবস্থান্তর লক্ষ্য করছে গভীর মনোযোগে। ঠাকুর নিজের মনে অস্ফুটে বলছেন, 'মা আমায় এখানে আনলি কেন? আমি কি এদের বেড়ার ভেতর থেকে রক্ষা করতে পারব?' এই কথার অর্থ কি। এই বেড়া তাহলে কি সংসারের বন্ধন!

শ্রীরামকৃষ্ণ পুরো প্রকৃতিস্থ হলেন। গাজীপুরের নীলমাধববাবু ও একজন ব্রাহ্মভক্ত প্রসঙ্গত পওহারী বাবার কথা উত্থাপন করলেন। ব্রাহ্মভক্তটি বললেন, 'এরা পওহারী বাবাকে দেখেছেন। তিনি গাজীপুরে থাকেন। আপনার মতোই তাঁর ভাবসাব।' ঠাকুর কথা বলতে পারছেন না। শুধু মৃদু হাসলেন। নিজের দেহের দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বললেন, 'খোলটা।'

বালিশ ও তার খোল। দেহী আর দেহ। শ্রীরামকৃষ্ণ কি বলতে চাইছেন এ দেহ থাকে না? দেহর ভেতর যিনি শুধু তারই বিনাশ নেই! দেহ নষ্ট হয়ে থাকে সুতরাং তার আদর করে লাভ কি। এবার তিনি অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠেছেন। বললেন, 'তবু একটা কথা আছে। ভক্তের হৃদয়ে তিনি বাস করেন। সর্বভূতেই তিনি—তবু ভক্ত হৃদয়ে তাঁর বিশেষ স্থান। ভক্তর হৃদয় হল ভগবানের বৈঠকখানা। জ্ঞানীরা বলে ব্রহ্ম, যোগীরা বলে আত্মা, আর ভক্ত তাকেই বলে ভগবান। যেমন একই ব্রাহ্মণ যখন রান্নার কাজ করে তখন রাঁধুনি, পুজো করবার সময় তাঁরই নাম পূজারী। জ্ঞানীদের কাছে কিছুই নেই। মন নেতি নেতি। জগৎ স্বপ্নময়—ব্রহ্মই সত্য। ভক্তের কাছে তা নয়। সে সব অবস্থাকেই স্বীকার করে। উত্তম ভক্ত বলে, তিনিই সব হয়েছেন। ভক্তের ইচ্ছে চিনি খাবার, চিনি হওয়া না।'

সবাই হেসে ওঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরিচিত ভঙ্গিমায় আলাপ শুরু করেছেন। সেই মজাদার মজলিসী আমেজ তাঁর কথায়। সকলকে তিনি আনন্দ দিচ্ছেন।

'ভক্তের ভাব কেমন জান? হে ভগবান তুমি প্রভু আমি তোমার ছেলে, আবার তুমি ছেলে আমি তোমার মা বা বাবা। তুমি পূর্ণ আমি তোমার অংশ। ভক্ত কিন্তু কখনোই বলতে চায় না আমি ব্রহ্ম।'

শ্রীরামকৃষ্ণ একাই কথা বলছেন। গঙ্গার বুক চিরে কলের জাহাজ যাচ্ছে। ঠাকুরের কথায় সেই চলার আন্দোলন সবাই ভুলে গেছে।

'বেদান্তবাদীরা বলেন, সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় জীব জগৎ এ সব শক্তির খেলা। বিচার করে দেখতে গেলে এর সবই স্বপ্নের মতোন।' শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত বোঝাচ্ছেন, 'ব্রহ্ম একমাত্র সার আর সব অসার। শক্তিও অসার। কিন্তু হাজার বিচার করলেও শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার উপায় নেই। আমি ধ্যান করছি, আত্মস্থ এও তো শক্তির এলাকার মধ্যের ভাবনা—শক্তির ঐশ্বর্যের অঙ্গীভূত। তাই ব্রহ্ম ও শক্তিতে তফাৎ নেই। এককে স্বীকার করলে অপরকেও মানতে হবে। যেমন আগুন আর তার পোড়াবার ক্ষমতা। আগুন মানলেই সেই ক্ষমতাকে মানতে হয়। পোড়াবার ক্ষমতা ছাড়া আগুনকে ভাবা যায় না। সূর্যকে বাদ দিয়ে তার আলোর কথা অকল্পনীয়। দুধ কেমন, না সাদা। দুধকে বাদ দিয়ে তার শ্বেতবর্ণ কি ভাবা যায়—আবার সাদা রঙ ছাড়া দুধের কল্পনা অসম্ভব। তাই ব্রহ্ম ছেড়ে শক্তিকে আর শক্তি ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা আবার লীলা বাদ দিয়ে নৃত্য এ চিন্তা আসে না। আদ্যাশক্তি লীলাময়ী। তিনিই সব করছেন। তাঁর নামই কালী। কালীই ব্রহ্ম আবার ব্রহ্মই কালী। একই জিনিস—নিষ্ক্রিয় অবস্থায় তিনি ব্রহ্ম, সক্রিয় হলেই তাঁকে শক্তি বা কালী বলি। একই লোক—শুধু নাম আর রূপের ফারাক। যেমন ধরো জল ওয়াটার পানি। এক পুকুরে তিন চার ঘাট। এক ঘাটে হিন্দুরা জল খায়—

তারা জল বলে। মুসলমানেরা অন্য ঘাটে জল খায় তারা জলকেই পানি বলে। আবার খ্রীস্টানরা যে ঘাটে জল খায় তাকে বলে ওয়াটার। তিনি সবসময় এক—সর্বত্র ; কেবল নামের ফারাক। তাঁকে কেউ ডাকছে আল্লা বলে, কেউ বলছে ব্রহ্ম ; কেউ কালী আবার কেউ বলছে গড। এছাড়াও নানা নাম—রাম হরি যীশু দুর্গা।'

কেশব সেন হেসে বললেন, 'কালী কত ভাবে লীলা করছেন সেই কথাগুলো একবার শোনান।'

শ্রীরামকৃষ্ণও হাসলেন। হাসির অপূর্ব জ্যোতিতে মুখে বিমল আলো জ্বলে উঠল। তিনি নানাভাবে লীলা করছেন। তাঁর বহু নাম। মহাকালী নিত্যকালী শ্মশানকালী রক্ষাকালী শ্যামাকালী। মহাকালীর কথা তন্ত্রে পাবে। ঘোর অন্ধকারে সৃষ্টির পূর্বে মহাকালের সঙ্গে তিনি ছিলেন। শ্যামাকালীর ভাব নরম। বরাভয়দায়িনী। গেরস্থ ঘরে ঘরে তাঁর স্থান। শ্মশানকালীর সংহার মূর্তি। তিনি ভয়ঙ্কর। সংহার করছেন। শ্মশানে তাঁর বাস। জগৎ যখন নাশ হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নীদের কাছে যেমন একটা ন্যাতা-ক্যাতার হাঁড়ি থাকে—আর সেই হাঁড়িতে গিন্নী নানান জিনিস তুলে রাখেন।'

ঠাকুরের উপমায় কেশব সেন ও উপস্থিত সকলেই হেসে উঠলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সেই হাসিতে যোগ দিলেন। বললেন, 'হ্যাঁগো, গিন্নীদের অমনি একটা হাঁড়ি থাকে। তার ভিতরে হরেক রকম মাল—সমুদ্রের ফেনা, নীল বড়ি, শশার বীচি—দরকার হলে খুঁজে বার করে। মা ব্রহ্মময়ীও সৃষ্টিনাশের আগে ওই রকম সব রেখে দেন। দরকারে বার করেন। সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই বিরাজ করেন। তিনিই জগৎ প্রসব করেন আবার জগতের মধ্যে বিরাজিতা। বেদে ঊর্ণনাভের কথা আছে। মাকড়শা আর তার জাল। মাকড়শা নিজেই থেকে জাল বার করে আবার সেই জালের ভেতর থাকে। ঈশ্বর

নিজেই জগতের আধার ও আধেয়—তুই। কালী কি কালো? দূরে তাই কালো—জানতে পারলেই নিকটে যেতে পারলেই আর কালো নয়। আকাশ দূর থেকে নীল, কাছে যাও তার কোনো রঙ নেই।

'সমুদ্রের জলও তাই—দূর থেকে নীল। কাছে গিয়ে হাতে তুললে আর কোনো রঙ নেই।'

'বন্ধন আর মুক্তি' শ্রীরামকৃষ্ণ লীলার কথা বলেই চলেছেন, 'দুয়ের কর্তাই তিনি। তাঁর মায়াতেই সংসারী জীব কামিনী কাঞ্চনে আটক পড়ে আছে আবার তাঁর দয়াতেই তাদের মুক্তি। তিনি লীলাময়ী। এ সংসার তাঁর লীলা। লক্ষের মধ্যে তিনি কোনো একজনকে মুক্তি দেন।

একজন ব্রাহ্মভক্ত প্রশ্ন করলেন, 'তিনি তো ইচ্ছে করলে সবাইকে মুক্তি দিতে পারেন। তাহলে কেন এভাবে বদ্ধ করে রেখেছেন সংসারে?'

'সেটা তাঁর ইচ্ছা।' শ্রীরামকৃষ্ণদেব উত্তর দিলেন। তাঁর ইচ্ছা তিনি এভাবে খেলা করেন। বুড়িকে আগে থেকে ছুঁয়ে দিলে দৌড়া-দৌড়ির দরকার হয় না। কিন্তু সকলেই যদি ছুঁয়ে ফেলে তবে খেলা জমবে কেন? তিনি মনকে চোখের ইশারায় বলে দিয়েছেন, যা এখন সংসার করগে যা। মনের দোষ কোথায়? তিনি আবার যখন মনকে ডেকে নেন তখনই বিষয় বুদ্ধি থেকে মুক্তি হয়?'

'তাহলে সব ত্যাগ করলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে না।' ব্রাহ্মভক্তটি পুনরায় জানতে চান।

হেসে উঠলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। 'তা কেন! তোমাদের সব ত্যাগ করতে হবে কেন? তোমরা তো রসে বসে বেশ আছ। সারে-মাতে।' কথার মধ্যে সবাই হেসে উঠল। 'তোমরা বেশ আছ। নক্স খেলা জান? আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি। তোমরা খুব সেয়ানা। কেউ দশে কেউ ছয়ে কেউ পাঁচে আছ। বেশি কাটাও নি, তাই আমার মতো জ্বলে যাও নি। খেলা চলছে, এই

তো বেশ।' ফের সবাই তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত উত্তর শুনে না হেসে থাকতে পারল না।

'সত্যি বলছি, তোমরা সংসার করছ এতে কোনো দোষ নেই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। তা না হলে তো হবে না। এক হাত দিয়ে কাজ করে যাও অন্য হাতে ভগবানকে ধরে রাখ। কাজ শেষ হলে দু'হাত দিয়ে তাঁকে ধরবে।

'মন নিয়ে কথা। মনেতেই বন্ধন আবার তাতেই মুক্তি। যে রঙে মনকে রাঙাবে সেই রঙেই মন রাঙিয়ে উঠবে। যেমন ধোপার ঘরের কাপড়, লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল। দেখ না একটু ইংরেজী পড়লেই মুখে ইংরাজী কথা এসে পড়ে। ফুট ফাট ইট মিট।' সবাই হাসতে লাগল ঠাকুরের রসিকতায়। 'আবার পায়ে জুতো মুখে শিস। আবার পণ্ডিত যদি সংস্কৃত পড়ে মুখে শ্লোক ঝাড়বে। কুসঙ্গ থাকলে সেই রকম কথাবার্তায় চিন্তায় মন ভরে উঠবে; যদি ভক্তের সঙ্গে রাখ তো ঈশ্বরচিন্তা হরিচিন্তা এসব দেখা দেবে। মনই আসল। একপাশে পরিবার একপাশে সন্তান। একজনকে এক ভাবে অন্য জনকে অন্য ভাবে ভালবাসে। মন কিন্তু সেই এক।

'মনেতেই বন্দী আবার মনেতেই মুক্তি। আমি মুক্ত পুরুষ—সংসার বা অরণ্য যেখানেই থাকি আমার আবার বন্ধন কিসের? আমি ঈশ্বরের সন্তান কার সাধ্য আমায় বাঁধবে। সাপে কামড়ালে যদি বিষ নেই জোর করে বলা যায় তো বিষ ছেড়ে যায়। তেমনি আমি বন্দী নই—মুক্ত এই কথাটা জোর করে বলতে বলতে তাই হয়ে যায়।

'খ্রীস্টানদের একখানা বই একজন দিয়েছিল। তাতে কেবল পাপ আর পাপ।' কেশবচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'তোমাদের ব্রাহ্ম সমাজেও শুধু পাপ। যে লোক বারংবার আমি বদ্ধ একথা বলে সে শালা বদ্ধই হয়ে যায়। যে রাত দিন পাপী পাপী করে সে

পাপীই হয়ে যায়। ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হতে হবে যে—কি আমি তাঁর নাম করি আমার আবার পাপ কি! আমার আবার কিসের বন্ধন। কৃষ্ণকিশোর নামে সদাচারী এক ব্রাহ্মণ বৃন্দাবনে গিয়েছিল—একদিন ঘুরতে ঘুরতে তার জলতেষ্টা পায়। সে তখন একটা কুয়োর কাছে গিয়ে দেখল একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। সে তাকে বললে, ওরে তুই এক ঘটি জল আমায় দিতে পারিস—তুই কি জাত? সে উত্তর দিল, ঠাকুর আমি ছোট জাত, মুচি। তখন কৃষ্ণকিশোর তাকে বললে তুই বল শিব। নে এখন জল তুলে দে। ভগবানের নাম করলে মানুষের দেহ-মন সব পবিত্র হয়ে যায়। কেবল পাপ আর নরক এসব কথা কেন। একবার প্রাণ খুলে বল অন্যায় কাজ যা করেছি আর করব না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস কর। সংসারে ঈশ্বর লাভ হবে না কেন? জনক রাজার হয়েছিল। কিন্তু ফস করে ওমনি জনক রাজা হওয়া যায় না। জনক নির্জনে বহুদিন তপস্যা করেছিলেন। সংসারে থেকেও এক একবার নির্জনে বাস করতে হয়। সংসারের বাইরে গিয়ে ভগবানের জন্য তিনদিন কাঁদা যায় যদি তাও ভাল। সময় করে একদিনও নির্জনে তাঁর ভাবনা করা খুব ভাল। লোকে মাগ-ছেলের জন্য এক ঘটি কাঁদে, ঈশ্বরের জন্য কোনো ব্যাটা কাঁদছে? নির্জনে একলা থেকে নিরিবিলি তাঁর সাধনা করতে হয়। সংসারে থেকে বিশেষ কাজে আটকা পড়ে প্রথম প্রথম মনকে স্থির করতে অনেক কষ্ট। যেমন ফুটপাতের গাছ; প্রথম দিকে বেড়া দিতে হয়—গুঁড়ি হলে আর বেড়া লাগে না। তখন গুঁড়িতে হাতি বাঁধলেও কিছু যায় আসে না।

'রোগটি হচ্ছে বিকার। আবার যে ঘরে বিকারের রোগী সে ঘরেই জল, আচার, তেঁতুল। যদি বিকারের রোগীর আরাম চাও, তার ঠাঁই নাড়া করতে হবে। সংসারী জীবও ঠিক বিকারের রোগী। বিষয় হল জলের জালা, সেই বিষয় ভোগের বাসনা হল জলতেষ্টা।

আচার তেঁতুল এসব কামিনী সঙ্গ। তাই নির্জনে চিকিৎসা প্রয়োজন। সংসারের মধ্যে থেকেই বিবেক বৈরাগ্য লাভ করতে হয়। সংসার সাগরে কাম-ক্রোধ এসব কুমীর আছে। গায়ে হলুদ মেখে জলে নামলে আর কুমীরের ভয় থাকে না। বিবেক বৈরাগ্য হল হলুদ। সদসৎ বিচারের নাম হল বিবেক। ঈশ্বরই সৎ, নিত্য। আর সব অনিত্য অসৎ—মাত্র দুদিনের জন্য এসব। ঈশ্বরের পর অনুরাগ চাই। টান ভালবাসা। গোপীরা যেমন কৃষ্ণকে ভালবাসতেন। রাধাকৃষ্ণ মান আর নাই মান এই আকুলতাটুকু গ্রহণ করো। ভগবানের জন্য কি করে এরকম ব্যাকুলতা হয় তার জন্য চেষ্টা করো। ব্যাকুলতা থাকলেই তাঁকে লাভ করা যায়।'

কেশবচন্দ্র সেনরা এই মহাপুরুষের অমৃতবাণী শুনছেন। জাহাজ কলকাতার দিকে যাচ্ছে। ভক্তের ডাকে ঠাকুর চলেছেন। সময়ের কোনো খেয়াল নেই। ঠাকুরের একপাশে বিজয় গোস্বামী বসে রয়েছেন। সামনে কেশব সেন। তখন দুজনের মধ্যে মন কষাকষি চলছিল। কথাবার্তা দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণ তা জানতেন। তিনি এই অবসরে ওঁদের মিলন ঘটাতে চাইলেন। তিনি কেশবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওগো এই বিজয় এসেছে। তোমাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ, যেন ঠিক শিব রামের যুদ্ধ।' নিজেই হাসলেন। ফের বললেন, 'রামের গুরু শিব। দুজনে যুদ্ধও হল আবার ভাবও হল। কিন্তু রামের বানর আর শিবের ভূতপ্রেতদের ঝগড়া খিটিমিটি আর শেষ হয় না।' উচ্চস্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ হাসলেন। নিজের কথার মজাতে নিজেই হাসলেন। 'নিজের লোকের সঙ্গে এমন হয়েই থাকে। লবকুশ শ্রীরামের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। আবার জানো মা মেয়ে আলাদা মঙ্গল-বার করে। যেন মা মেয়ের মঙ্গল আলাদা। অথচ দুজনের মঙ্গলে দুজনেরই মঙ্গল হয়। তেমনি তোমাদের এর একটি সমাজ আছে। আবার ওর একটি দরকার।' এবার ওঁর কথার ভঙ্গিতে সবাই হেসে

উঠল। হাসি থামলে বললেন, 'এ সবই জীবনে দরকার। যদি বলো ঈশ্বর নিজে লীলা করছেন সেখানে আবার জটিলা কুটিলা কেন? জটিলা কুটিলা না থাকলে লীলা পেষ্টাই হয় না। রগড় জমে না।' কথা শেষ করে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। 'রামানুজ ছিলেন বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী। তাঁর যিনি গুরু, তিনি ছিলেন অদ্বৈতবাদী। আর যায় কোথায়! দুজনে শেষে মতান্তর। গুরু শিষ্য দুজনেই দুজনের মত খণ্ডন করতে লাগল। এমন হয়েই থাকে। যা হোক তবু তো নিজের লোক।'

কেশবচন্দ্র সেনকে ঠাকুর বললেন, 'তুমি প্রকৃতি দেখে শিষ্য নাও না তাই বার বার এমন ভেঙে যায় দল। বাইরে মানুষ দেখতে এক কিন্তু তাদের আলাদা আলাদা ভাব। কারো ভেতর সত্ত্বগুণ বেশি কারো রজোগুণ। অনেকের মধ্যে আবার তমোগুণের প্রভাব। পুলিগুলো দেখতে একই—কিন্তু কারো ভেতর ক্ষীরের পুর। কোনোটায় নারকোলের, কোনোটায় আবার কলাইয়ের পুর। তাহলেই বোঝ।'

সকলের মিলিত হাসি ঘরের বাতাস ভরে তুলল।

'আমার কি ভাব জান?' নিজের ভাব তিনি প্রকাশ করলেন অকপটে। 'খাই-দাই থাকি, আর সব মা জানে। তিন কথায় আমার গায়ে কাঁটা দেয়। গুরু কর্তা আর বাবা। গুরু এক সচ্চিদানন্দ। তিনিই যা কিছু শিক্ষা দেবেন। আমার সন্তান ভাব। মানুষ গুরু লাখ লাখ পাওয়া যায়। সকলেই গুরু হতে রাজী। শিষ্য হতে কে চায়? লোকশিক্ষা খুব কঠিন কাজ। তিনি দেখা দিয়ে আদেশ করলে তবে হতে পারে। নারদ শুকদেবাদি আদেশ পেয়েছিলেন। শঙ্করের পরও আদেশ হয়েছিল। তা না হলে কে তোমার কথা শুনবে? কলকাতার হুজুগ তো জান! যতক্ষণ কাঠে জ্বাল, দুধ ফোঁস করে ফোলে। কাঠ সরিয়ে নাও—ব্যাস আর কোথাও কিছু নেই। কলকাতার লোক এমনি জ্বাল পেলে দুধের মতো ফুলে ওঠে।'

এই আদেশ মনে মনে হলেই হয় না। তিনি সত্যিই দেখা দেন আর কথা কন। তখন আদেশ হতে পারে। সে কথার জোর কত! পাহাড় টলে যায়। কিন্তু শুধু লেকচার—কি মূল্য আছে, দিনকতক শুনবে, তারপর ভুলে যাবে। সেই মতো কেউ চলবে না। হালদার পুকুর বলে একটা পুকুর আছে। তার পারে রোজ সকালবেলা সকলে পায়খানা করে রাখত। যারা সকালবেলায় যেত দেখে গালাগাল দিত। পরদিন আবার যেই কে সেই! পায়খানা আর থামে না। শেষ পর্যন্ত সবাই বিষয়টি কোম্পানীকে জানাল। তারা একটা চাপরাসী পাঠিয়ে দিল। সেই চাপরাসী যখন একটা কাগজ মেরে দিল, বাহ্যে করিও না, তখন সব বন্ধ হয়ে গেল।' সবাই এই গল্প শুনে প্রাণ খুলে হেসে উঠল।

'লোকশিক্ষা দেবার জন্য তোমার চাপরাস চাই। না হলে হাসির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। নিজেরই শিক্ষা হয় না আবার অন্যজনের। কানা কানাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।' সবাই পুনরায় হেসে উঠল। 'হিতে বিপরীত হয়। ভগবান লাভ হলে অন্তর্দৃষ্টি হয়, কার কি রোগ সেটা বোঝা যায়। উপদেশ দেওয়া যায়। ওপর থেকে আদেশ না থাকলে 'আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি' এই অহঙ্কার দেখা দেয়। অজ্ঞান থেকে অহঙ্কার জন্ম নেয়। অজ্ঞান অবস্থায় বোধ হয় আমি কর্তা। ভগবান সব, তিনিই সব করাচ্ছেন, আমি কিছু না এই উপলব্ধি যার হয় সে তো জীবন্মুক্ত। আমি কর্তা, আমি কর্তা এ থেকেই তো যত দুঃখ যত অশান্তি।'

কেশব সেন ও অন্যান্য ভক্তদের দিকে তাকিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'তোমরা বলো, জগতের উপকার করো। জগৎ কি এতটুকু গো! আর তুমি জগতের উপকার করবারই বা কে! তাকে সাধনার দ্বারা লাভ করো, তাঁর দেখা পাও, তিনি শক্তি দিলে তবেই সকলের কল্যাণ করতে পারবে—না হলে নয়।'

একজন ভক্ত প্রশ্ন করলেন, 'যতদিন না তাঁকে লাভ হয় ততদিন সব কাজ ছেড়ে দেব ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'না কাজ ছাড়বে কেন ? ভগবানের চিন্তা, তাঁর নাম গুণগান, নিত্যকর্ম এসব করতে হবে।'

'সংসারের কাজ, বিষয় কর্ম ?' ব্রাহ্মভক্ত জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ তাও করবে।' তিনি উত্তর দিলেন, 'সংসারযাত্রার জন্য যতটুকু দরকার। কিন্তু আড়ালে কেঁদে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হবে যাতে ঐ কাজগুলো বাসনা ত্যাগ করে করা যায়। সব সময় ঈশ্বরকে বলবে, হে ভগবান, আমার বিষয় কাজ কমিয়ে দাও, বেশি কাজ জুটলে ঠাকুর দেখছি, তোমাকে আমি ভুলে যাই। ভাবি কামনাহীন হয়ে কাজ করছি কিন্তু কামনা এসে পড়ে। হয়তো বেশি দানধ্যান করতে করতে লোকমান্য হতে ইচ্ছে যায়।

'শম্ভু মল্লিক হাসপাতাল ডাক্তারখানা স্কুল রাস্তা পুকুর করার কথা বলেছিল। উত্তরে আমি বলেছিলাম, সামনে যেটা পড়ল, না করলে নয় সেটাই নিষ্কাম হয়ে করবে। বেশি কাজ করে জড়িয়ে পড়তে নেই তাতে ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। কালীঘাটে গিয়ে একজন দানই করতে লাগল, কালী দর্শন আর হল না। আগে যে সে করে ধাক্কাধাক্কি করেও কালীদর্শন করতে হয় তারপর দান যত ইচ্ছে করো আর না করো। ঈশ্বরলাভের জন্যই কাজ করা। শম্ভুকে তাই বলেছিলাম, যদি ভগবানের দেখা পাও তাঁকে কি বলবে কতকগুলো হাসপাতাল, ডিসপেনসারি করে দাও ?' শ্রীরামকৃষ্ণ হাসলেন। 'ভক্ত কখনও তা বলে না। বরং বলবে, হে ঠাকুর ! আমায় তোমার পায়ে স্থান দাও, সর্বদা তোমার সঙ্গে রাখ—শ্রদ্ধাভক্তি দাও।

'কর্মযোগ ভীষণ কঠিন। শাস্ত্রে যে কাজ করতে বলা হয়েছে, কলিকালে তা খুব কষ্টকর। অন্নগত প্রাণ, বেশি কাজ করা চলে না। জ্বর হলে কবিরাজী চিকিৎসা করতে গেলে এদিকে রোগীর হয়ে যায়।

বেশি দেরী সয় না। তখন ডি. গুপ্ত। কলিযুগে ভক্তিযোগ, ঈশ্বরের নাম গুণগান আর প্রার্থনা। এ যুগের ধর্মই হল ভক্তিযোগ। তোমাদেরও ভক্তিযোগ, তোমরা হরিনাম কর, মায়ের গুণগান কর, তোমরা ধন্য! তোমাদের ভাবটি বেশ। বেদান্তবাদীদের মতো জগৎকে তোমরা স্বপ্নবৎ মনে কর না। ওরকম ব্রহ্মজ্ঞানী তোমরা নও—তোমরা ভক্ত। ভগবানকে তোমরা ব্যক্তিরূপে ভাব, এও বেশ। ব্যাকুল হয়ে ডাকলে নিশ্চয়ই তাঁকে পাবে।'

কলকাতার কয়লাঘাটে শ্রীরামকৃষ্ণ জাহাজ থেকে নামলেন। তাঁর জন্য গাড়ির ব্যবস্থা হল। তিনি ফিরবেন। ফেরার পথে শ্রীসুরেশ মিত্র মহাশয়ের বাড়িতে গাড়ি দাঁড় করানো হল। ঠাকুর এঁকে সুরেন্দ্র বলে ডাকতেন। পরম ভক্ত তিনি। কিন্তু বাড়িতে তাঁকে পাওয়া গেল না। বাড়ির অন্য লোক নিচের ঘর খুলে ঠাকুরকে বসতে দিলেন। গাড়িভাড়া কে দেয়। সুরেন্দ্র থাকলে তিনিই দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ভাড়াটা মেয়েদের কাছ থেকেই চেয়ে নেনা। এরা কি জানে না, ওদের ভাতাররা যায় আসে।' সবাই এই রসিকতায় হেসে উঠলেন।

কাছেই নরেন্দ্রনাথ থাকতেন। ঠাকুর তাঁকে ডাকতে পাঠালেন। নরেন্দ্রনাথ এসে পড়লেন। তাঁকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণর আনন্দ দ্বিগুণ হল। তিনি নরেন্দ্রনাথকে কেশব সেনের সঙ্গে জাহাজে ভ্রমণের কথা বললেন। রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত অপেক্ষা করাতেও সুরেন্দ্র ফিরলেন না। ঠাকুর আর দেরী না করে দক্ষিণেশ্বরের দিকে যাত্রা করলেন।

ভক্ত বলরামের বাড়িতে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সঙ্গে আরও অনেক ভক্ত। বৈঠকখানা ঘরে তাঁকে ঘিরে সবাই বসে আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের সাধন জীবনের বর্ণনা নানা কথায় সকলকে বলছেন। 'সে সময় ধ্যানে দেখতে পেতাম, সত্যই কাছে একজন শূল হাতে নিয়ে বসে। আমাকে ভয় দেখাচ্ছে। যদি ভগবানের পাদপদ্মে মন না দি তো

শূলের বাড়ি মারবে।

'কখনো মা এমন অবস্থা করে দিতেন যে নিত্য থেকে মন লীলায় নেমে আসত আবার উল্টোটাও হত। যখন লীলায় নেমে আসত সীতারামকে দিনরাত ভাবতাম। সীতারামের রূপ দর্শন হত। সবসময় রামলালকে বুকে নিয়ে ঘুরতাম। কখনো নাওয়াতাম, কখনো খাওয়াতাম। আবার কখনো রাধাকৃষ্ণের ভাবে থাকতাম। সবসময় ওইরূপ দেখতাম। কখনো গৌরাঙ্গের ভাব ধরতাম—দুভাবের মিলন —পুরুষ ও প্রকৃতি। এ অবস্থায় সর্বদা গৌরাঙ্গের রূপ দেখতে পেতাম। আবার অবস্থান্তর ঘটল। লীলা থেকে মন ঠাঁই নিল নিত্যে। সজনে তুলসী সব এক মনে হতে লাগল। ভগবানের রূপ আর ভাল লাগে না। ঘর থেকে ঈশ্বরীয় ছবি টবি খুলে ফেললাম। কেবল সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ আদি পুরুষের কল্পনা। নিজে দাসীভাবে রইলুম—পুরুষের দাসী।

'সাধন তিন রকম। আমি সবরকম সাধন করেছি। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক সাধনায় তাঁকে ব্যাকুল হয়ে ডাকে বা তাঁর শুদ্ধ নামটুকু নিয়ে থাকে। কোনো ফলের জন্য আশা নেই। রাজসিক সাধনা আড়ম্বরে ভরা। নানা ক্রিয়াকলাপ। তামসিক সাধন—তমোগুণের মধ্যে দিয়ে সাধন। এ সাধনায় শুদ্ধাচার নেই—যেমন তন্ত্রের সাধনা। সে অবস্থায় অদ্ভুত সব দেখতাম। আত্মার রমণ দেখতে পেলাম। আমার মতো রূপ নিয়ে একজন আমার দেহে ঢুকে গেল। আর ষঠ পদ্মের প্রত্যেক পদ্মের সঙ্গে রমণ করতে লাগল।

'সাধনার সময় ধ্যান করতে করতে আমি প্রদীপের শিখা আরোপ করতাম। গভীর ধ্যানে বাইরের জ্ঞান হারিয়ে যায়। একজন ব্যাধ পাখি মারবার জন্য তাক করেছে। পাশ দিয়ে আলো জ্বালিয়ে কত বাজনা বাজিয়ে বর ও বরযাত্রী চলে গেল, ব্যাধের খেয়াল নেই। সে জানতেও পারল না। একজন একটা পুকুরে মাছ ধরছে। অনেকক্ষণ

পরে তার ফাতনাটা নড়তে লাগল। মাঝে মাঝে কাত হতে লাগল। সে তখন হাতে ছিপ নিয়ে টান দেবার কথা ভাবছে এমন সময় একজন পথচারী এসে জিজ্ঞাসা করল, মশায় অমুক বাড়ুয্যে বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন? সে ব্যক্তির জ্ঞান নেই। তার হাত কাঁপছে, দৃষ্টি ফাতনাতে নিবদ্ধ। বিরক্ত হয়ে উত্তর না পেয়ে পথিক চলে গেল। সে অনেক দূরে চলে গেছে এই সময় ফাতনাটা ডুবে গেল আর ও ব্যক্তি টান মেরে মাছটাকে ডাঙায় তুলল। তখন গামছা দিয়ে মুখ পুঁছে সে পথিককে হাঁক দিল, ওহে শোন শোন—পথিক ফিরতে চায় না তবু অনেক ডাকাডাকিতে ফিরে এসে বলল, আবার ডাকছেন কেন? তখন ব্যক্তিটি প্রশ্ন করল, একটু আগে তুমি আমায় কি বলছিলে? অতবার করে জিজ্ঞেস করলুম আর এখন বলছ কি বললে! তখন যে ফাতনা ডুবছিল তোমার কথা কিছুই শুনতে পাই নি।

'ধ্যানে এ রকম একাগ্রতা হয়, অন্য কিছু দেখাও যায় না শোনাও না। গায়ের ওপর দিয়ে সাপ চলে গেলেও টের পাবে না—সাপটাও জানতে পারে না। গভীর ধ্যানের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের সব কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মন বহির্মুখ থাকে না—ভেতরে আশ্রয় পায়। যেন বার বাড়িতে কপাট পড়ল। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সব কিছুই পড়ে থাকবে কপাটের বাইরে।

'ধ্যানের প্রথম প্রথম ইন্দ্রিয়ের বিষয় কাছে আসে। গভীর ধ্যানে তারা আর আসে না। বাইরেই পড়ে থাকে। ধ্যান করতে করতে আমার কত কি যে দর্শন হত। টাকার কাঁড়ি, শাল, সন্দেশ, দুটো মেয়ে, তাদের ফাঁদী নথ। মনকে জিজ্ঞেস করলাম আবার, মন তুই কি চাস? উত্তরে মন জানালে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া সে আর কিছুই চায় না। মেয়েদের শরীরের ভিতর বার সমস্ত প্রত্যক্ষ করতাম। যেমন কাচের ঘরে বাইরে থেকে সব জিনিস দেখা যায় তাদের ভিতর দেখলাম, নাড়ীভুড়ি, রক্ত, বিষ্ঠা, কৃমি, কফ, নাল, প্রস্রাব এই সব।'

শ্রীগিরিশ ঘোষ ছিলেন ঠাকুরের আরেক পরম ভক্ত। তিনি বলে বেড়াতেন ঠাকুরের নাম করে রোগ সারিয়ে দেব। শ্রীরামকৃষ্ণ এই কথা শুনে বললেন, 'যারা হীনবুদ্ধি তারা সিদ্ধাই চায়। রোগ ভাল করা, মামলা জেতান, জলে হেঁটে যাওয়া, এসব। যারা শুদ্ধ ভক্ত তারা ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছুই চায় না। হৃদে একদিন বললে, মামা, মার কাছে কিছু শক্তি চাও, কিছু সিদ্ধাই। ছেলেমানুষের মতো আমার মন। কালীঘরে জপ করবার সময় বললাম, মা হৃদে বলছে কিছু শক্তি চাইতে, সিদ্ধাই চাইতে। মা অমনি দেখিয়ে দিলে। সামনে এসে পেছন ফিরে উবু হয়ে বসল। এক বুড়ী বেশ্যা, চল্লিশ বছর বয়স—ধামা পোঁদ। কালাপেড়ে কাপড় পরা, পড়পড় করে হাগছে। মা বুঝিয়ে দিলেন সিদ্ধাই হল এই বুড়ী বেশ্যার বিষ্ঠা। তখন হৃদেকে গিয়ে বকলাম, তুই কেন আমায় এমন শিখিয়ে দিলি!

'যাদের সামান্য সিদ্ধাই থাকে তাদের প্রতিষ্ঠা হয়, লোকেরা মানে। অনেকের গুরুগিরির শখ হয়, পাঁচজনে গণ্যমান্য করে—শিষ্য সেবক হয়। লোকে বলাবলি করবে গুরুচরণের ভাইয়ের আজকাল সময় ভাল, কত লোক আসছে যাচ্ছে। ঘর ভর্তি জিনিস, লোকে দিচ্ছে। তার এমন শক্তি হয়েছে যে কত লোককে খাওয়াতে পারে। গুরুগিরি বেশ্যাগিরির মতো। টাকা পয়সা সেবা লোকমান্য হওয়ার জন্য নিজেকে বিক্রী করা। যে শরীর মন আত্মার দ্বারা ভগবান পাওয়া যায় সেই শরীর মন আত্মাকে সামান্য জিনিসের জন্য এমন করে রাখা ভাল নয়। একজন বলেছিল, সাবির এখন খুব ভাল সময়—এখন তার বেশ জমজমাটি—একখানা ঘর ভাড়া নিয়েছে। কত লোক বশীভূত হয়ে আসছে যাচ্ছে। অর্থাৎ সাবি এখন বেশ্যা হয়েছে তাই সুখের শেষ নেই। আগে ছিল ভদ্রলোকের ঘরের দাসী আর এখন বেশ্যা। সামান্য জিনিসের জন্য নিজের সর্বনাশ।

'সাধনার সময় ধ্যান করতে বসে আরও অনেক কিছু দেখতাম।

আমি। বেলতলায় বসে ধ্যান করছি, পাপ পুরুষ এসে লোভ দেখাতে লাগল। টাকা, মান, রমণ, সুখ নানা রকম শক্তি এ সব দিতে চাইল। আমি মাকে ডাকতে লাগলাম। মা দেখা দিলেন। তখন মাকে আমি বললাম, মা ওকে কেটে ফেল। মার সেই রূপ—ভুবনমোহিনী রূপ—

'সজনে তুলসী এক বোধ হত। মন থেকে ভেদবুদ্ধি সরিয়ে নিলেন। বটতলায় ধ্যান করছি, দেখালে একজন দেড়ে মুসলমান একটা সানকি করে ভাত নিয়ে এল। সানকি থেকে ম্লেচ্ছদের খাইয়ে আমাকে ছুটি দিয়ে গেল। মা দেখালেন, এক ছাড়া দুই নেই। সচ্চিদানন্দই নানারূপ ধরে রয়েছেন। তিনি জীবজগৎ আবার তিনিই অন্ন হয়ে প্রকাশিত।

'আমার স্বভাব বালকের। হৃদে বললে, মামা মাকে কিছু শক্তির কথা বলো, ওমনি বলতে চললাম। মা আমাকে এমনি অবস্থায় রেখেছে যে কাছে যে থাকবে তার কথা শুনতে হয়। ছোট বাচ্চা যেমন কাছে মানুষ না দেখলে অন্ধকার দেখে—আমারও সেরকম হত, হৃদে কাছে না থাকলে প্রাণ যায় যায় অবস্থা—ঐ দেখ ঐ ভাবটা আসছে। কথা বলতে গেলেই উদ্দীপনা।'

বলতে বলতেই শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন। ভাবের মধ্যে বলছেন, 'এখন এই যে তোমাদের দেখছি, কিন্তু মনে হচ্ছে যেন চিরকাল তোমরা বসে আছ, কখন এসেছ কোথায় এসেছ এসব মনে নেই।' তাঁর শরীর স্থির হয়ে পড়ল। একটু বাদে জ্ঞান ফিরল। বলে উঠলেন, 'জল খাব।' সমাধির পর মনকে নামাবার জন্য তিনি এমন বলতেন। একটু চুপ করে থাকার পর আবার কথা শুরু করলেন। মাস্টারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাগা আমার কি দোষ হল? এসব কথা বলা?'

ঠাকুর নিজেই নিজের কথার উত্তর দিলেন। 'দোষ কেন হবে—আমি তো লোকের বিশ্বাসের জন্য বলেছি।' নিজের মনোভাবের কথা

সকলকে বলছেন। 'সে অবস্থার পরে যেমন আনন্দ হয় তেমনি পূর্বে যন্ত্রণাও কম নয়। মহাভাব মানে ঈশ্বরের ভাব—এই দেহ মন তোলপাড় করে দেয়। মনে হয় একটা হাতি যেন কুটিরে ঢুকে পরেছে। ঘর তোল-পাড়, সব ভেঙেচুরে একাকার। ঈশ্বরের বিরহ-অগ্নি নিদারুণ। এই অবস্থায় আমি তিনদিন জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিলাম। জ্ঞান ফিরলে অমনি আমাকে চান করাতে নিয়ে গেল। মোটা চাদর দিয়ে শরীর ঢাকা। হলে কি হবে—হাত দিয়ে গা ছোঁওয়া যায় না। গায়ে যেসব মাটি লেগেছিল তা পুড়ে গিয়েছিল। ওই অবস্থা হলেই শিরদাড়ার মধ্যে দিয়ে ফাল চলে যেত। কিন্তু তারপর অনাবিল আনন্দ।'

অবাক হয়ে ভক্তরা অমৃতকথন শুনছে। শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষা দিচ্ছেন। বলছেন, 'তোমাদের এতটা দরকার নেই। তোমরা পাঁচ কাজ নিয়ে আছ, আমি এই নিয়েই আছি। ঈশ্বর ছাড়া অন্য কিছু আমার ভাল লাগে না। এ সবই তাঁর ইচ্ছে। এক ডেলে গাছও আছে আবার পাঁচ ডেলে গাছও আছে।'

সবাই হেসে উঠল। তিনি নিজেও হাসলেন ভক্তদের সঙ্গে। 'আমার অবস্থা নজিরের জন্য। তোমরা অনাসক্ত হয়ে সংসার করে যাও। গায়ে কাদা লাগলে ঝেড়ে ফেলবে পাঁকাল মাছের মতো। সাঁতার দেবে কলঙ্ক সাগরে তবু গায়ে কলঙ্ক লাগবে না।'

'আপনারও তো বিয়ে হয়েছে।' গিরিশ ঘোষ হেসে বললেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসলেন, 'সংস্কারের জন্য বিয়ে করতে হয়। কিন্তু সংসার করা হল কই। পৈতেই সামলাতে পারি না। শুকদেবেরও নাকি বিয়ে হয়েছিল—একটি মেয়েও হয়েছিল বলে।'

এই কথা শুনে সবাই পুনরায় হাসল।

তিনি বলে চলেছেন, 'টাকা আর মেয়েছেলেই সংসার—ভগবান ভুলিয়ে দেয় দুয়ে মিলে।'

গিরিশ বলে উঠলেন, 'তবু মন কামিনী-কাঞ্চন ছাড়ে কই!'

ঠাকুর বললেন, 'আকুল হয়ে তাঁকে ডাক, বিবেকের জন্য প্রার্থনা করো। তোমরা তাঁকে জেনে নিয়ে সংসার করো। এরই নাম বিদ্যার সংসার। মেয়েমানুষের দেখতে পাওনা কি মোহিনী শক্তি! পুরুষ-গুলোকে বোকা বানিয়ে রেখে দেয়। একটা গল্প শোন তাহলে। একজন উমেদার কাজের জন্য বড়বাবুর কাছে আসাযাওয়া করে হয়রাণ হয়ে গেল তবু কাজ আর হয় না। কিছুদিন বাদে সে হতাশ হয়ে পড়ল। একজন বন্ধুকে ব্যাপারটা বলে দুঃখ করল। শুনে বন্ধু বললে তোর যেমন বুদ্ধি—ওর কাছে ঘুরে ঘুরে পায়ের বাঁধন ছেঁড়া কেন। তুই গোলাপকে বল কালই তোর কাজ হয়ে যাবে। তাই শুনে উমেদার তক্ষুনি গোলাপের কাছে চলল। গোলাপ হল বড়বাবুর রাঁড়। উমেদার তার সঙ্গে দেখা করে বলল, মা আমি বামুনের ছেলে, মহাবিপদে পড়েছি তুমি এটা না করে দিলে হবে না। সব শুনে গোলাপ বলল, ঠিক আছে আমি আজই বড়বাবুকে বলে দিচ্ছি। পরদিন সকালেই উমেদারের কাছে একজন লোক গিয়ে হাজির। সে বললে, তুমি আজ থেকেই বড়বাবুর অফিসে বেরবে। বড়বাবু সাহেবকে বললে, লোকটি খুবই উপযুক্ত—একে নিযুক্ত করা হয়েছে। সবাই এই কামিনী কাঞ্চন নিয়ে ভুলে আছে। আমার কিন্তু কিছু ভাল লাগে না। মাইরি বলছি, ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই জানি না।'

একজন ভক্ত বললেন, 'নবহুল্লোড় বলে এক মত বেরিয়েছে। শ্রীললিত চাটুজ্যেও ওই দলে আছেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'নানা মত আছে। নানা পথ। কিন্তু সবাই ভাবে আমার ঘড়িই ঠিক চলছে।'

গিরিশ ঘোষ মহেন্দ্রনাথ গুপ্তর দিকে বললেন তাকিয়ে, পোপ কি বলেন, It is with our judgment as with our watches none goes just alike, yet each belives his own.'

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন, 'এর মানে কি?'

মাস্টার ঠাকুরকে বোঝালেন, 'সবাই মনে করে আমার ঘড়ি ঠিক যাচ্ছে, কিন্তু ঘড়িগুলো পরস্পর মেলে না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ শুনে উত্তর দিলেন, 'যত ঘড়িই ভুল থাক সূর্য কিন্তু ঠিক যাচ্ছে। সূর্যের সঙ্গে ঘড়ি মিলিয়ে নিতে হয়।'

এক ভক্ত একজনের নামে বলল, 'অমুকবাবু ভীষণ মিথ্যে বলেন।'

'সত্য কথা কলির তপস্যা। কলিতে অন্য তপস্যা শক্ত। সত্যপথে থাকলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। তুলসীদাস বলেছেন, সত্যকথা অধীনতা, পরস্ত্রী মাতৃসমান—এইসে হরি না মিলে তো তুলসী মুই জবান। কেশব সেন বাবার ধার স্বীকার করেছিল। অন্য লোক হলে মানত না। কোনো লেখাপড়া ছিল না। জোড়াসাঁকোয় দেবেন্দ্রর সমাজে গিয়ে দেখলাম কেশব বেদীতে বসে ধ্যান করছে। তখন ছোকরা বয়স। দেখেই আমি মেজবাবুকে বললাম যতগুলি ধ্যান করছে তার মধ্যে এই ছোকরার ফাতনা ডুবছে। বড়শীর কাছে এসে মাছ ঘুরছে। একজন লোক দশহাজার টাকার জন্য আদালতে মিথ্যে বলেছিল। মামলা জিতবে বলে আমাকে দিয়ে মা কালীকে অর্ঘ্য দেওয়ালে। আমি ছেলেমানুষের বুদ্ধিতে অর্ঘ্য দিলুম।'

একজন ভক্ত বললে, 'আচ্ছা লোক তো!'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'অথচ এমন বিশ্বাস আমি অর্ঘ্য দিলে মা শুনবে! অহঙ্কার কি যেতে চায়। দু একজনের দেখতে পাওয়া যায় না। যেমন বলরামের অহঙ্কার নেই। মোটা বামুনের এখনো একটু একটু আছে।' মাস্টারকে শুধোলেন, 'মহিম চক্রবর্তী অনেক পড়েছে না?'

মহেন্দ্রনাথ বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেক বই পড়েছেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বললেন, 'তার সঙ্গে একদিন যদি গিরিশের আলাপ হয় তাহলে একটু বিচার হয়।'

গিরিশ হেসে বললেন, 'তিনি বুঝি বলেন সাধনা করলে সবাই শ্রীকৃষ্ণ হতে পারে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন, 'অতটা নয় তবে এ রকমই ভাব।'

একজন ভক্ত প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা শ্রীকৃষ্ণের মতো সবাই কি হতে পারে?'

শ্রীবামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন ভক্তের কথায়, 'অবতার বা তাঁদের অংশ হল ইশ্বরকোটি আর সাধারণ মানুষকে বলা হয় জীবকোটি। যারা জীবকোটি তারা সাধনার দ্বারা ঈশ্বর লাভ করতে পাবে। তারা সমাধিস্থ হয়ে আর ফিরে আসে না। কিন্তু যাঁরা ঈশ্বরকোটি তাঁদের কথাই আলাদা—তাঁদের কাছে সাততলার চাবি। যখন খুশি সাততলায় উঠে যায় আবার নেমে আসে। জীবকোটি সাততলার বাড়ির কিছু দূর পর্যন্ত যেতে পারে মাত্র। জনক জ্ঞানী—সাধনা

স্তান লাভ করেছিলেন। আর শুকদেব জ্ঞানের মূর্তি।'

ঠাকুরের মুখে এই পরমবাণী শুনে গিরিশ ঘোষ আনন্দসূচক ধ্বনি উচ্চারণ করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলে চলেছেন নিজস্ব ভঙ্গিমায়, 'শুকদেবকে সাধনা করে জ্ঞান লাভ করতে হয় নি। নারদেরও জ্ঞান ছিল শুকদেবের মতোন কিন্তু তিনি ভক্তি নিয়ে ছিলেন—তা শুধু লোকশিক্ষার জন্য। প্রহ্লাদ দু ভাবেই থাকতেন—কখনো সোহহং, কখনো দাস ভাব। হনুমানেরও একই অবস্থা। ইচ্ছে করলে এই অবস্থা হয় না। কোনো বাঁশের খোল ছোট আবার কোনোটার বড়।'

একজন ভক্ত জানতে চাইলেন, 'আপনার এ ভাব যদি নজিরের জন্য তো আমরা কি করব?'

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে উত্তব দিলেন, 'ঈশ্বব লাভ করতে হলে তীব্র বৈরাগ্য প্রয়োজন। ভগবান লাভের পথে যা বাধা বলে মনে হবে তৎক্ষণাৎ তা ত্যাগ করতে হবে। পরে হবে বা করব এই ভেবে রেখে দেওয়া উচিত নয়। কামিনী-কাঞ্চন ভগবানের পথে বাধা অতএব মন থেকে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। ঢিমেতেতালা হলে

চলবে না। সঙ্গে সঙ্গে করা চাই। একজন গামছা নিয়ে চান করতে যাচ্ছে। তার স্ত্রী বললে, তুমি কোনো কাজের নও; এত বয়স হল তাও এসব ত্যাগ করতে পারলে না। আমাকে ছেড়ে একদিনও তুমি থাকতে পার না। কিন্তু অমুক কেমন ত্যাগী। স্বামী জানতে চাইল সে কি করছে? স্ত্রী বলল, তার ষোলজন মাগ, এক এক করে সবাইকে ত্যাগ করছে। তুমি তা কোনোদিনই পারবে না। স্বামী হেসে বললে, এক একজন করে ত্যাগ! ওরে খেপী, সে ত্যাগ করতে পারবে না। যে ত্যাগ করে সে কি একটু একটু করে তাগ করে! স্ত্রী হেসে উত্তর দিল, তবু সে তোমার চেয়ে ভাল। স্বামী একটু উত্তেজিত হয়ে বললে, খেপী তুই বুঝিস না—তার কাজ ত্যাগ নয় আমিই বরং পারব। এই দেখ আমি চললাম। এর নাম বৈরাগ্য! যেই মন বলল, অমনি বউ ছেড়ে চলে গেল। গামছা কাঁধেই বেরিয়ে পড়ল, যে ছাড়বে তার খুব মানসিক শক্তি চাই। ডাকাতি করবার আগে ডাকাতরা যেমন মার মার কাট কাট করে। তোমাদের কি কর্তব্য! তাঁর প্রতি ভক্তি প্রেম নিবেদন করে দিন কাটাবে। কৃষ্ণকে না দেখে যশোদা পাগলের মতো হয়ে শ্রীমতীর কাছে গেলেন। শ্রীমতী তাঁর দুঃখ দেখে আদ্যা শক্তিরূপে দর্শন দিলেন। মা, তুমি আমার কাছে বর চাও। যশোদা বললেন, কি আর বর চাইব—তবে এই বর দাও যেন মনেপ্রাণে কৃষ্ণেরই সেবা করতে পারি।···সব ইন্দ্রিয় যেন তাঁর কাজই করে।'

কথা বলতে বলতে শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। আপন মনে নিজেকেই তিনি বলছেন, 'সংহার মূর্তি না নিত্যকালী!'

অতি কষ্টে উদ্ভত ভাবকে প্রশমন করলেন। খানিকটা জল খেলেন। এমন সময় মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায় নামে এক ভক্ত এসে হাজির। ব্যবসা আছে। ঠাকুরের কাছে আসা-যাওয়া করে। তাঁকে দেখে ঠাকুর বললেন, 'এতদিন দক্ষিণেশ্বরে যাওনি কেন?'

মহেন্দ্র মুখুজ্যে উত্তর দিলেন, 'এতদিন দেশের বাড়ি কেদেটিতে ছিলাম—কলকাতায় ছিলাম না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন তখন, 'কিগো ছেলেপুলে নেই কারো চাকরি করতে হয় না তবু সময় পাওনা। এত ভারী জ্বালা।'

ঠাকুরের এই কথায় সবাই চুপ। মহেন্দ্র একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তের হৃদয় বুঝতে পেরে বললেন, 'তোমায় বলি কেন জান, তুমি সরল, উদার। তোমার ঈশ্বর ভক্তি আছে।' শ্রীরামকৃষ্ণ হাসলেন। 'আর এখানকার যাত্রার প্যালা দিতে হয় না। যত্নর মা তাই বলে, অন্য সাধু কেবল দাও দাও করে, তোমার বাষা উটি নেই। বিষয়ী মানুষ অর্থ খরচ হলেই বিরক্ত হয়। শোন তবে একটা ঘটনা।' মজাদার কাহিনী রস দিয়ে পরিবেশন করতে শুরু করলেন। 'এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছিল। একজন লোকের সেই যাত্রা তো বসে শোনবার খুব শখ। কিন্তু সে আসরে উঁকি দিয়ে দেখলে যে এখানে প্যালা পড়ছে—তখন সে আর না শুনে সেখান থেকে চলে গেল। আর এক জায়গায় যাত্রা হচ্ছিল। এইবার সে সেখানে গেল। খোঁজ নিয়ে নিশ্চিন্ত হল যে এখানে কেউ প্যালা দেবে না। খুব ভিড় হয়েছে। সে তখন কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে আসরে গিয়ে বসল। তারপর ভাল করে গোঁপে চাড়া দিয়ে যাত্রা শুনতে লাগল।'

কাহিনী শেষ করে তিনি হাসলেন।

আবার অন্য রসের ঘটনা ব্যাখ্যান শুরু করলেন। 'আর তোমার তো ছেলেপুলে নেই যে আনমনা হয়ে পড়বে। একজন ডেপুটির কাণ্ড শোন। আটশো টাকা মাইনে, কেশব সেনের বাড়িতে নাটক দেখতে গিয়েছে। আমিও সেদিন গিয়েছিলাম। সঙ্গে অন্যরা ছিল। রাখাল আমার পাশে বসেছিল। সে একটু উঠে যেতেই ডেপুটি এসে ওর জায়গায় বসল। পাশে ছোট ছেলেটি। যতক্ষণ নাটক হল

শালা একবারও থিয়েটার দেখলে না! ছেলের সঙ্গে খালি কথা। শুনেছি নাকি মাগের দাস—একটা খাঁদা ছেলের জন্য এত—তা তুমি ধ্যান- ট্যান করো তো?'

মহেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, 'একটু-আধটু।'

'এক-আধবার যাবে?' শ্রীরামকৃষ্ণ আগ্রহ নিয়ে বললেন।

'কোথায় গাঁট-টাট আছে আপনি দেখে দেবেন—আপনি তো সব জানেন।'

ঠাকুর রসিকতা করে বললেন, 'আগে যাও—তবে তো টিপে-টুপে দেখব কোথায় কি আছে। যাও না কেন?'

'কাজ-কর্মের তাগিদে যেতে পারি না—কেদেটির বাড়িও দেখতে হয় মাঝে মধ্যে।' মহেন্দ্রনাথ জবাব দিলেন।

'এদের কি বাড়ি-ঘর নেই, না কাজ-কারবার নেই?' শ্রীরামকৃষ্ণ সমবেত ভক্তদের দেখিয়েব ললেন। 'এরা কি করে চলে আসে?' হঠাৎ হরির প্রতি তাকিয়ে ঠাকুর বললেন, 'তুই কেন আসিস নি তোর বউ এসেছে বুঝি?'

হরি মহেন্দ্রনাথ ও তাঁর ভাই প্রিয় মুখুয্যের সঙ্গে যাওয়া-আসা করে। ছোকরা বয়স। সে বলল, আজ্ঞে না, অসুখ করেছিল।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'বেচারা কাহিল হয়ে পড়েছে। ওর ভক্তি তো কম নয়—ভক্তির চোট দেখে কে। উৎপেতে ভক্তি। কথা শেষ করে তিনি হাসলেন।

একজন কিশোর বালক এসেছে। মাস্টার সঙ্গে এনেছেন। ঠাকুর ডাকিয়ে এনেছেন। মাত্র পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। নাম পূর্ণ। ছেলেটিকে শ্রীরামকৃষ্ণ কাছে ডাকলেন। বললেন, 'এখানে বস। সেসব করো? যা বলেছিলাম তোমাকে?'

'হ্যাঁ।' পূর্ণ জবাব্ দিলেন।

'স্বপ্নে কিছু দেখ—এই ধরো আগুনের শিখা, মশালের আলো,

সধবা মেয়ে বা শ্মশান-মশান—এ সব দেখা খুব ভাল।'

'আপনাকে দেখেছি। বসে আছেন— কি যেন বলছেন।'

'কি উপদেশ? কই একটা বলো তো মনে করে।'

'এখন মনে নেই।'

'তা হোক—এ খুব ভাল—তোমার উন্নতি হবে।' ঠাকুর তাঁকে অভয় দিচ্ছেন। মনে সাহস তৈরি করাচ্ছেন। বাবা-মার বাধায় সে যেন থেমে না যায়। 'আমার ওপর টান রয়েছে তো?' একটু পরে বললেন, 'সেখানে যাবে না?' সেখানে মানে দক্ষিণেশ্বরে।

'তা বলতে পারছি না।' সে উত্তর দিলে।

গিরিশ ঘোষ কেশব চরিত্র পড়ছিলেন এক পাশে বসে। ব্রাহ্ম-সমাজের শ্রীত্রৈলোক্য কেশবচন্দ্র সেনের জীবন কাহিনী লিখেছেন। ওই বইতে এক জায়গায় লেখা শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্বে সংসারের প্রতি বিরক্ত ছিলেন। পরে কেশব সেনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর মন পাল্টেছেন। এখন তিনি বলেন, 'সংসারে থেকেও ধর্ম হয়।' বই পড়ে ঠাকুরকে একথা শোনানো হয়েছিল। আজ গিরিশের হাতে বইখানা দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ওরা ওই নিয়ে আছে, তাই সংসার সংসার করছে। টাকা আর মেয়েমানুষের মধ্যে আছে। তাঁকে লাভ করলে আর একথা বলত না। ঈশ্বরকে পেলে সেই সুখের কাছে সংসার কাক-বিষ্ঠা হয়ে পড়ত। আমি আগে সব ছি ছি করে সরিয়ে দিয়েছিলাম। বিষয়ী সঙ্গ তো পরিত্যাগ করেই ছিলাম, মধ্যে ভক্তসঙ্গও ত্যাগ করি। দেখলাম ঘট পট সবই যায় তাই দেখে ব্যথায় ছটফট করি। এখন তবু লোকদের নিয়ে থাকি।'

কথার মাঝে গিরিশ ঘোষ বিদায় নিলেন। তিনি আবার আসবেন। এমন সময় ত্রৈলোক্য ও জয়গোপাল সেন এসে পড়লেন। ত্রৈলোক্যকে দেখেই ঠাকুর তাঁর গান শুনতে চাইলেন। ত্রৈলোক্য গান ধরলেন। গান শুনতে শুনতে ছোট নরেন ধ্যানে ডুবে গেলেন। কাঠের মতো

নিষ্প্রাণ তাঁর দেহ। তাই দেখে ঠাকুর আনন্দে মাস্টারকে বললেন 'দেখ দেখ কি গভীর ধ্যান! একেবারে জ্ঞানলুপ্ত।'

একটু বাদে শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেও গান ধরলেন ত্রৈলোক্যের সঙ্গে। গানের রসে তিনি ডুবে গেলেন। ছোট নরেন এমন সময় বিদায় নিলেন। ঠাকুর তাঁকে উপদেশ দিলেন, 'মা বাবাকে খুব ভক্তি করবি —কিন্তু ভগবান লাভে বাধা হলে আর মানবি না। খুব রোক আনবি —শালার বাপ!

গিরিশ ফিরে এলেন। তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রৈলোক্যের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। আবার গান চলতে লাগল। গানের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে ত্রৈলোক্যকে বিশেষ একটি গান গাইবার জন্য অনুরোধ করলেন। ত্রৈলোক্য সেই গানটি ধরল।

গান শেষ হল। সন্ধ্যে হয়েছে। ভক্ত মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ বসে আছেন। রামের প্রতি তিনি বললেন, 'বাজনা নেই, ভাল বাজনার সঙ্গে গান খুব জমে।' মুখটিতে হাসি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল; ভক্তদের শোনালেন, 'আমাদের বলরামের আয়োজন কি জান, বামুনের গোড্ডি (গরু) কম খাবে অথচ হুরহুর করে দুধ দেবে।' কথা শুনে অন্যরা সবাই হেসে উঠল। 'বলরামের ভাবখানা এই! আপনারা গাও, আপনারাই বাজাও!' হাসতে হাসতে সবাই আনন্দে মাতোয়ারা হল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এমনই। ভক্তদের রসের অমৃত পান করিয়ে তিনি হাসান। আবার সেই হাসির মর্মার্থ দিয়ে গভীরে উপলব্ধি করান।

ত্রৈলোক্যের গান শেষ হয়ে গেছে। সবাই শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে বসে আছেন। গিরিশ ঘোষ কথা আরম্ভ করলেন। তিনি ত্রৈলোক্যকে বললেন, 'আপনার বইতে ঠাকুরের সংসার সম্বন্ধে যে মত পাল্টানোর কথা লিখেছেন, আসলে কিন্তু তা হয়নি।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন, 'এদিকে আনন্দ পেলে ওটা ভাল লাগে না। সংসার আলুনি মনে হয়। শাল পেলে বনাত ভাল লাগে না।'

ত্রৈলোক্য উত্তর দিলেন, 'যাঁরা সংসার করবেন তাঁদের কথাই আমি লিখেছি। যাঁরা ত্যাগী তাদের কথা বলিনি।'

'তোমাদের এ কেমন কথা!' শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে লাগলেন, যাঁরা সংসারে ধর্ম করে বেড়াচ্ছে তারা একবার যদি ঈশ্বরের আনন্দ পায় তবে তাদের আর কিছু ভাল লাগে না। কাজের সব জোর কমে যায়, আনন্দ যত বাড়ে কাজ তত কমে। তখন শুধু আনন্দের সন্ধান! ঈশ্বর আনন্দের কাছে বিষয়ানন্দ রমণানন্দ তুচ্ছ! একবার সেই আনন্দর স্বাদ পেলে তার জন্যই দৌড়াদৌড়ি করে তখন সংসার থাকুক আর যাক!' ঠাকুর উপমা দিলেন, 'চাতক জল তেষ্টায় মরে যাচ্ছে—সাত সমুদ্র নদী পুকুর সবেতে জল টইটম্বুর—তবু সে জল খাবে না। বুক ফেটে যাচ্ছে, তা যাক। স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির জলের জন্য হাঁ করে আছে। অনেকে বলে দুদিক রাখব। দু আনা মদ খেলে দুদিক বজায় থাকে। খুব মদ খেলে আর তা হয় না। ঈশ্বরের আনন্দ পেলে সব বিস্বাদ। ভগবানের জন্য পাগল সে, টাকা ফাঁকা তার কাছে।'

'সংসারে থাকতে গেলে টাকাও দরকার, সঞ্চয়ও প্রয়োজন। পাঁচটা দান ধ্যান প্রয়োজন হলে—' ত্রৈলোক্য বলে উঠলেন।

'কি বললে!' শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'আগে টাকা সঞ্চয় করে তবে ঈশ্বর! আর দান ধ্যান দয়া কত তা জানা আছে। নিজের মেয়ের বিয়েতে হাজার হাজার টাকা খরচ আর পাশের বাড়ির লোক না খেয়ে মরছে। তাদের দেওয়ার বেলায় কত হিসেব—অন্য শালারা মরুক—আমার বাড়ির সকলে ভাল থাকলেই হল, মুখে বলে সর্বজীবে দয়া!'

ত্রৈলোক্য উদাহরণ দিলেন, 'সংসারে তো ভাল লোকও আছে। চৈতন্যদেবের পরম ভক্ত পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি; তিনি তো সংসারেই ছিলেন।'

'তার গলা পর্যন্ত মদ খাওয়া ছিল—' উত্তর দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'যদি আর একটু খেতেন তো থাকতেন না।'

ত্রৈলোক্য চুপ করে গেলেন। ঠাকুরের এই কথার উত্তর দিতে পারলেন না। তাঁকে চুপ করে যেতে দেখে গিরিশ আবার বললেন, 'তাহলে আপনি যা লিখেছেন ওকথা সত্যি না?'

'কেন সংসারে ধর্ম হয় একথা কি উনি মানেন না?'

একথার উত্তর দিলেন রামকৃষ্ণ। ভক্তর মন থেকে সংশয় দূর করতে চাইলেন। প্রকৃত শিক্ষা দিতে কখনো তিনি পরাঙ্মুখ নন। তিনি বললেন, 'হয়—সংসারে থেকেও হয়। কিন্তু আগে জ্ঞানলাভ করতে হবে, ভগবানকে পেতে হবে, তারপর সংসারে থাকতে হয়।' গানের কলি দিয়ে বোঝালেন, 'তখন কলঙ্ক সাগরে ভাসে, তবু কলঙ্ক লাগে না গায়।' তখন পাকাল মাছের মতো থাকা যায়। ঈশ্বর পাওয়ার পর যে সংসার সে সংসার বিদ্যার—তাতে কামিনী-কাঞ্চনের গন্ধ নেই, শুধু ভক্ত আর ভগবান।' নিজের কথা বলছেন ঠাকুর, 'আমারও মাগ আছে, ঘরে ঘটি বাটি আছে, হরে প্যালাদের খাওয়াই—আবার হাবির মা এলে তার জন্যেও ভাবি।'

ত্রৈলোক্য কোণঠাসা হয়ে পড়লেন। কিন্তু অহং তখনও যায় নি। তিনি বলে উঠলেন, 'অবিদ্যা কি জিনিস, অবিদ্যা বলে কোনো জিনিস আবার আছে না কি? অবিদ্যা একটা অভাব—যেমন অন্ধকার আলোর অভাব—আমাদের কাছে তাঁর প্রেমই বড় জিনিস; তাঁর বিন্দুতেই সিন্ধুর স্বাদ, কিন্তু ঐটে যে শেষ কথা একথা বললে তার সীমা টেনে দেওয়া হল।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ তা ঠিক। দেখ, একটু মদ খেলেই আমাদের নেশা হয়। শুঁড়ির দোকানে কত মদ আছে সে খবরে আমাদের দরকার কি। অনন্ত শক্তির খবরে আমাদের কাজ কি।'

গিরিশ ঘোষ বলে উঠলেন, 'আপনি অবতার মানেন?'

ত্রৈলোক্য বললেন, 'ভক্তেতেই ভগবান নেমে আসেন। অনন্ত-শক্তির পরিমাপ করা যায় না। তাঁর প্রকাশ তো মানুষে হতেই

পারে না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ জবাব দিলেন, 'আবার অনন্ত ঢোকাও কেন? তোমাকে ছুঁলে কি তোমার সব শরীরটা ছুঁতে হবে? গঙ্গাস্নান করা মানে এই নয় যে হরিদ্বার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত ছুঁয়ে যেতে হবে। যতক্ষণ 'আমি' টুকু থাকে ততক্ষণ ভেদ বুদ্ধি। আমি গেলে কি থাকল তা কেউ বলতে পারে না; বলা যায় না। সচ্চিদানন্দ সাগর মুখে বলা যায় না।' শ্রীরামকৃষ্ণ এবার ত্রৈলোক্যকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন, 'তা তুমি তো আনন্দে আছ?'

'কই!' ত্রৈলোক্য বললেন চিন্তা করে, 'এখান থেকে উঠলেই আবার যে কে সেই! এখন বেশ ভগবানের ভাব সঞ্চার হচ্ছে।'

'জুতো পরা থাকলে আর কাঁটা বনে ভয় কি! ভগবান সত্য আর সব অনিত্য এ বোধ একবার হলে কামিনী কাঞ্চনে ভয় নেই।'

ত্রৈলোক্য উঠে অন্য ঘরে গেলে ঠাকুর ওদের মতাবলম্বীদের অবস্থা নিজ ভক্তদের বুঝিয়ে দিলেন। 'এরা কি জান, একটা পাতকুয়োর ব্যাঙ পৃথিবী দেখে নি—শুধু পাতকুয়োটিই চেনে। তাই বিশ্বাস করে না যে পৃথিবী বলে কিছু আছে। ভগবানের আনন্দের খোঁজ পায় নি তাই সংসার সংসার করছে। ওদের সঙ্গে বলছ কেন? যে ঈশ্বরানন্দের স্বাদ জানে না সে সেই আনন্দের কথাও বোঝে না। পাঁচ বছরের বাচ্চাকে রমণ সুখ কি বোঝাবে! বিষয়ী লোকেরা যে ভগবানের কথা বলে তা শোনা কথা, যে রকম খুড়ী জেঠীরাও ঝগড়া করে তাদের কাছে শুনে শুনে ছোটরা কথায় কথায় ঈশ্বরের দিব্যি দেয়। ওদের দোষ নেই, সবাই কি আর অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে বুঝতে পারে! রামচন্দ্রকে বারো-জন ঋষি অবতার বলে জেনেছিল। সবার ক্ষমতা নেই বোঝাবার।

'যার যেমন পুঁজি সে সেরকম দর দেয়।' শ্রীরামকৃষ্ণ রস পরি-বেশন করছেন ভক্তসঙ্গে মহানন্দে। 'তাহলে একটা গল্প বলি শোন। একজন বাবু তার চাকরকে একদিন বললে, যা এই হীরেটা বাজারে

নিয়ে যা। যাচাই করে এসে আমায় বলবি কে কেমন দর দেয়। আগে নিয়ে যা বেগুনঅলার কাছে। চাকর প্রথম বেগুনঅলার কাছে গেল। সে হীরে নেড়েচেড়ে বললে, ভাই নয় সের বেগুন আমি দিতে পারি। চাকরটি বলল, ভাই আরেকটু ওঠ, না হয় দশ সেরই দাও। উত্তরে সে জানালে, আমি বাজার দরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছি এতে তোমার পোষায় তো দিয়ে যাও। চাকর হাসতে হাসতে ফিরে এসে বাবুকে বললে, বেগুনঅলা নয় সেরের বেশি কিছুতেই দেবে না। বলে, সে নাকি বাজার দরের চেয়ে বেশি বলে ফেলেছে।

'বাবু বললে, বেশ এবার কাপড়অলার কাছে যা। ও বেগুন নিয়ে থাকে, ও আর কতদূর বুঝবে। কাপড়অলার পুঁজি একটু বেশি, দেখি সে কি বলে। চাকর এক কাপড়অলার কাছে গেল। হীরেটি দেখে সে বলে উঠল, হ্যাঁ জিনিসটা ভাল, এতে ভাল গয়না হবে, তা ভাই আমি নয়শো টাকা দিতে পারি। চাকরটি বললে, তুমি আর একটু বাড়াও, কমপক্ষে হাজার টাকা দাও, জিনিসটা ছেড়ে দি। না ভাই আমি বাজার দরের চেয়ে বেশিই বলেছি আর পারব না। চাকর ফিরে এল। মনিবকে সব বলল। মনিব বললেন, এবার তবে জহুরীর কাছে যা। সে কি বলে দেখা যাক। চাকর তাই গেল। জহুরী একটু দেখেই বলল, লাখ টাকা দেব।'

শ্রীরামকৃষ্ণ কাহিনী শেষ করে বললে, এরা সংসারে ধর্ম ধর্ম করছে; যেমন একজন ঘরে আছে, সব বন্ধ। শুধু ছাদের একটা ফুটো দিয়ে একটু আলো আসছে। মাথার উপর ছাদ থাকলে কি সূর্যকে দেখা যায়! কামিনী-কাঞ্চন ওই ছাদ বিশেষ। সংসারী লোক যেন ঘরের ভেতর বন্দী। যাঁরা অবতার তাঁরা ঈশ্বরকোটি। ফাঁকা জায়গায় বেড়াচ্ছেন। তাঁরা বন্দী হন না, সংসারের বদ্ধ জায়গায় থাকেন না। তাঁদের 'আমি' সংসারী লোকের ন্যায় স্থূল 'আমি' নয়। সংসারী লোকের 'আমি' চারদিকে দেয়াল, ওপরে ছাদ, বাইরের কোনো জিনিস

চোখে পড়ে না। অবতারদের আমি পাতলা—যেমন একজন মানুষ পাঁচিলের একপাশে দাঁড়িয়ে—দুদিকেই ফাঁকা মাঠ। সেই পাঁচিলে ফোকর থাকলে পাঁচিলের ওপাশও দেখা যায়। ফোকর একটু বড় হলে দুপাশে যাতায়াত করা যায়। অবতারদের 'আমি' ওই ফোকরঅলা পাঁচিল। অর্থাৎ দেহ ধারণ করলেও তাঁরা সর্বদা যোগের মধ্যে থাকে। আবার ইচ্ছে হলেই বড় ফোকরের মধ্যে দিয়ে ওপারে গিয়ে সমাধিস্থ হয়। সমাধিস্থ হলেও আবার নেমে আসতে পারে।'

রসের কথার মধ্য দিয়ে কি সুন্দর অবতার তত্ত্ব। সাধারণ ভাষার মধ্য দিয়ে কি অসাধারণ শিক্ষা। ঠাকুর যেন পেয়ালার পর পেয়ালা রস ঢেলে ভক্তদের সামনে তুলে ধরছেন। যার যত খুশি পান কর। নেশাগ্রস্থ হও। ঈশ্বরকে ভালবাসার নেশা, ভক্তির নেশা, বিশ্বাসের নেশা। একবার এতে বুঁদ হলে তাঁর মুক্তি অনিবার্য।

অন্য আর একদিন। সেই বলরামের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ বসে আছেন দোতলায়। এক মুখ হাসি আর বালকের সারল্যে ভরা তাঁর প্রতিমূর্তি। ভক্তরা ঘিরে রয়েছেন তাঁকে। নানা রকম কথা হচ্ছে। কথা বলতে বলতে ঠাকুর মাস্টারকে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার কি মনে হয় আমি উদার ?'

ভবনাথ বলে অন্য ভক্ত উত্তর দিলেন, 'উনি কি উত্তর দেবেন, উনি তো চুপ করে থাকবেন।'

হিন্দুস্থানী একটি ভিখিরি গান গাইতে এসেছে। ভক্তরা সবাই দু-একটা গান শুনলেন। নরেন্দ্রের গান ভাল লাগায় আবার গাইতে বললেন। ঠাকুর বাধা দিয়ে উঠলেন, 'থাক থাক, আর কাজ নেই, পয়সা কোথায়—তুই তো বলে খালাস !'

একজন ভক্ত হেসে বলে উঠলেন, 'আপনাকে আমীর ঠাওরেছে। আপনি যেভাবে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসে আছেন।'

সব ভক্তই সমবেত ভাবে হেসে উঠল।

'ব্যারাম হয়েছে—তাও ভাবতে পারে।' শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে উত্তর দিলেন।

কথায় কথায় হাজরার প্রসঙ্গ এল। হাজরাকে দক্ষিণেশ্বরের কালিবাড়ি ছাড়তে হয়েছিল। নরেন্দ্র বললেন, 'হাজরা এখন মানছে তার অহঙ্কার হয়েছিল।'

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ওর কথা বিশ্বাস করো না। দক্ষিণেশ্বরে আবার যাবার জন্য ও এ রকম বলছে। নরেন্দ্র কেবল বলে, হাজরা খুব ভাল লোক।'

'এখনো বলি।' নরেন্দ্র উত্তর দিলেন। 'দোষ হয়তো একটু আছে, কিন্তু গুণ অনেক।'

শ্রীরামকৃষ্ণ এবার বললেন, 'তা নিষ্ঠা আছে মানতে হবে। সে আমাকে বলে, এখন তোমার আমাকে ভাল লাগছে না পরে আমাকে খুঁজতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে তেড়ে উঠলাম, তবে রে শালা—এখন একটু জপ করেই এত অহঙ্কার হয়েছে লজ্জা করে না! একদিন ওকে জিজ্ঞাসা করলুম, তুমি বলো কার কত সত্ত্বগুণ হয়েছে। সে উত্তর দিলে, ষোল আনা নরেন্দ্রর, আর আমার একটাকা ছ আনা। জিজ্ঞেস করলাম, আমার? বললে, তোমার এখনো লালচে মরছে, তোমার বার আনা।' সবাই হেসে উঠল ঠাকুরের বলার ভঙ্গিতে। তিনি পুনরায় বলতে লাগলেন, 'দক্ষিণেশ্বরে বসে হাজরা জপ করত আবার ওর ভেতরই দালালীর চেষ্টা চালাত। বাড়িতে ক'হাজার টাকা দেনা, সেই দেনা শোধ দিতে হবে। কি জান, একটুও কামনা থাকলে ঈশ্বর লাভ হয় না। ধর্মের গতি খুব সূক্ষ্ম—ছুঁচের ভেতর সুতো পরাচ্ছ—একটু আঁশ থাকলে সুতো ঢুকবে না। ত্রিশ বছর মালা জপে এক একজন, তবু হয় না কেন? ডাকুর ঘা হলে শুধু ওষুধে কাজ হয় না, ঘুঁটের ভাবরা দিতে হয়। কামনা থাকলে যতই সাধনা কর না কেন

সিদ্ধিলাভ হয় না। তবে ভগবানের দয়া হলে এক সময়ে সিদ্ধি মিলে যেতেও পারে। যেমন হাজার বছরের অন্ধকার ঘরে প্রদীপ নিয়ে ঢুকলে একসময়ে সব আলোকিত হয়ে যায়।

'গরিবের ছেলে বড়লোকের চোখে পড়ে গেছে। তাঁর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল। সঙ্গে দাসদাসী, পোশাক, আসবাব, ঘরবাড়ি সবই হয়ে গেল।'

একজন ভক্ত জানতে চাইল সবিনয়ে, 'কি ভাবে কৃপা হয়?'

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন ভক্তের, 'ভগবানের স্বভাব ছোটছেলের মতো। কোঁচড়ে রঙ নিয়ে তিনি বসে আছেন। রাস্তা দিয়ে বহুলোক যাচ্ছে। অনেকেই তাঁর কাছে রঙ চাইছে। কিন্তু তিনি কাপড়ে হাত চাপা দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বলছেন, না আমি দেব না। আবার যে হয়তো প্রার্থী নয়, আপন মনে চলে যাচ্ছে, তারই পেছন পেছন দৌড়ে গিয়ে সেধে তাকে দিয়ে দিচ্ছেন। ত্যাগ না হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। ঈশ্বর সঙ্গী খোঁজেন। ভাবের লোক, যে তাঁর ভার বহন করতে পারবে।

'একটা ভূত একবার এক সঙ্গী খুঁজছিল। শনি মঙ্গলবারে অপঘাতে মরলে যে ভূত হয়। ভূতটা যেই দেখে শনি মঙ্গলবারে কেউ মরছে অমনি দৌড়ে তার কাছে যায়। ভাবে এই বুঝি সঙ্গী পেলাম। কিন্তু কাছে যেতে যেতেই লোকটা উঠে দাঁড়ায়। মরেনি সে, ছাদ থেকে পড়ে অজ্ঞান হয়ে ছিল মাত্র। সেজোবাবুর (মথুরবাবু) একবার ভাব হয়েছিল। সর্বদাই মাতালের মতো থাকে। কাজ করতে পারে না। বিষয় দেখবে কে এমন হলে? সবাই বলল, ছোট ভটচায তুক করেছে। নরেন্দ্র যখন প্রথম আসে ওর বুকে হাত দিতে বেহুঁশ হয়ে পড়ল। তারপর জ্ঞান ফিরতেই বলল কেঁদে কেঁদে, ওগো আমার এমন করলে কেন? আমার যে বাবা-মা আছে—'আমার' 'আমার' কথাটা অজ্ঞানের। তবে আর একটি গল্প শোন।—

'এক গুরু তাঁর শিষ্যকে বললেন, তুই আমার সঙ্গে চলে আয়। শিষ্য বললে, ঠাকুর এরা সব আমায় এত ভালবাসে, আমার বাবা মা স্ত্রী, এসব ছেড়ে কেমন করে যাই। উত্তরে গুরু বললেন, তোর এসব কথা ভুল, তুই আমার আমার করছিস ঠিক কিন্তু কেউ তোকে ভালবাসে না। একটা ফন্দী শিখিয়ে দি—তুই পরখ করে দেখ। এই কথা বলে তিনি শিষ্যের হাতে একটা ওষুধের বড়ি দিলেন, এইটে খাস, তুই মড়ার মতো হয়ে যাবি। কিন্তু তোর চেতনা লোপ পাবে না। সব দেখতে শুনতে পাবি—তারপর আমি গেলে তোর আবার আগের অবস্থা হবে।

'শিষ্যটি গুরুর কথা মতে কাজ করলে। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। মা বউ সবাই কাঁদছে। এমন সময় একজন ব্রাহ্মণ এসে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? তাকে সবাই শিষ্যটিকে দেখিয়ে বলল, এই ছেলেটি মারা গেছে। ব্রাহ্মণ মরা মানুষের হাত দেখে বললেন, সে কি এত মারা যায় নি। আমি একটা ওষুধ দিচ্ছি খেলেই ও ভাল হয়ে যাবে; বাড়ির সবারই তো তখন খুব আনন্দ। তখন ব্রাহ্মণ বললেন, তবে একটা ব্যাপার আছে, ওষুধটি আগে একজন খাবেন, পরে ও খাবে। আগে যে খাবে সে কিন্তু মারা যাবে। এর তো বহু আপনার লোক দেখছি, যে কেউ খেতে পারে—মা বউ এরা খুব কাঁদছেন, এরাই খেতে পারেন। তখন সবাই কান্না বন্ধ করে চুপ করে রইল। মা বললেন, তাইতো ঠাকুর, এই বৃহৎ সংসার, আমি না থাকলে কে দেখবে। বউ বলল, তাইতো আমিই বা কি করি—ওর যা হবার তা তো হয়েছে, দু-তিনটি নাবালক ছেলেমেয়ে আমার, আমি না থাকলে তাদের কে দেখে?

'শিষ্য সব দেখছিল শুনতে পাচ্ছিল। সে আনমনা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে পড়ল। ব্রাহ্মণকে উদ্দেশ্য করে বলল, গুরুদেব, আর দাঁড়িয়ে কি হবে চলুন যাই।'

গল্প শুনে সবাই হেসে উঠল। এমন সুন্দর গল্প—জ্ঞানে ভর্তি

অথচ হাসির আর রসের কাঠামোয় ভরা। আবার আরেকটি গল্প বলতে শুরু করলেন। অফুরাণ তাঁর ভাণ্ডারে কথার শেষ নেই। শেষ নেই রসের যোগানের। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'একজন শিষ্য তার গুরুকে বলেছিল, সংসার ছেড়ে যাব কি করে গুরুদেব, আমার স্ত্রী আমাকে খুব যত্ন করে তাই যেতে পারি না। তখন গুরুদেব ওকে এক বুদ্ধি শিখিয়ে দিলেন। শিষ্যটি ছিল হঠযোগী। একদিন হঠাৎ পাড়া-প্রতিবেশীরা ওই শিষ্যের বাড়িতে খুব কান্নাকাটি শুনে দৌড়ে এল। সবাই দেখল ঘরে আসনে সে একেবেঁকে আড়ষ্ট হয়ে বসে—তার দেহে প্রাণ নেই। স্ত্রী আছড়ে পড়ে কাঁদছে, 'ওগো এ আমাদের কি হল গো, তুমি কি করে গেলে গো—

'সবাই খাট এনেছে সৎকার করতে হবে। কিন্তু শিষ্যকে বার করতে মুশকিল দেখা দিল। একেবেঁকে থাকার জন্য সে দরজা দিয়ে বেরচ্ছে না। কি উপায়! একজন কাটারি এনে চৌকাট কাটতে গেল। তখন তার স্ত্রী কান্না থামিয়ে দৌড়ে এল, কাঁদতে কাঁদতে কি হয়েছে সে জানতে চাইলে সবাই বলল, বের করা যাচ্ছে না বলে দরজা কাটছি। স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, অমন কাজ করবেন না গো, আমি এখন রাঁড় বেওয়া হয়েছি—আমাকে দেখবার কেউ নেই, কটি নাবালক ছেলে, ওদের মানুষ করতে হবে তো। এ দরজা গেলে আর হবে না; ওর যা হবার তা তো হয়েই গেছে, তোমরা বরং ওর হাত-পা কেটে দাও।

'এই কথা শোনবার পরই হঠযোগী দাঁড়িয়ে পড়ল। বলে উঠল, তবে রে শালী, আমার হাত পা কাটবি! রইল তোর সংসার—সেই মুহূর্তে সে বেরিয়ে গেল।' সবাই প্রাণ খুলে আবার হেসে উঠল। এমন মধুর শিক্ষামূলক কাহিনী তারা শোনে নি।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'অনেকে ঢং করে শোক করে। লোককে দেখায়। কাঁদতে হবে বলে নথ গহনা আগে খুলে নেয়। সারখানে

চাবি দিয়ে বাক্সে রেখে তারপর গিয়ে আছড়ে পড়ে আর কেঁদে বুক ভাসায় ; ওগো দিদিগো আমার এ কি হল গো—'

ছুজনে অবতার নিয়ে তর্ক বেঁধেছে। নরেন্দ্র প্রমাণ ছাড়া ঈশ্বর মানুষ হয়ে আসে একথা মানতে নারাজ। গিরিশ বলছেন, বিশ্বাসই প্রমাণ। নরেন্দ্র তবু মানবেন না। ঈশ্বর অমর একথাও তিনি প্রমাণ ছাড়া স্বীকার করবেন না। ছুজনের তর্কের মধ্যে মণি পল্টুকে কিছু বললেন। পল্টু বলে উঠলেন নরেন্দ্রর প্রতি—অনর্থক কি দরকার? অমর হতে গেলে অনন্ত হওয়া চাই।'

ওর কথা শুনে পরমপুরুষ হেসে উঠলেন। এই ঝগড়া তাঁর বেশ ভাল লাগছে। হেসে তিনি বললেন, 'নরেন্দ্র হল উকিলের ছেলে তেমনি পল্টুও ডেপুটির ছেলে।'

একজন ভক্ত বলে উঠল, 'উনি নরেন্দ্রর কথা আজকাল আর নেন না।' কথা শেষ করে সে হাসল।

ঠাকুরের হাসি মুখ। তিনি বললেন, 'ওকে একদিন বললাম চাতক বৃষ্টির জল ছাড়া পান করে না। তা নরেন্দ্র বললে সব জলই খায়। তখন মাকে জিজ্ঞেস করলাম, মা ওসব কি তবে মিথ্যে! ভারী চিন্তায় পড়লাম। নরেন্দ্র এরপর একদিন আবার এল। ঘরের ভেতর কতকগুলি পাখি উড়ছে। তাই দেখে ও বলে উঠল, ওই ওই! জিজ্ঞেস করলাম, কি? উত্তরে ও বললে, ওই চাতক উড়ছে। তাকিয়ে দেখি কতকগুলো চামচিকে উড়ছে। সেই থেকে ওর কথা আর নি না।'

হো হো করে হাসির স্রোত বয়ে গেল। বোঝা গেল নরেন্দ্র চাতক চিনতেন না।

'যত্ন মল্লিকের বাগানে একদিন নরেন্দ্র আমাকে বললে ভগবানের রূপটুপ তুমি যা দেখ ও মনের ভুল।' শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বলতে

লাগলেন, 'তখন বিস্মিত হয়ে ওকে বললাম, বলিস কি, কথা কয় যে! তা শুনে ও বললে, ওই রকম হয় ও কিছু না। মার কাছে গিয়ে কাঁদতে লাগলাম। বললাম, মা একি হল! তবে কি সব মিথ্যে! নরেন্দ্র এমন কথা বললে! তখন মা তাঁর অখণ্ড চৈতন্যময় রূপ দেখিয়ে দিলে! বললে, যদি মিথ্যেই হবে এমন সব কথা মেলে কি করে! তখন নরেন্দ্রকে বলেছিলাম, শালা তুই আমাকে অবিশ্বাস করিয়ে দিয়েছিলি, তুই আর আসিস না।'

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কয়েকজন ব্রাহ্ম ভক্ত নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে একদিন দেখতে এলেন। পরম ভক্ত বলরামই এদের নৌকো করে নিয়ে এসেছেন। ঠাকুর তক্তপোশের ওপর বসে আছেন। শীতকাল। সকলেই তাঁর কথা শুনতে উন্মুখ। বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্ম-সমাজের মাইনেকরা কর্মচারী একজন। তাঁর পদ আচার্য। সমাজে উপদেশ দেওয়াই তাঁর কাজ। যদিও এই সময় সমাজের সঙ্গে তাঁর ভাল সম্পর্ক চলছিল না। বিজয়কৃষ্ণ খুব বড় বংশের ছেলে। অদ্বৈত গোস্বামীর বংশধর।

বিষ্ণু বলে একটি ছেলে আত্মহত্যা করে মারা গেছে। তার কথাই হচ্ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'মনটা খুব খারাপ হয়ে আছে এই ছেলেটির কথা শুনে। স্কুলে পড়ত, এখানে আসত। বলত সংসার ভাল লাগে না। পশ্চিমে এক আত্মীয়র কাছে গিয়ে কিছুদিন ছিল। সেখানে বনে পাহাড়ে নির্জনে ধ্যান করত। বলত সে নাকি বহুরকম ঈশ্বরীয় রূপ দেখত। বোধ হয় এই তার শেষ জন্ম। পূর্ব জন্মে অনেক কাজ সারার ছিল—একটু বাকী ছিল সেটুকুই হয়ে গেল। পূর্বজন্মের সংস্কার মানতে হয়। একটা শোনা কাহিনী বলি তোমাদের। গভীর বনে একজন শব সাধনা করছিল। সে নানা বিভীষিকা দেখতে লাগল। শেষ পর্যন্ত তাকে বাঘে নিয়ে গেল। অন্য একটি লোক বাঘের ভয়ে গাছে উঠেছিল। বাঘ চলে যেতে সে শব আর পুজোর সমস্ত জিনিস

দেখে আচমন করে শবের ওপর বসে পড়ল। একটু জপ করতে না করতেই মা দেখা দিলেন। তিনি বললেন, তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি, তুমি বর চাও। সে ঈশ্বরীর পায়ে প্রণাম করে বলল, মা, একটা কথা জিজ্ঞেস করছি; তোমার ব্যবহারে অবাক হয়ে গেছি। আগের লোকটি এতদিন ধরে এত পরিশ্রম করে সমস্ত জোগাড় যন্ত্রের পর তোমার সাধনা করছিল। তাকে তুমি দয়া করলে না। আর আমি কিছু জানি না, শুনি না আমার ওপর একি কৃপা।

'ঈশ্বরী হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, বাবা, তোমার অন্য জন্মের কথা মনে নেই—তুমি জন্ম জন্ম আমার তপস্যা করেছ সেই সাধনাবলে আমার দেখা পেলে, এখন বল কি বর চাও?'

একজন বললে 'আত্মহত্যা করেছে শুনলে ভয় হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'আত্মহত্যা মহাপাপ—ফিরে ফিরে সংসারে আসতে হয় আর এই সংসার যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। তবে ঈশ্বরের দর্শন পেলে কেউ যদি শরীর ত্যাগ করে তাকে আত্মহত্যা বলে না। অনেক বছর আগে বরাহনগর থেকে একটি ছেলে আসত। নাম গোপাল সেন, কুড়ি বছর বয়স হবে। তার ভীষণ ভাব হত। হৃদয়কে ধরে রাখতে হত পাছে না পড়ে যায়। একদিন হঠাৎ এসে আমার পা ছুঁয়ে বললে, আমি আর আসতে পারব না। আমি চললুম। কিছুদিন পরে শুনলাম সে শরীর ত্যাগ করেছে।'

জীবের ভাগ বোঝাচ্ছেন পরমপুরুষ ভক্তজনকে। তিনি বলতে লাগলেন, জীব চার থাক, বদ্ধ, মুমুক্ষু, মুক্ত ও নিত্য। এই সংসার হল জালের মতো আর জীব ধরো গিয়ে মাছ। ঈশ্বর হলেন জেলে। জেলের জালে যখন মাছ পড়ে কতকগুলো জাল ছিঁড়ে পালাবার চেষ্টা করে—এরা মুমুক্ষু। যে কটা পালায় তারা মুক্ত। কিছু মাছ অতি সাবধানী তারা জালেই পড়ে না। তারা নিত্য জীব। যেমন নারদাদি—সংসার জালে এঁরা জড়ায় না। কিন্তু বেশির ভাগই জালে

পড়ে। তারা জালশুদ্ধ দৌড় মারে, পাঁকে গিয়ে শরীর লুকোবার চেষ্টা করে। এরাই হল বদ্ধজীব। বোধ নেই যে জালে পড়লে পালানো যায় না। বদ্ধজীবের কিছুতেই হুঁশ হয় না। উট যেমন কাঁটা ঘাস খেতে ভালবাসে। যখন খায় মুখ দিয়ে দরদর করে রক্ত পড়ে তবু সেই কাঁটা ঘাসই খাবে।

'সংসারী লোক উটের মতোন। শোক তাপ দুঃখ পাচ্ছে—তবু যেমন-কে তেমন। স্ত্রী মরে গেল, অসতী হল—আবার বিয়ে করল। ছেলে মরে গেলে কত দুঃখ পায়। কিছুদিন কাটতেই সেই ছেলের মা গয়না গড়ায় চুল বাঁধে। মেয়ের বিয়েতে সব চলে গেল আবার তাদের বছরে বছরে বাচ্চা হয়। কখনো কখনো তাদের অবস্থা হয় সাপের ছুঁচো গেলার মতো। গিলতেও পারে না উগরোতেও না। বুঝতে পারছে মনে মনে সংসারে কিছুই সার নেই। আমড়ার কেবল আঁটি আর চামড়াই সার—তবু ছাড়তে পারে না।'

বিজয় জিজ্ঞেস করলেন, 'তা হলে কি বদ্ধ-জীবের মুক্তি নেই?'

'আছে।' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ভগবৎ কৃপায় তীব্র বৈরাগ্য লাভ করলে। তীব্র বৈরাগ্য হল, সমস্ত হৃদয় মন ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল—মা যেমন ছেলের জন্য। যার তীব্র বৈরাগ্য হয় সে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছু বোঝে না। সংসার তার কাছে পাতকুয়ো—তার মনে হয় এই বুঝি ডুবে গেলাম। আত্মীয়রা কাল সাপ—তাদের কাছ থেকে সে পালায়। ভিতরে তাদের খুব জেদ থাকে। তীব্র বৈরাগ্যের একটি গল্প শোনাই।

'এক দেশে বৃষ্টি হয় নি। চাষীরা বাধ্য হয়ে খানা কেটে দূর থেকে ক্ষেতে জল নিয়ে আসছে। একজন চাষা খুব জেদী, সে একদিন প্রতিজ্ঞা করল, যতক্ষণ ক্ষেতে জল না আসে ততক্ষণ খানা খুঁড়বে। এদিকে স্নান খাবার সময় হল। গিন্নী মেয়ের হাতে তেল পাঠিয়ে দিলে। মেয়ে বলল, বাবা বেলা হয়েছে, এবার স্নান

করে নাও। তুই যা আমার কাজ আছে। মেয়ে ফিরে গেল। আরো খানিক বাদে গিন্নী নিজেই মাঠে গিয়ে হাজির। এখনো নাওনি, এদিকে ভাত জুড়িয়ে গেল, তোমার সব তাতে বাড়াবাড়ি, আজ না হয় কাল করবে। চাষা কোদাল হাতে গালাগালি দিয়ে তাড়া করলে, তোর আক্কেল নেই? বৃষ্টি হয় নি। চাষ-বাস কিছু হল না, এবার ছেলেপুলে খাবে কি? তাই আমি প্রতিজ্ঞা কবছি আজ মাঠে জল আনব তবে অন্য কথা। স্ত্রী ভয়ে পালিয়ে এল। সমস্ত দিন অমানুষিক খেটে সন্ধ্যার সময় সে নদীর সঙ্গে খানার যোগ করল। সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেতে জল এসে পড়ল। মন তখন তার শান্তি আর সুখে ভরে গেছে। সে বাড়ি গিয়ে বউকে বললে, কই এখন তেল দে আর একটু তামাক সাজ। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে খেয়ে-দেয়ে ভোস ভোস করে ঘুমোতে লাগল। এই জেদ চাই। এই হল তীব্র বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত। অথচ অন্য চাষা, সেও একই কাজ করছিল কিন্তু যেই তার স্ত্রী গিয়ে বলল, বেলা হয়েছে—এত বাড়াবাড়িতে কাজ নেই। সে আর বেশি কথা না বলে কোদাল রেখে স্ত্রীকে বললে, তুই যখন বলছিস তো থাক। সে চাষার আর মাঠে জল নিয়ে আসা হল না।'

সবাই হেসে উঠল দ্বিতীয় চাষার কথা শুনে।

ঠাকুর বললেন, 'খুব রোক না হলে চাষার যেমন মাঠে জল আসে না সেরকম মানুষের ভগবান লাভ হয় না।'

গল্প শেষ করে ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীকে বললেন, 'আগে তো খুব আসতে, এখন আস না কেন?'

'আসবার খুবই ইচ্ছে হয় কিন্তু আমি স্বাধীন নই, সমাজের কাজ নিয়েছি।' বিজয়কৃষ্ণ উত্তর দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে মধুর বচনে বললেন, দেখ কামিনী-কাঞ্চন মানুষকে সংসারে বেঁধে ফেলে। কামিনী থাকলেই কাঞ্চনের দরকার।

তার জন্য অন্যের দাসত্ব করতে হয়, মনের মতো কাজ করা যায় না। জয়পুরের গোবিনজীর পূজারীরা আগে ছিলেন খুব তেজস্বী—প্রথম দিকে তাঁরা কেউ বিয়ে করেন নি। রাজা একবার তাঁদের ডেকে পাঠলে তাঁরা যান নি। বলেছিলেন, রাজাকে আসতে বলো। এরপর রাজা আর অন্য পাঁচজন জোর করে তাঁদের বিয়ে দিয়ে দিলেন। তখন আর দেখা করবার জন্য রাজাকে ডাকতে হত না। নিজেরাই গিয়ে হাজির। বলেন, মহারাজ আশীর্বাদ করতে এসেছি। এই নির্মাল্য এনেছি। আজ ঘর তোলা, কাল ছেলের অন্নপ্রাশন এই সবের জন্য তাঁদের যেতেই হয়।

'বারশো নেড়া আর তেরশো নেড়ী আর তার সাক্ষী উদম শাড়ি—এই গল্প শুনেছ তো। নিত্যানন্দ গোঁসাইর ছেলে বীরভদ্রের তেরশো নেড়া শিষ্য ছিল। তারা সিদ্ধ হয়ে যেতে বীরভদ্র ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি চিন্তা করতে লাগলেন, এরা সিদ্ধ হল এখন লোককে যা বলবে তাই হবে—যেদিক দিয়ে যাবে সেদিকেই কাণ্ড ঘটবে—কারণ লোকে না জেনেও যদি অপরাধ করে তাদের ক্ষতি হবে। বীরভদ্র এসব ভেবে একদিন ওদের ডেকে বললেন, তোমরা গঙ্গায় গিয়ে সন্ধ্যা আহ্নিক করে এস। নেড়াদের তেজের সীমা নেই—ধ্যান করতে করতে সমাধি; মাথার ওপর দিয়ে জোয়ার চলে গেছে সে খেয়াল নেই। আবার ভাঁটা এসেছে তবু সমাধি ভাঙে না। তেরোশ শিষ্যর মধ্যে একশ জন বুঝতে পেরেছিলেন গুরু কি বলতে চান—তাই তাঁরা সরে পড়ল। বাকী বারশো ফিরে এল। তখন বীরভদ্র তেরশো নেড়ী দেখিয়ে বললেন, এরা তোমাদের সেবা করবে, তোমরা এদের বিয়ে করো। গুরুর আদেশ মাথায় করে তারা সেবা-দাসী সঙ্গে থাকতে লাগল। দেখতে দেখতে তাদের তেজ কমে গেল, তপস্যার জোর রইল না। মেয়েমানুষের সঙ্গে থাকার ফলে বল হারিয়ে গেল। স্বাধীনতা রইল না। তোমরা নিজেরাই দেখছ—',

ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বললেন, পরের কাজ নিয়ে কি হয়েছে। কত পাশ করা ইংরাজী পড়া পণ্ডিত মনিবের চাকরি নিয়ে ত্বুবেলা বুট জুতোর গোঁজা খাচ্ছে—এর একমাত্র কারণ ওই কামিনী। কামিনীর জন্যই এত অপমানবোধ এত দাসত্ব জ্বালা।

'যদি একবার তীব্র বৈরাগ্য থেকে ভগবান পাওয়া যায় তাহলে আর মেয়েমানুষে আসক্তি থাকে না। তাদের ভয় নেই। যদি একটা চুম্বক খুব বড় হয় অন্যটা সামান্য তাহলে লোহাকে কোনটা টানবে? বড়টাই। ঈশ্বর হল বড় চুম্বক, তার কাছে কামিনী সামান্য মাত্র, সে আর কি করবে?'

একজন ভক্ত তখন জানতে চাইলেন, 'তাহলে কি মেয়েমানুষকে ঘৃণা করব?'

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'যিনি ভগবানকে পেয়েছেন, তিনি আর অন্য চোখে মেয়েমানুষকে দেখেন না যাতে তাঁর ভয় হবে। তিনি ঠিক দেখতে পান মেয়েরা ব্রহ্মময়ীরই অংশ বিশেষ, তাই মা বলে পুজো করেন।' এই কথা বলে ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণকে বললেন, 'তুমি মাঝে মাঝে আসবে, তোমাকে দেখতে বড় ইচ্ছে হয়।'

জীবনের মধ্যে ছড়ানো লোককথা লোকগল্পর মধ্যে দিয়ে পরমপুরুষ তাঁর ভক্তদের শিক্ষা দিতেন। সেই সব কথা বা গল্পে ভেতরের রসকে এমন ভাবে উপস্থাপনা করতেন যাতে রসের সাগরের সন্ধান পেতে ভক্তদের দেরী হত না। হাসি মজা রহস্যর বনেদে গাঁথা উপ-দেশগুলো ঠিক ঠিক হৃদয়ে গিয়ে গেঁথে যেত। নিজে রসের কাণ্ডারী না হলে, রসময় না হলে এমন ভাবে বোঝানো যায় না। তিনি তখন অনায়াসেই ভক্তদের প্রকৃত পথ দেখিয়ে দিতেন। এক জায়গায় নিজেই তিনি বলেছেন, 'গুরু কাঁচা হলে তাঁরও যন্ত্রণা, শিষ্যেরও যন্ত্রণা। শিষ্যের মনের অহঙ্কার দূর হয় না, সংসার বন্ধন ঘটে না। কিন্তু সদ্‌গুরুর তিন ডাকে জীবের অহঙ্কার চলে যায়।' তিনি ছিলেন

তেমনি এক অমিত বীর্যবান সদগুরু। শুধু রসের পাত্র উপুড় করে ভক্তদের মনের অহঙ্কার দূর করে গেছেন।

সিঁথির ব্রাহ্মসমাজে ব্রাহ্মদের মিলনোৎসব। শ্রীরামকৃষ্ণ সেখানে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। গান শুনতে শুনতে সেখানে তাঁর ভাব সমাধি হল। সবাই বিস্মিত চক্ষে সেই দৃশ্য দেখছেন। একটু বাদে তিনি খানিকটা জ্ঞান ফিরে পেয়ে ব্রাহ্মভক্তদের উপদেশ দিতে লাগলেন। ক্রমে পূর্ণ সুস্থ হয়ে ভাবের ঘোরেই যেন বললেন, 'মা, কারণানন্দ চাই না, সিদ্ধি খাব। সিদ্ধি হল গিয়ে বস্তু লাভ। এ সিদ্ধি অষ্ট-সিদ্ধির সিদ্ধি নয়—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, যাদের মধ্যে অষ্টসিদ্ধির কোনটা আছে সে কিন্তু আমাকে পাবে না। কারণ সিদ্ধি থাকলেই অহঙ্কার থাকবে আর অহঙ্কার থাকলেই আমাকে পাবে না।

'সিদ্ধ কে? যার নিশ্চয়াত্মিক বুদ্ধি হয়েছে, যে বিশ্বাস করে ভগবান আছেন আর সমস্ত কার্যকারণ তাঁরই অধীন। যিনি ঈশ্বরকে দেখেছেন। তিনি হলেন সিদ্ধের সিদ্ধ যে ব্যক্তি ভগবানের সঙ্গে কথা বলেছেন। কাঠের ভেতর আগুন আছে—এই পরম বিশ্বাস, আবার সেই কাঠ থেকে আগুন উৎপন্ন করে ভাত রেঁধে খেয়ে শান্তি আর তৃপ্তিলাভ—দুটো ব্যাপার আলাদা।'

পুনরায় ভাবাবিষ্ট হয়ে কথা বলছেন, 'এরা ব্রহ্মচারী—নিরাকারবাদী তা বেশ।'

ব্রহ্ম-ভক্তদের প্রতি বললেন, 'সাকার বা নিরাকার যে কোনো একটায় দৃঢ় বিশ্বাস রাখ—তাছাড়া ভগবান প্রাপ্তি ঘটে না—দৃঢ় বিশ্বাসের জোর থাকলে সাকারবাদী নিরাকারবাদী উভয়েই ঈশ্বরলাভ করবে। মিছরির রুটি সোজা করেই খাও আর আড় করেই খাও—মিষ্টি লাগবেই।'

সুন্দর এই উপমায় সবাই হেসে উঠল। কি সুন্দর স্বচ্ছ কথা!

বুঝতে একটু অসুবিধা নেই। জলের মতো সহজ উপদেশ।

'দৃঢ় হতে হবে। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হবে। বিষয়ীর ঈশ্বর কি রকম জান? ধরো কোনো, ফিটবাবু পান চিবুতে চিবুতে স্টিক হাতে করে বাগানে বেড়িয়ে বেড়াবার ফাঁকে বন্ধুকে একটি ফুল তুলে দেখিয়ে বললে, দেখ ঈশ্বর কি বিউটিফুল ফুল করেছেন। বিষয়ীর এই ভাব ক্ষণস্থায়ী—এ হল গরম লোহার উপর জলের ছিটে। এতে হয় না। একটার উপর দৃঢ় হতেই হবে। সাগরে ডুব দিলে তবেই রত্ন পাবে—জলের উপর ভাসলে তা পাওয়া সম্ভব না।'

কথা শেষ করে মনের আনন্দে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ গান ধরলেন তার মধুনিঃসৃত কণ্ঠে।

গান থামিয়ে পুনরায় তিনি বলে চলেছেন তত্ত্বকথা—এ অমৃতবাণীর শেষ নেই। তিনি বলছেন, 'ডুব দাও, ভগবানকে ভালবাসতে শেখ—তাঁর প্রেমে হাবুডুবু খাও।' ব্রাহ্মদের বিষয়ে সমালোচনা করছেন, 'দেখ তোমাদের পাসনা আমি শুনেছি, তোমরা ঈশ্বরের অত ঐশ্বর্যের ব্যাখ্যান করো কেন—তুমি এই তুমি সেই—এত কথায় আমাদের প্রয়োজন কি? সব মানুষই বাবুর বাগান দেখে বিস্ময়াবিষ্ট, তাতেই তাদের পেয়ে বসে, ফলে বাগানের বাবুকে খোঁজে কজন? মাত্র দু-একজন। ভগবানকে ব্যাকুল হয়ে খুঁজতে হয়—তন্ময়তা চাই, তবে তাঁর দেখা পাওয়া যায়, কথা বলা যায়; যেনন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি। কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করে কে?'

'শাস্ত্রে ঈশ্বর কোথায়—শুধু তিনি আছেন এই বোধ হয় মাত্র। নিজে ডুব না দিলে ভগবান লাভ হয় না। ডুব দেবার পর তিনি নিজেই জানিয়ে দিলে সন্দেহ যায়। হাজার বই পড়লে তাঁকে পাওয়া যাবে না। জ্ঞান দিয়ে মানুষকে ভোলানো যায়, তাঁকে যায় না। শাস্ত্র বই এ সব দিয়ে কি হবে—তাঁর কৃপা ছাড়া কিছু হবে না। যে ভাবে সেই কৃপা হয় তার জন্য চেষ্টা করো তখন আপনি দর্শন

হবে, তিনি কথা বলবেন।'

একজন ভক্ত বলে উঠলেন, 'আচ্ছা তাঁর কৃপা কি কারো ওপর বেশি আবার কারো ওপর কম?'

'সে কি!' ঠাকুর অবাক হলেন প্রশ্ন শুনে, বললেন, 'ঘোড়াটাও টা আবার সরাটাও টা—তোমার মতো ঈশ্বরচন্দ্রও এই কথা বলে-ছিলেন। উত্তরে আমি বলেছিলাম, তিনি বিভুরূপে সবার ভিতরে আছেন। আমার ভিতরে যেমন, পিঁপড়ের ভিতরেও তেমনি। কিন্তু শক্তিবিশেষ আছে। যদি সকলেই সমান হত তো আমরা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নাম শুনে কেন দেখতে এসেছি। যদি শক্তি বিশেষ না হয় কেশবকে এত লোকে মানত কেন! গীতায় আছে, লোকে যে কোনো কারণে যাকে মানে নিশ্চিত জেন তাঁর ভেতর ভগবানের বিশেষ শক্তি আছে।'

অন্য এক ভক্ত বলে উঠলেন, 'উনি যা বলেছেন মেনে নিন।'

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে বলে উঠলেন, 'তুমি কি রকম লোক হে! কথায় বিশ্বাস না করে শুধু মেনে নেওয়া! কপটতা! তুমি ঢং কর দেখতে পাচ্ছি।'

দ্বিতীয় ব্রহ্ম ভক্তটি এই তিরস্কারে লজ্জায় অধোবদন হয়ে পড়লেন।

প্রথম ভক্তটি আবার বললেন, 'তাহলে সংসার কি ত্যাগ করতে হবে?'

'ত্যাগ করতে হবে কেন?' শ্রীরামকৃষ্ণ জবাব দিলেন প্রশান্ত বচনে, 'সংসারের ভেতরে থেকেই সব হয়। তবে কিছুদিন একলা থাকতে হয় নিরিবিলিতে। নির্জনে তাঁর সাধনা করতে হয়। কেশব সেন, প্রতাপ এঁরা আমাকে বলেছিল, জনক রাজার মতো। তা জনক রাজা এমনি হওয়া যায় না। জনক রাজা বহুদিন মাথা নিচু করে তপস্যা করেছিলেন নির্জনে। তোমরাও কিছু করো তবে তো জনক রাজা হবে। লোকে বলে, অমুকে গড়গড়িয়ে ইংরেজী লিখতে পারে।

তা কি একদিনেই পেরেছিল?

'কেশব সেনকে আরো বলেছিলুম, নির্জনে না গেলে কঠিন ব্যারামে কিসে সারবে? রোগ হচ্ছে বিকার। বিকারের রোগীর ঘরেই যদি আচার তেঁতুল জলের ব্যবস্থা থাকে তাহলে কি হয়। আচার, তেঁতুল—এই দেখ নাম করতে না করতেই আমার জিবে জল এসেছে—'

সবাই হেসে উঠল তাঁর রসিকতায়। 'তাই বলছি দিনকতক ঠাঁই-নাড়া হয়ে থাকতে হয়। তারপর রোগ সারিয়ে ঘরে ফিরলে আর ভয় থাকে না। তখন জনকের মতো নির্লিপ্ত। কিন্তু ওই যা বললাম, প্রথম অবস্থায় খুব নির্জনে থেকে সাবধানে সাধনা করা চাই। একবার ভক্তি লাভ করলে, মনের জোর বেড়ে গেলে বাড়ি ফিরে সংসার করলে তখন কামিনী কাঞ্চন তোমার কিছুই করতে পারবে না।

'দই নিরিবিলিতে পাততে হয়; মাখন তুলতে হয়—মনরূপ দুধ থেকে একবার যদি জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন তোলা যায় তাহলে সংসার রূপ জলে ফেলে রাখলেও তা ভাসতে থাকে। কিন্তু মনকে কাঁচা অবস্থায় অর্থাৎ দুধের স্তরে জলে রাখতে যাও তো জল দুধ মিশে একাকার হয়ে যাবে—মন তখন নির্লিপ্ত হয়ে ভাসতে পারবে না।'

অনর্গল তিনি বলে চলেছেন। একটির পর একটি সহজতম উপমা। বোধগম্য চিত্রকল্প। প্রতীক দিয়ে গাঁথা সারল্যের কবিতা। 'ঈশ্বর লাভের জন্য সংসারে থেকে একহাতে তাঁকে ধরে রাখবে; অন্য হাতে কাজ করে যাবে, কাজ থেকে অবসর পেলেই দুহাতে তাঁর পা জড়াবে, নির্জনে থাকবে—কেবল তার চিন্তা আর সেবা এই হবে তোমাদের কর্ম।'

'বড় ভাল লাগল আপনার একথা।' আনন্দিত হয়ে ব্রাহ্মভক্ত বলে উঠল, 'নির্জনে সাধনা নিশ্চয়ই দরকার। আমরা কিন্তু ঐটেই ভুলে যাই—মনে করি এক লাফে জনক রাজা বনে গেছি।'

এঁর কথা শুনে অন্যান্য সকলের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণও হেসে উঠলেন।

'ত্যাগ ফ্যাগ বুঝি না—' আরো প্রাঞ্জল করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন ঠাকুর, 'যুদ্ধ যখন করতেই হবে তখন কেল্লার ভেতর থেকেই তা করা ভাল। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে, ক্ষিধে তেষ্টার সঙ্গে যুদ্ধ সংসারে থেকে করাটাই শ্রেয়। একজন ভক্ত, তার মাগকে বলেছিল, আমি সংসার ছেড়ে চললুম। সেই মাগ ছিল জ্ঞানী, তাই সে উত্তর দিল, কেন তুমি ঘুরে ঘুরে বেড়াবে—যদি পেটের ভাতের জন্য দশঘরে যেতে না হয় তবে যাও—তা যদি হয় তো এই এক ঘরই ভাল। তোমরা ত্যাগ করতে যাবে কেন? বাড়িতেই তো সুবিধে। খাবার জন্য ভাবনা নেই, নিজের বউর সঙ্গে সহবাস, তাতে দোষ নেই। দেহের জন্য যখন যা দরকার হাতের কাছেই পাবে—রোগ হলে কাছেই সেবা করবার লোকও রইল। জনক বশিষ্ট এঁরা সংসারে থেকে তুখানা তরোয়াল রাখতেন—একটি জ্ঞানের, অন্যটি কর্মের।'

'জ্ঞান হয়েছে তা বুঝব কি ভাবে?' ভক্তটি জানতে চাইল।

'জ্ঞান হলে তিনি আর দূরে থাকেন না। তিনি আর তিনি বোধ হন না। তখন ইনি! মনের মধ্যে তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। তিনি সকলের ভেতরেই আছেন, যে খোঁজে সেই পায়।

'আমি তো পাপী—কেমন করে বলব তিনি আমার ভেতরে আছেন?' ব্রাহ্ম ভক্তটি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করছেন।

'ওই তোমাদের পাপ আর পাপ!' পরমপুরুষ বোঝাচ্ছেন। 'এসব বুঝি খ্রীস্টানী মত? আমায় একজন একখানা বই দিয়েছিল; একটু পড়া শুনলাম। তা কেবল ওই একটি কথা। পাপ আর পাপ! তাঁর নাম করেছি, ঈশ্বর, কি রাম, কি হরি বলেছি আমার আবার পাপ কিসে! এমন বিশ্বাস থাকা দরকার। নাম মাহাত্ম্যে বিশ্বাস থাকা চাই।'

'কি করে ওই বিশ্বাস আসে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'তাঁর অনুরাগ থেকেই বিশ্বাস জন্ম নেয়।

অনুরাগের জন্য ব্যাকুলতা দেখাও। যেমন অনেকে মাগের অসুস্থতায় অর্থের লোকসানে কিংবা কাজের জন্য কাঁদে—ভগবানের জন্যে কে কাঁদছে বলো ?'

'যাদের কথা বলছেন, তাদের সময় কই !' ভক্ত বলতে লাগলেন, 'ইংরেজের চাকরি করেই সময় পায় না।'

'বেশ, তাহলে তাঁকে আমমোক্তারী দাও। তাঁর ওপর আন্তরিক-ভাবে সব ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিত হয়ে তিনি যা করতে দিয়েছেন সেই কাজ করে যাও। বিড়ালছানার যেমন পাটোয়ারী বুদ্ধি নেই, মা যেখানে রাখে সেখানেই পড়ে থাকে, শুধু মিউ মিউ করে ডাকে—সে হেঁসেলই হোক আর গৃহস্থের বিছানাই হোক।'

'আমরা তো গেরস্থ—কতদিন কর্তব্য করে যাব ?' ভক্তের প্রশ্ন।

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'কর্তব্য করতে হবে নিশ্চয়ই—ছেলেদের মানুষ করা, স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করা, তোমার অবর্তমানে তার জন্য ভবিষ্যতের বন্দোবস্ত করা; এ যদি না কর তো তুমি নির্দয়—দয়া যার মধ্যে নেই, সে মানুষই নয়।'

'সন্তান প্রতিপালন কতদিন ?'

'যতদিন না সাবালক হয়।' শ্রীরামকৃষ্ণ জবাব দিলেন, 'দেখনি পাখি বড় হলে নিজের ভার বইতে সক্ষম হলে তাকে ধাড়ী ঠুকরে দেয় —কাছে ঘেঁষতে দেয় না।' সবাই এই চমৎকার উপমাটি শুনে হেসে উঠল। নির্মল হাসিতে ঘর ভরে গেল। কি সুন্দর কথা! কি প্রাঞ্জল অর্থবহ!

'স্ত্রীর প্রতি আমাদের কর্তব্য কি ?'

ভক্তের এ প্রশ্নেরও জবাব দিলেন ঠাকুর, তিনি যে ভক্তদের প্রকৃত শিক্ষা দিতেই চেয়েছিলেন সারা জীবন। 'যতদিন বেঁচে থাকবে তাকে ধর্মোপদেশ দেবে, তার ভরণপোষণ করবে—যদি সে সতী হয় তোমার অবর্তমানে তার খাবারের বন্দোবস্তও করে রাখতে হবে।' ঠাকুর

একটু থামলেন, তারপর বললেন গভীর সুরে, 'তবে জ্ঞানোন্মাদ হলে তার আর কর্তব্য থাকে না। তখন তোমার হয়ে তোমার পরিবারের জন্য ভগবান নিজে ভাববেন। যেমন জমিদার যদি নাবালক ছেলে রেখে মারা যায় তো অছিরা সেই ছেলের ভার নেয়।'

ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলছিলেন তা একমনে শুনছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। ঠাকুরের এই শেষ কথা শুনে তিনি বলে উঠলেন, 'আহা কি চমৎকার কথা যিনি আনমনা হয়ে ঈশ্বর চিন্তা করেন তাঁর ভার ভগবান নিজে নেন। নাবালকের যেমন অছি এসে জোটে। আহা! যাদের এই অবস্থা হয় তারা কত না ভাগ্যবান!'

ত্রৈলোক্য প্রশ্ন করলেন, 'সংসারে কি যথার্থ জ্ঞান হয়—ভগবান লাভ সম্ভব?'

শ্রীরামকৃষ্ণ ওঁর এই প্রশ্নে হাসতে লাগলেন; রহস্য করে বললেন, 'কেন গো, তুমি তো সারে মাতে আছ, 'সংসারে থেকেও ঈশ্বরে মন রেখেছ, কেন তাহলে সংসারে হবে না? অবশ্য হবে।'

সবাই পুনরায় হেসে উঠল ঠাকুরের কথায়। কি অকপট বিশ্বাস! কি অনন্ত প্রেম!

ত্রৈলোক্য পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'সংসারে থেকে জ্ঞান লাভ হয়েছে তা বোঝবার উপায় কি?'

'কেন? হরিনামের সঙ্গে সঙ্গে ধারা আর পুলক। তাঁর মধুর নাম শুনলেই চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু নেমে আসবে আর রোমাঞ্চে শরীর কাঁপতে থাকবে। কামিনী কাঞ্চন ও বিষয়ের প্রতি লোভ থাকা পর্যন্ত দেহবুদ্ধির লোপ হয় না। বিষয়ের প্রতি আসক্তি কমার সঙ্গে সঙ্গে দেহবুদ্ধিও কমতে থাকে—আত্মজ্ঞানের দিকে যাওয়া যায়। বিষয় আসক্তি একেবারে বিলোপ হলে আত্মজ্ঞান লাভ হয় তখন আত্মা আর দেহ পৃথক বলে বোধ হয়। নারকেলের জল না শুকনো পর্যন্ত কেটে মালা আর শাঁস আলাদা করা শক্ত; কিন্তু জল শুকিয়ে গেলে

শাঁস আপনি আলাদা হয়ে পড়ে। এঁকে বলে খড়ো নারকেল। ঈশ্বরলাভের লক্ষণ হল সে লোক খড়ো নারকেলের মতো হয়ে যায়, তার দেহাত্মবুদ্ধি আর থাকে না। দেহের সুখ দুঃখের সঙ্গে তার সুখ দুঃখের বোধ থাকে না—সে মানুষ দেহসুখ আর চায়ই না, জীবন্মুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। যখন দেখতে পাবে ভগবানের নাম করতেই চোখের জল আর পুলকের জন্ম হয় তখন বুঝবে সেই ব্যক্তির ভগবান-প্রাপ্তি ঘটে গেছে। শুকনো দেশলাই সামান্য ঘষাতেই জ্বলে ওঠে কিন্তু ভিজে দেশলাই শত ঘষলেও জ্বলবে না—তার কাঠিগুলোই শুধু লোকসান হবে—বিষয়ের মধ্যে বসে থাকলে, কামিনী-কাঞ্চন রসে মন ভিজে থাকলে ঈশ্বরের অনুভব হয় না।'

'বিষয় রস শুকুবার উপায় কি তাহলে ?' ত্রৈলোক্য বলে বসলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'মাকে ব্যাকুল হয়ে ডাক। তাঁর দেখা পেলেই বিষয় রস শুকিয়ে যাবে। কামিনী-কাঞ্চন থেকে মন চলে যাবে। তাঁকে নিজের মা ভাবতে হবে। সেই ভাব হলে এক্ষুনি হয়—তিনি তো ধর্ম মা নন, আপনারই মা। আকুল হয়ে তাঁর কাছে আবদার করতে থাক। ছেলে যেমন ঘুড়ি কিনবার জন্য মার আঁচল ধরে পয়সা চায়—প্রথমে মা কোনোমতে দিতে চায় না। পরে বিরক্ত হয়ে পাঁচজনের সঙ্গে গল্প থেকে উঠে এসে কড়াৎ করে বাক্স খুলে একটা পয়সা ছেলেকে দিয়ে দেয়। মার কাছে আবদার জানাতে থাক, তিনি নিশ্চয়ই দেখা দেবেন। একটা কথা মনে পড়ে গেল। একবার কজন শিখ ভক্ত দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে এসেছিল। তারা আমাকে বলেছিল, ঈশ্বর দয়াময়। আমি তাই শুনে বলেছিলাম, কিসে দয়াময় ? তারা উত্তরে বলেছিল, তিনি সর্বদা আমাদের দেখছেন, ধর্ম অর্থ সব দিচ্ছেন—আহার যোগাচ্ছেন। উত্তরে আমি বললাম, যদি কারো ছেলেপুলে হয় তাদের খাওয়ানোর ভার বাপ-মা নেবে না তো কি বামুনপাড়ার লোকে নেবে ?'

একজন ভক্ত জানতে চাইলেন, 'তবে কি তিনি দয়াময় নন?'

'তা কেন হবে?' শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তের সন্দেহ দূর করলেন। 'ও একটা কথার কথা বললাম, তিনি যে বড় আপনার লোক। তার ওপর আমাদের জোর চলে। আপনজনকে তো এমন কথা বলা যায়, দিবি নারে শালা!' বিষয়টি চরমতম সহজ করে বুঝিয়ে দিলেন পরমপুরুষ। নিজের লোক মনে করে ভগবানের কাছে দাবি জানাতে হবে। তিনি দিতে বাধ্য। এরমধ্যে দয়াই সবটুকু নয়।

ঠাকুরের লীলার শেষের দিকের জীবন। তিনি গলায় ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। চিকিৎসার সুবিধার জন্য শ্যামপুকুরে ভক্ত বলরামবাবুর বাড়িতে বাস করছেন। কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ প্রথমে দেখেছিলেন। ঠাকুর এই রোগ আরোগ্যসাধ্য কিনা তাঁকে প্রশ্ন করে উত্তর পান নি। শ্বেতাঙ্গ ডাক্তার বলেই দিয়েছিল, এ ব্যাধি সারবার নয়। শেষ পর্যন্ত ডাক্তার সরকার তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন।

একদিন ডাক্তার সরকার দেখতে এসেছেন। দোতলায় বিছানায় শ্রীরামকৃষ্ণ বসে আছেন। ভক্তরা ছাড়াও বহু লোক তাঁকে ঘিরে। ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সেদিন ঠাকুরের অসুখ শুনে দেখতে এসেছেন। দানী বলে তাঁর সুখ্যাতি আছে। পেন্সনের টাকাও দান করেন, প্রয়োজনে ধার করে অন্যকে টাকা দেন। সব সময় ভগবানের চিন্তা করেন। ডাক্তার সরকার যেদিনই আসেন ছ-সাত ঘণ্টা এই পরম-পুরুষের সান্নিধ্যে কাটিয়ে তবে যান। শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচণ্ড শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন। সন্ধ্যে উতরে গেছে। বাইরে পরিষ্কার চাঁদের আলো, ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। সবাই তাঁর মুখের সুধাবর্ষণ শুনতে চান। কান জুড়োতে চান মধুর উপদেশের প্রকৃত শিক্ষায়। ঈশানবাবুকে দেখে ঠাকুর বলছেন, 'যে ব্যক্তি সংসারী হয়েও ভগবানের পায়ে ভক্তি রেখে সংসার করে সে ধন্য, সে বীরপুরুষ। যেমন ধরো একজন

মুটে মাথায় দুমণ বোঝা নিয়ে আছে, এমন সময় পথে বর যাচ্ছে। সে দুমণ বোঝা নিয়েই বর দেখছে। খুব শক্তি না থাকলে এমন করা যায় না। যেমন পাঁকাল মাছ, পাঁকে থাকে কিন্তু তার গায়ে একটুও পাঁক নেই। পানকৌটি সব সময় জলে ডুব দিচ্ছে। কিন্তু একবার পাখা ঝাড়া দিলেই তার গায়ে এক ফোঁটা জল থাকে না।'

ভক্তরা তন্ময় হয়ে শুনছেন এই অলৌকিক বাণী। সমস্তই লোককথা—লোকচরিত্র থেকে বলা—অথচ অলৌকিক তাঁর আপন মহিমায়। গম্ভীব অথচ রসে ভরপুব। ঠাকুব বলে চলেছেন, 'ভক্তি-লাভের পর সংসাব করা যায়। যেমন হাতে তেল মেখে কাঁটাল ভাঙলে আর আঠা লাগে না। সংসার জলের মতো আর মানুষের মন হল দুধ। জলে দুধ রাখতে গেলেই মিশে একাকার হয়ে যাবে, দই তাই নির্জনে পাততে হয়। তারপর সেই দই থেকে মাখন তুলে যদি জলে রাখ মাখন ভাসতে থাকে।

'জনক রাজার কথা ধবো। তিনি ছিলেন ভারী বীরপুরুষ। দুখানা তরোয়াল ঘোরাতেন—তাব একখানা জ্ঞান আর একখানা কর্ম। তিনি ছিলেন নির্লিপ্ত তাই তাঁর আরেক নাম বিদেহ, যার কোনো দেহবুদ্ধি নেই। সংসারে থেকেও জীবন্মুক্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতেন।

'যদি তোমরা প্রশ্ন কবো সংসার আশ্রমের জ্ঞানী আর সন্ন্যাস আশ্রমের জ্ঞানীর মধ্যে তফাৎ আছে কিনা তার উত্তর হল দুই-ই এক জিনিস। এটিও জ্ঞানী—ওটিও জ্ঞানী। তবে সংসার জ্ঞানীর ভয় আছে, কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে থাকতে গেলে একটু ভয় স্বাভাবিক। কাজলের ঘরে থাকতে গেলে যতই চালাক বা সাবধানী হও একটু না একটু দাগ গায়ে লাগবেই। মাখন তুলে যদি নতুন হাঁড়িতে রাখ, মাখন নষ্ট হবার ভয় থাকে না কিন্তু ঘোলের হাঁড়িতে রাখলে সন্দেহ হয়।' সবাই হেসে উঠল অপূর্ব প্রতীকী কল্পনায়।

'খই যখন ভাজা হয় দু-চারটে খই খোলা থেকে টপ টপ করে

লাফিয়ে পড়ে—সেগুলো যেন মল্লিকা ফুলের মতো, গায়ে কোনো দাগ নেই। খোলার ওপরের খইও বেশ খই, তবে ওই ফুলের মতো না—গায়ে একটু দাগ থাকে। সংসার-ত্যাগী জ্ঞানীরা হল গিয়ে দাগশূন্য, মল্লিকা ফুলের ন্যায়। আর জ্ঞানের পর সংসার খোলায় থাকলে একটু লালচে দাগ থাকতে পারে।' সবাই আবার হেসে উঠল অনবদ্য রস পরিবেশনে। অভিনব গদ্য কবিতা! কি তার প্রকাশভঙ্গি।

'যাই হোক, সংসারী জ্ঞানীর গায়ে দাগ থাকলেও সে দাগে কোনো ক্ষতি হয় না। চাঁদের যেমন, চাঁদে কলঙ্ক আছে বলে তার আলোর ব্যাঘাত হয় না। হাভাতে কাঠ যখন ভেসে যায় তাতে একটা পাখি বসলে তা ডুবে যায়—বাহাদুরী কাঠ যখন ভাসে তখন গরু মানুষ এমন কি হাতি পর্যন্ত তার ওপর যেতে পারে। স্টীমবোট নিজেও পারে যায় আবার সঙ্গে করে কত মানুষকে পার করে। নারদাদি আচার্যরা হলেন গিয়ে বাহাদুরী কাঠ বা স্টীমবোট। কেউ কেউ খেয়ে গামছা দিয়ে মুখ মুছে বসে থাকে, পাছে কেউ টের পায়। আবার কেউ একটা আম পেলে কেটে সবাইকে একটু একটু দেয়—নিজেও খায়। নারদাদি আচার্য সবাইর মঙ্গলের জন্য জ্ঞান-লাভের পরও ভক্তি নিয়ে ছিলেন।'

এতক্ষণ সকলে চুপ করে শুনছিলেন ঠাকুরের কথা। এবার ডাক্তার সরকার বলে উঠলেন, 'জ্ঞান মানুষকে অবাক করে, চোখ বুজিয়ে দেয় আর চোখে জল নিয়ে আসে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ভক্তি হল মেয়েমানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান যায় বারবাড়ি পর্যন্ত।' সবাই হেসে উঠল। কি মজাদার টিপ্পনী।

ডাক্তার সরকার তখন বললেন, 'তা বলে যাকে তাকে অন্তঃপুরে ঢুকতে দেয় না। বেশ্যারা যেতে পারে না। জ্ঞান চাই।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'দেখ, ঠিক পথ জানে না। কিন্তু ভগবানে ভক্তি আছে—তাঁকে জানবার ইচ্ছে রয়েছে, এসব লোক শুধু ভক্তির জোরে ভগবানকে পায়। একজন খুব ভক্ত জগন্নাথ দেখবে বলে বেরিয়েছিল কিন্তু পুরীর রাস্তা সে চেনে না। ফলে দক্ষিণ দিকে না গিয়ে সে পশ্চিম দিকে গিয়েছিল। পথ ভুল হয়েছিল ঠিকই। ব্যাকুল হয়ে লোকদের জিজ্ঞেস করায় তারা পথ বলে দিল—শেষ পর্যন্ত ভক্তটি পুরী গিয়ে জগন্নাথ দর্শন করল, দেখ, না জানলেও কেউ না কেউ বাতলে দেয়।'

ডাক্তার সরকার বললেন, 'সে তো ভুল করেছিল।'

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'ভুল তো হতেই পারে তবে শেষে তাকে পায়।'

অন্য একজন ভক্ত প্রশ্ন করলেন, 'ঈশ্বর সাকার না নিরাকার?'

ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে জানালেন,'তিনি সাকার আবার তিনিই নিরাকার। আরেক ভক্ত জগন্নাথ দেখতে গিয়েছিল। জগন্নাথের সামনে দাঁড়িয়ে তার মনে প্রশ্ন জাগল, ঈশ্বর সাকার না নিরাকার? হাতে একগাছি দণ্ড ছিল, সে সেই দণ্ড দিয়ে দেখতে লাগল জগন্নাথের গায়ে লাগে কিনা। একবার এধার ওধার ঘুরে দেখল—জগন্নাথের গায়ে ঠেকল না। তাকিয়ে দেখলে সেখানে মূর্তি নেই—আবার এদিক থেকে ওদিক যেতে গিয়ে দণ্ড বিগ্রহের গায়ে ঠেকল। ভক্ত তখন সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিল সাকারও আবার নিরাকার। কিন্তু এই বোধ ধারণায় আনা খুব কঠিন। যিনি নিরাকার তিনি সাকার হবেন কি করে—আবার যদি সাকারই হন তো নানা রূপ কেন তার?'

ডাক্তার বললেন, 'যিনি আকার করেছেন তিনি সাকার। তিনি আবার মনও করেছেন তাই তিনি নিরাকার। তিনি ইচ্ছে করলে সবই হতে পারেন।'

ডাক্তারের কথার সূত্র ধরে বললেন, 'ভগবানকে না পেলে এ সব

বোঝে না। সাধকের জন্য তিনি নানাভাবে নানারূপে দর্শন দেন। তবে একটা গল্প শোন। একজনের এক গামলা রঙ ছিল। তার কাছে অনেকে কাপড় রঙ করতে আসত। সে জিজ্ঞেস করত, তুমি কি রঙে ছোপাবে? একজন বলল, লাল। অমনি সেই লোকটি গামলার রঙে ছুপিয়ে বলত, এই নাও তোমার লাল রঙ। অন্যজন বলল, আমার হলদে রঙ চাই—সেই একই গামলায় চুবিয়ে সে বলত এই নাও তোমার হলদে রঙ। কেউ নীল রঙে ছোপাতে চাইলে সেই রঙও ওই একই গামলায় ছুপিয়ে দিত। একজন লোক ওই লোকের এই আশ্চর্য ঘটনা দাঁড়িয়ে দেখছিল। লোকটি এবার তাকেই বলল, বলো হে তোমার কি রঙ চাই? তখন দর্শক লোকটি বলল, ভাই তুমি যে রঙে রেঙেছ আমায় সেই রঙ দাও?'

গল্প শুনে সবাই হেসে উঠল। আবার আরেকটি গল্প শুরু করলেন ঠাকুর। 'একবার একজন পায়খানায় গিয়ে একটা গাছে এক জানোয়ার দেখতে পেল। সে একজনকে বলল, হ্যাঁ ভাই আমি অমুক গাছে একটি লাল রঙের জানোয়ার দেখে এলুম। শুনে লোকটি বলল, আমিও দেখেছি, তা সে লাল হবে কেন—সে তো সবুজ। আরো একজন শুনে প্রতিবাদ করে বলল, সে মোটেই সবুজ নয়। তার রঙ হলদে। আরো কজন আরো আরো রঙের নাম বলল। শেষে ঝগড়া শুরু হল। তখন তারা গাছটার কাছে গেল দেখতে পেলে ওখানে একজন লোক বসে। এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, আমি এই গাছতলায় থাকি—জানোয়ারটাকেও জানি; তোমরা যে যা বলছ তার সব সত্যি। সে কখনো লাল কখনো সবুজ কখনো হলদে। আবার কখনো দেখি তার কোনো রঙই নেই।

'যে লোক সব সময় ভগবানের চিন্তা করে সেই একমাত্র তাঁর স্বরূপ কি জানতে পারে। সে জানে ঈশ্বর নানারূপে দেখা দেন। নানা ভাবে। তিনি সগুণ আবার নির্গুণ। গাছতলায় যে থাকে সেই জানে

বহুরূপীর অনেক রঙ। মাঝে মাঝেই সে রঙ পালটায়। অন্য লোক তর্ক করে, ঝগড়া করে। তিনিই সাকার, তিনি নিরাকার। কি রকম শোন। যেন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। কোনো কূল কিনারা নেই। ভক্তি হিমে সেই সমুদ্রের জায়গায় জায়গায় জল বরফ হয়ে যায়, যেন জল আকার রূপ নিয়ে জমাট বাঁধে। এর মানে ভক্তের কাছে তিনি প্রত্যক্ষ হয়ে কখনো কখনো রূপ ধরে দেখা দেন। আবার জ্ঞান সূর্যের তাপে সেই বরফ গলে জল হয়ে যায়।' নিরাকার থেকে সাকার—জল থেকে বরফ! কি সুন্দর কথার নকশা! এমন করে বোঝানো, এই সরলী-করণ শ্রীরামকৃষ্ণের অনায়াস সাফল্য। তিনি এই সাফল্য করায়ত্ত করেই ভক্তের মধ্যে বিরাজ করেছেন। কঠিন কোনো উপমা নেই, কথা নেই—সহজতম প্রকাশের দ্বারা সবাইকে মুগ্ধ করতেন। রসপিপাসু তাঁর চেতনা এ জন্য প্রস্তুত হয়েই গড়ে উঠেছিল।

ডাক্তার সরকার টিপ্পনি কাটলেন, 'সূর্যকিরণে বরফ গলে জল হয় আবার জল আকারহীন বাষ্পে রূপান্তরিত হয়ে যায়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'অর্থাৎ তোমার কথায় ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা! এই বিচার শেষ হলে রূপটুপ উড়ে যায়। তখন আর ঈশ্বরকে কোনো কিছুতে লিপ্ত বলে মনে হয় না। তিনি কি মুখে এই বর্ণনা দেওয়া যায় না! কে বলবে? যিনি বলবেন, তিনিই নাই। তিনি তাঁর অস্তিত্ব আর খুঁজে পান না।

তখন ব্রহ্ম নির্গুণ। তখন তাঁকে কেবল অনুভবে অনুভব করা যায়। মন বুদ্ধি দিয়ে ধরা যায় না। কথায় বলে, ভক্তি হল চন্দ্র, জ্ঞান হল সূর্য। শুনেছি পৃথিবীর উত্তর দক্ষিণে সমুদ্র আছে। সেখানে খুব ঠাণ্ডা, জল জমে গিয়ে মাঝে মাঝে বরফের চাঁই হয়। সেই বরফে জাহাজ চলে না, আটকে যায়।'

ডাক্তার সরকার বললেন, 'ভক্তিপথে লোকেরা আটকে যায়।'

'হ্যাঁ তা যায় ঠিকই'—ঠাকুর ডাক্তার সরকারের কথা মেনে নিয়ে

বললেন, 'কিন্তু তাতে কোনো ক্ষতি হয় না। সেই সচ্চিদানন্দ সাগরে জলই জমাট বেঁধে বরফ হয়েছে। জ্ঞান সূর্যে বরফ গলে যাবে ; তবে সেই সচ্চিদানন্দ সাগরই রইল। জ্ঞান বিচারের পরে সমাধি হলে তখন 'আমি-টামি' থাকে না। কিন্তু সমাধি হওয়া খুব শক্ত। মন থেকে 'আমি' দূর হতে চায় না। গরু হাম্বা হাম্বা করে বলে তার অশেষ কষ্ট। গ্রীষ্ম নেই বর্ষা নেই তাকে লাঙল টানতে হয়। তাকে কসাই কাটে মৃত্যুর পর, তাতেও শেষ নেই। চামড়া দিয়ে জুতো করে। শেষমেশ নাড়ী ভুঁড়ী দিয়ে তাঁত হয়। অবশেষে ধুনুরীর হাতে পড়ে যখন তুঁহু তুঁহু করে তখন নিস্তার পায়।

'যখন জীব বলে নাহং নাহং, অর্থাৎ আমি কেউ নই, হে ভগবান তুমিই প্রভু—তখন মুক্তি।'

ডাক্তার সরকার রহস্য করে বললেন, 'ঠিক মতো ধুনুরীর হাতে পড়া চাই।' সবাই হেসে উঠল।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন, 'যদি একান্তই 'আমি' না যায় তো থাকুক শালা 'দাস আমি' হয়ে।' এই কথাতেও একটু আগের হাসি প্রলম্বিত হল।

ঠাকুর আবার বলতে লাগলেন, 'সমাধির পরেও কারো কারো 'আমি' থাকে। দাস আমি ভক্তের আমি। শঙ্করাচার্য তো লোকশিক্ষার জন্য 'বিদ্যার আমি' রেখে দিয়েছিলেন। এ সব 'আমিই' পাকা আমি। কাঁচা আমি কি তা জান? আমি কর্তা, আমি এমন বড়লোকের ছেলে, বিদ্বান, ধনী—লোকে আমাকে এসব বলে—এমন নানা ভাব। ভগবানকে যে পায় তাঁর স্বভাব পাঁচ বছরের বালকের মতো হয়ে যায়। বালকরা কোনো গুণের অধীন নয়। তারা ত্রিগুণাতীত। তারা এই ঝগড়া করলে পরমুহূর্তে ভাব করলে। এই খেলাঘর সাজিয়ে বসল তারপরই সব পড়ে রইল। হয়তো সুন্দর একখানা কাপড় পরেছে—খানিক পরেই কাপড় খুলে গেছে। সে কাপড়ের কথা একেবারে

ভুলে গেল নয়তো বগলে নিয়ে বেড়াতে লাগল। শ্রীরামকৃষ্ণ হাসলেন বালকের স্বভাব বর্ণনা করে। 'যদি ওই ছেলেটির কাছে বলো, বাঃ বেশ কাপড়টা, কার কাপড় রে? সে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়, আমার বাবা দিয়েছে। যদি বলো, লক্ষ্মী ছেলে আমায় কাপড়খানা দাও। সে উত্তর দেয়, না দেব না। তারপর ভুলিয়ে একটা পুতুল বা বাঁশি যদি তার হাতে দাও তো কাপড়টা খুলে দিয়ে দেবে। বালকের জাত—অভিমান নেই, মা যদি কাউকে বলে দেয় ও তোর দাদা, তা হলে সে জানে ষোল আনা ও তার দাদা। দুই সমবয়সী বালক—একজন বামুনের ছেলে একজন মুচির ছেলে, একপাতে খাবে। শুচি অশুচি বাই নেই হেগো পোঁদেই খাবে। আবার লোকলজ্জা নেই, ছোঁচাবার পর যাকে তাকে পেছন ফিরে বলে—দেখ দেখি আমার ছোঁচান হয়েছে কিনা?'

'আবার 'বুড়োর আমি' আছে।' ডাক্তার এই কথায় হেসে উঠলেন। 'বুড়োর অনেক বন্ধন। জাত অভিমান লজ্জা ঘৃণা ভয় বিষয়বুদ্ধি পাটোয়ারী কপটতা—এছাড়া পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, বুড়োর আমি হল কাঁচা আমি।'

ডাক্তার সরকার কথার মধ্যে বললেন, 'ইন্দ্রিয় সংযম করা বড় শক্ত।'

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, তাঁর অনুগ্রহ লাভ একবার হলে আর কোনো ভয় থাকে না। তখন ছয় রিপু আর কিছু করতে পারে না। যে ছেলে নিজে বাপের হাত ধরে মাঠের আলপথ দিয়ে চলেছে, সে অসাবধানে বাপের হাত ছেড়ে পড়ে যেতে পারে কিন্তু যে ছেলের হাত বাপ ধরে সে কখনোও খানায় পড়ে না।'

ডাক্তার সরকার বললেন, 'কিন্তু বাপ ছেলের হাত ধরা ভাল নয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'তা নয়। মহাপুরুষদের হল বালক-স্বভাব—ভগবানের কাছে তারা সবসময়ই বালক, তাদের ভেতরে অহঙ্কার নেই, তাদের সব জোর ঈশ্বরের জোর, নিজের কিছুই নয়—ভগবান তাদের কাছে বাপের মতোন, এইটেই তাদের বিশ্বাস।'

'রিপু বশ না হলে কি ঈশ্বর লাভ হয়?' ডাক্তার জানতে চাইলেন।

'জ্ঞানীরা বলেন, প্রথমে চিত্তশুদ্ধি দরকার, আগে সাধন চাই, তবে জ্ঞানলাভ হবে। জ্ঞানলাভের পর ভগবানলাভ। এ ছাড়া ভক্তিপথও আছে। যদি ঈশ্বরের পায়ে একবার ভক্তি জন্মে তাহলে ইন্দ্রিয় সংযম করতে চেষ্টার দরকার হয় না। রিপুরা আপনাআপনি বশ হয়ে যায়। বাদুলে পোকা একবার আলো দেখতে পেলে আর কি অন্ধকারে ফিরে যেতে চায়?'

ডাক্তার হেসে উঠলেন 'তা পুড়েই মরুক তাও স্বীকার।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ডাক্তারের ঠাট্টাকে নস্যাৎ করে দিলেন। 'ঠিক তা নয়। ভক্ত কিন্তু বাদুলে পোকার মতো পুড়ে মরে না। ভক্ত যে আলো দেখে ছুটে যায় তা আগুনের নয়, মণির আলো। এ আলো যেমন উজ্জ্বল তেমনি ঠাণ্ডা। এ আলো দেহ পোড়ায় না, শান্তি দেয়, আনন্দ দেয়।

'বিচার পথে তাঁকে পাওয়া খুব শক্ত। আমি শরীর নই মন নই বুদ্ধি নই, আমার রোগ নেই শোক নেই অশান্তি নেই, আমি সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, সুখ দুঃখের অতীত, ইন্দ্রিয়ের বশ নই এমন কথা মুখে বলা খুব সহজ কিন্তু কর্মে রূপান্তরিত করা খুব শক্ত। কাঁটা লেগে হাত কেটে রক্ত পড়ছে তবু মুখে বলছি কই আমার তো হাত কাটেনি। আমি বেশ আছি। এ সব কথা মুখে বললেই হয় না আগে ওই কাঁটাকে জ্ঞানাগ্নিতে পোড়াতে হয়।

'অনেকে ভাবে বই না পড়লে জ্ঞানলাভ হয় না কিন্তু পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল। কালীর বিষয় পড়া, কালীর বিষয় শোনা আর কালী দর্শনে অনেক ফারাক। আবার দেখ, যারা নিজে সতরঞ্চ খেলে তারা ততটা চাল বোঝে না, কিন্তু যারা খেলে না তারা উপর চাল বলে দেয়। সংসারী লোকেরা ভাবে আমরা খুব বুদ্ধিমান কিন্তু তারা বিষয়ে আসক্ত। নিজেরা সংসার-সতরঞ্চ খেলছে,

ঠিক চাল বুঝতে পারে না। কিন্তু সংসারত্যাগী মানুষরা বিষয়ে আসক্তি-হীন, নিজেরা খেলে না উপর চাল ঠিক বলে দিতে পারে।'

ভক্তদের দিক উদ্দেশ্য করে ডাক্তার মত দিলেন, 'এই মানুষ যদি বই পড়তেন তো এত জ্ঞান লাভ করতে পারতেন না। প্রকৃতিকে ফ্যারাডে নিজে দেখতেন তাই তিনি অত আবিষ্কার করেছিলেন। অঙ্কের মুল মানুষের মগজকে দ্বিধান্বিত করে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই তখন বললেন, 'আমি তো বই-টই কিছুই পড়িনি কিন্তু দেখ মার নাম করি তাই লোকে আমাকে মানে। শম্ভু মল্লিক এই জন্যই আমাকে বলেছিল, ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, শান্তি-রাম সিং!' সবাই এই ছড়া কাটার রহস্যে হেসে উঠল।

শ্রীরামকৃষ্ণ ডাক্তারকে বোঝাবার জন্য বললেন, 'দেখ তিনিই স্বরাট তিনিই বিরাট। যাঁরই নিত্য তারই লীলা। তিনি মানুষ হতে পারেন না। এ কথা অল্প বুদ্ধি নিয়ে জোর করে আমরা কি বলতে পারি—এক সের ঘটিতে কি চার সের দুধ ধরে? তাই সাধু মহাত্মাদের কথা বিশ্বাস করতে হয়—তাঁরা ঈশ্বর নিয়ে থাকেন যেমন উকীলরা থাকে তাদের মোকদ্দমা নিয়ে।'

ঈশান ডাক্তারকে বলে বসলেন, 'আপনি অবতার মানছেন না কেন? এই তো বললেন, যিনি আকার করেছেন তিনি সাকার, যিনি মন করেছেন তিনি নিরাকার। আপনি আরো বললেন, ঈশ্বরের কাণ্ড, সবই হতে পারে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে উঠলেন। মধুর আলো-করা হাসি। হাসতে হাসতে বললেন, 'এ কথা যে তাঁর সায়েন্সে লেখা নেই, তবে কেমন করে বিশ্বাস করবে?' সবাই হেসে উঠল হো হো করে।

ঠাকুর বললেন, 'তাহলে একটা গল্প শোন। একজন এসে বললে, ওহে! ও পাড়ায় দেখে এলাম অমুকের বাড়িখানা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে। যাকে এসে লোকটা কথাটা বললে, সে ইংরাজী পড়া

শিক্ষিত। কথা শুনে সে বললে, দাঁড়াও একবার খবরের কাগজটা দেখে নি। খবরের কাগজে কোথাও কোনো বাড়ি ভেঙে পড়ার খবর নেই। তখন সেই লোক বললে, ওহে তোমার কথা আমি মানতে পারি না, কই বাড়ি ভাঙার কোনো কথা তো খবরের কাগজে লেখে নি —সুতবাং ও সব মিথ্যে কথা।' পুনরায় সবাই প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল মজাদার এই গল্পে। তথাকথিত শিক্ষা মানুষকে কি রকম বিভ্রান্ত করে তা কি এর চেয়ে সহজে আর বোঝানো যেত!

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে লাগলেন, 'সরল না হলে ভগবানে চট করে বিশ্বাস জন্মায় না। বিষয়-বুদ্ধি থেকে ভগবান বহু দূরে অবস্থান করেন। বিষয়-বুদ্ধি থাকলেই সরল হওয়া যায় না, সন্দেহ দেখা দেয়, সঙ্গে নানা রকম অহঙ্কার এসে মনে বাসা বাঁধে—তাহলেও ইনি কিন্তু সরল।' এই কথা বলে তিনি ডাক্তারকে নির্দেশ করলেন। 'কেশব সেন খুব সরল ছিল। একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে অতিথশালা দেখে বেলা চারটের সময় বললে, তা অতিথি কাঙালদের কখন খাওয়ানো হবে? বিশ্বাস যত বাড়বে, জ্ঞান তত বাড়বে। যে গরু বেছে বেছে খাবার খায় সে ছিড়িক ছিড়িক করে দুধ দেয়, আর যে গরু গবগব করে সব খায় সে হুড়হুড় করে দুধ দেয়।' আবার হাসির রোল উঠল রসের কথায়। তিনি সকলকে রসের যোগান দিচ্ছেন আর হাসাচ্ছেন। এমন করে রস যোগানো সাধারণ মানুষের পক্ষে অসাধ্য।

বালকের মতো বিশ্বাস না হলে ঈশ্বরলাভ হয় না। যার বিশ্বাস বালকের মতো তার প্রতি ভগবানের দয়া হয়। সংসার বুদ্ধিতে তাঁকে পাওয়া যায় না।'

ডাক্তার হার মানবার পাত্র নন। তিনি বললেন, 'যা তা খেয়ে গরুর খুব দুধ হওয়া ভাল নয়। আমার একটা গরুকে ওই রকম যা-তা খাওয়াতো। তার দুধ খেয়ে শেষে আমাকে ভারী রোগে ধরলে। তখন সেই রোগ সারাতে বার হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল।' এই

কথাতেও সবাই হেসে উঠল হো হো করে।

'খুব কথা বললে যা হোক।' শ্রীরামকৃষ্ণ ডাক্তার সরকারকে বললেন, 'তেঁতুলতলা দিয়ে আমার গাড়ি গিয়েছিল তাই আমার অম্বল হয়েছিল।' এবার ডাক্তার সবাইর সঙ্গে উচ্চ হাসিতে যোগ দিলেন।

গিরিশ ঘোষ ডাক্তারকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এখানেই তো তিন চার ঘণ্টা কাটালেন, রোগীদের চিকিৎসা করতে যাবেন না?'

ডাক্তার সরকার উত্তরে বললেন, 'আর ডাক্তারী আর রোগী! যে পরমহংস জুটেছে তাতে আমার সব গেল।' হাসির হররা ছুটল।

ঠাকুর বললেন, 'কর্মনাশা নামে এক নদী আছে, সে নদীতে ডুব দিলে মহাবিপদ। যে ব্যক্তি ডুব দেয় তার সব কর্ম নাশ হয়ে যায়, সে আর কাজ করতে পারে না।' মুখের মতো জবাব পেয়ে ডাক্তার পুনরায় সকলের সঙ্গে হেসে উঠলেন।

ঠাকুরকে ডাক্তার বললেন, 'যে অসুখ তোমার হয়েছে তাতে অন্যের সঙ্গে কথা বলা চলবে না! তবে আমি যখন আসব কেবল আমার সঙ্গে কথা বলবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'অসুখটা ভাল করে দাও না—দেখছ না তাঁর নাম-গান করতে পারি না।'

'ধ্যান করলেই হল।' ডাক্তার উত্তর দিলেন।

'সে কি কথা!' ঠাকুর প্রতিবাদ করলেন, 'আমি একঘেয়ে কেন হব—পাঁচ রকম করে মাছ খাই। কখনো ঝোল, কখনো ঝাল, অম্বল আবার কখনো ভাজা। তেমনি কখনো পুজো কখনো জপ, কোনো কোনো সময় ধ্যান আবার কখনো বা তাঁর নাম গুণগান করি, তাঁর নাম করে নাচি।'

ডাক্তার সরকার বললেন, 'আমিও একঘেয়ে নই।'

ঠাকুর বললেন, 'তোমার ছেলে অমৃত অবতার মানে না তাতে দোষ কি? ভগবানকে নিরাকার বলে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়

—তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও তাঁর শরণাগত হওয়া এ দুটি দরকার। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকা চাই—আন্তরিক ডাক তিনি শুনবেনই। সাকারবাদী পথেই যাও, আর নিরাকারবাদী পথেই যাও—তাঁকেই পাবে। মিছরির রুটি সিধে করেই খাও আর আড় করেই খাও মিষ্টি লাগবে। তোমার ছেলে অমৃত বেশ।'

ডাক্তার সরকার জানালেন, 'সে তোমার চেলা।'

শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে ডাক্তারকে বললেন, 'আমার কোনো শালা চেলা নেই। আমিই সকলের চেলা। সকলেই ঈশ্বরের সন্তান, সকলেই তাঁর দাস তাই আমিও তাঁর ছেলে এবং দাস। চাঁদ কারো একার নয়, চাঁদ মামা সকলেরই মামা।'

এমন সহজ বলার ভঙ্গি এমন সরল আলোচনায় এত প্রগাঢ় জ্ঞান যিনি রসিক তিনি ছাড়া আর কে দিতে পারেন! শ্রীরামকৃষ্ণ এ যুগের সবচেয়ে বড় রসবেত্তা তাই তিনি কাহিনীর পর কাহিনী আর কথার পর কথা বুনে বুনে মানুষকে অমেয় রসের সাগরে অবগাহন করিয়েছেন। তিনি নির্মল আনন্দ দান করেছেন সব কিছু থেকে নির্মোহ ও নিস্পৃহ হয়ে। শুধু ভক্তদের জন্য দেহ রেখেছিলেন। এমন রসিক গুরু না হলে হাজার হাজার রসপিপাসু ভক্ত জুটবে কোত্থেকে!

শ্যামপুকুরে প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে গেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এই একই পাড়ায় কাপ্তেনের বাড়ি। ঠাকুর আগেই ঠিক করেছেন প্রাণকৃষ্ণর বাড়ি হয়ে কাপ্তেনের বাড়ি যাবেন। সেখান থেকে কেশবচন্দ্র সেনের কমল কুটিরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। দোতলায় বৈঠকখানায় ঠাকুর বসেছেন। সঙ্গে অনেক ভক্ত তাঁকে ঘিরে। তাঁর শ্রীমুখবাণী শোনবার জন্য পাড়ার বহু লোক এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে আনন্দে তিনি সময় কাটাচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রোতাদের

ঈশ্বর ও তাঁর ঐশ্বর্য নিয়ে বলছেন। তিনি বললেন, 'এই জগৎই ভগবানের ঐশ্বর্য। কিন্তু কি মজা, সবাই এই ঐশ্বর্য দেখেই মোহিত হয়, তাঁকে কেউ খোঁজে না। সবাইকে কামিনী-কাঞ্চন পেয়ে বসে আর তাতেই অশান্তি বাড়ে। সংসার যেন বিশালাক্ষীর দ, নৌকো একবার এই দ'তে পড়লে আর রক্ষে নেই। কুল কাঁটার মতো সে, একটি ছাড়ে তো আরেকটি জড়ায়। গোলক-ধাঁধায় একবার ঢুকলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন। মানুষ যেন পুড়ে ঝলসে যায়।'

একজন ভক্ত তখন জানতে চাইলেন, 'তাহলে উপায় কি?'

'উপায় সাধুসঙ্গ আর প্রার্থনা। সাধুসঙ্গ একদিনের নয়, সব সময় প্রয়োজন। বৈদ্যের কাছে না গেলে অসুখ সারে না। রোগ লেগেই থাকে। বদ্যির কাছে না থাকলে নাড়ীজ্ঞান হয় না। তাই সঙ্গে সঙ্গে ঘোরা দরকার। তাহলে বোঝা যাবে কোনটি কফের নাড়ী আর কোনটি পিত্তির নাড়ী।'

'সাধুসঙ্গে কি উপকার হয়?' ভক্তরা প্রশ্ন করলেন।

'ভগবানের প্রতি ভালবাসা জন্মায়। ব্যাকুলতা না এলে কিছুই হয় না। সাধুর সঙ্গে থাকতে থাকতে ভগবানের জন্য প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। বাড়িতে কারোর অসুখ করলে প্রাণ যেমন ব্যাকুল হয় এও ঠিক তেমনি। ব্যাকুলতার সঙ্গে চাই প্রার্থনা। তাঁকে বলতে হবে তুমি যে আপনার লোক, তুমি কি রকম? আমাকে দেখা দাও—দেখা দিতেই হবে, তুমি তাহলে আমাকে সৃষ্টি করেছ কেন? প্রার্থনায় এই জোর চাই। তিনি যে আমাদের মা-বাপ। ছেলে বায়না ধরলে বেজার হয়েও মাকে শুনতে হবে। এও তেমনি। সাধুসঙ্গ করলে সদসৎ বিচার আসে। সৎ, নিত্য পদার্থ অর্থাৎ ঈশ্বর; অসৎ অর্থাৎ যা চিরস্থায়ী নয়। অসৎ পথে মন গেলেই বিচার করতে হয়। হাতি পরের কলাগাছ খাবার জন্য শুঁড় বাড়াতেই মাহুত

তাকে ডাণ্ডস দিয়ে মারে।'

একজন প্রতিবেশী প্রশ্ন করলেন, 'পাপবুদ্ধি কেন হয় একটু বলবেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'তাঁর জগতে সব কিছু আছে। তিনি সাধু দুষ্ট—দুইই করেছেন। সৎ অসৎ দুরকম বুদ্ধিই তিনি দেন।'

'তবে কি পাপ কাজে আমাদের দায়িত্ব নেই?' প্রতিবেশী ঠাকুরের দিকে তাকালেন।

'ঈশ্বরের নিয়ম হল পাপ করলে তার ফল পেতে হবে। লঙ্কা খেলে তার ঝাল লাগবে না? বয়সকালে সেজবাবু অনেক কিছু করেছিল—তাই মৃত্যু সময় নানা রকম অসুখ হল। কম বয়সে এসব বোঁঝা যায় না। আগুন জ্বালবার অনেক রকম শুকনো কাঠ থাকে। ভিজে কাঠ প্রথমটায় বেশ জ্বলে যায়, তখন বোঝা যায় না যে ওর ভেতর জল রয়েছে। কাঠ পোড়া শেষ হলে যত জল পিছনে আসে উনুন নিবে যায়। তাই কাম, ক্রোধ, লোভ এসব থেকে সতর্ক থাকতে হয়। দেখ না হনুমান ক্রোধবশে লঙ্কা পুড়িয়েছিল, শেষে তাঁর মনে পড়ল অশোক বনে তো সীতা রয়েছেন। তখন ছটফটানি শুরু হল—যদি সীতার কিছু হয়।'

প্রতিবেশী বললেন, 'ঈশ্বর তাহলে দুষ্টু লোক তৈরি করলেন কেন?'

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'এ তাঁর ইচ্ছা, তাঁর লীলা। তাঁর মায়ার মধ্যে বিদ্যা অবিদ্যা দুই আছে। অন্ধকারের প্রয়োজন রয়েছে, অন্ধকারের মধ্যে আলোর মহিমা আরো বেশি বোঝা যায়। কাম ক্রোধ লোভ খারাপ জিনিস, তবে এসব তিনি দিলেন কেন? তার কারণ তিনি মহৎ লোক সৃষ্টি করবেন বলে। ইন্দ্রিয়জয়ীরাই মহৎ হয়—জিতেন্দ্রিয় কি না করতে পারে! ঈশ্বর লাভ পর্যন্ত করে। আবার অন্যদিকে কামের জন্যই তো সৃষ্টিলীলা চলছে। দুষ্টু লোকেরও দরকার

পৃথিবীতে। সীতা অযোধ্যা দেখে রামকে বলেছিলেন, রাম অযোধ্যায় সব বাড়িই যদি অট্টালিকা হত তো বেশ হত। কিন্তু দেখছি অনেক বাড়ি পুরনো, ভাঙা। শুনে রাম বললেন, সব বাড়ি সুন্দর থাকলে মিস্ত্রীরা কি করবে?' কথার মধ্যে সবাই হেসে উঠল। রসিক ঠাকুর সবাইকে হাসিয়ে নিলেন। 'ভগবান এই সব করেছেন, ভাল গাছ, বিষ গাছ, আবার আগাছাও। পশুদের মধ্যেও ভাল মন্দ আছে, বাঘ সিংহ সবই রয়েছে।'

প্রতিবেশী উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'সংসারে থেকে কি ভগবানকে পাওয়া যায়?'

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'অবশ্য পাওয়া যায়। তার আগে যা বলেছি, সাধুসঙ্গ আর সর্বদা প্রার্থনা করতে হবে। তাঁর কাছে কাঁদতে হবে। মনের সব ময়লা ধুয়ে গেলে তার দর্শন পাওয়া যায়। মনটা যেন মাটি-মাখা লোহার স্চ আর ভগবান চুম্বক পাথর—মাটি না গেলে চুম্বকের সঙ্গে লোহার যোগ হবে না। স্চের মাটি হল কাম ক্রোধ লোভ পাপবুদ্ধি বিষয়বুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি হলে ভগবান লাভ হয়। জ্বরে যদি দেহে রস হয় তো কুইনাইন খেয়ে কি কাজ হবে! সংসারে হবেনা কেন? ওই সাধুসঙ্গ, কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা, মাঝে মাঝে একাকী নির্জনে বাস এসব দরকার।'

'তাহলে আপনি বলছেন যারা সংসারে আছে তাদেরও হবে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রতিবেশীর এই কথায় বললেন, সকলেরই মুক্তি হবে। তবে গুরুর উপদেশ মত চলতে হবে—বাঁকা পথ ধরলে ফিরতে কষ্ট হবে, মুক্তি অনেক দেরীতে হয়। হয়ত এ জন্মে হল না, অনেক জন্মের পর হল। জনকরা সংসারেও কাজ করেছিলেন। ভগবানকে মাথায় নিয়ে তাঁরা কাজ করেছেন। নর্তকী যেমন মাথায় বাসন নিয়ে নাচে। পশ্চিমের মেয়েদের দেখেছ তো? মাথায় জলের ঘড়া নিয়ে হাসতে হাসতে কথা কইতে কইতে যেমন রাস্তা চলে।

'গুরুর উপদেশের কথা বললেন, তা এই গুরু পাব কি করে? প্রতিবেশী বলে উঠলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, যে সে লোক গুরু হতে পারে না। তাই ঈশ্বর যুগে যুগে লোকশিক্ষার জন্য নিজে গুরুরূপে মর্ত্যে নেমে এসেছেন। সচ্চিদানন্দই গুরু।' এ কথায় কি শ্রীরামকৃষ্ণ কোনো নিগূঢ় সত্যকে সকলের চোখের সামনে তুলে ধরলেন। এই রসিক অকপট সরল মানুষটি কি তবে—! কি মহিমা নিয়ে তিনি উদ্ভাসিত তা কখনো বলেন নি। কিন্তু রস পরিবেশনের মধ্যে সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন। এবার তোমরা বুঝে নাও। তিনি আবার বলতে লাগলেন, জ্ঞান কাকে বলে আর আমি কে? ভগবানই কর্তা আর সব অকর্তা এর নাম হল জ্ঞান। আমি তাঁর হাতের যন্ত্র মাত্র। তাই তো আমি বলি, মা তুমি যন্ত্রী আমি যন্ত্র; তুমি ঘরণী, আমি ঘর; আমি গাড়ি, তুমি ইঞ্জিনীয়ার; যেমন চালাও তেমন চলি। যেমন করাও তেমনি করি। যেমন বলাও তেমনি বলি, নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু।'

কেশব সেনের বাড়ি গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কেশবচন্দ্রকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসতেন। বেলঘরের বাগানে যেখানে শিষ্যদের নিয়ে কেশবচন্দ্র সাধন ভজন করতেন সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখতে যান। সঙ্গে ভাগ্নে হৃদয়ও ছিল। সেইখানেই ঠাকুর বলেছিলেন, 'তোমারই ল্যাজ খসেছে। অর্থাৎ তুমি সব ত্যাগ করে সংসারের বাইরেও থাকতে পার আবার সংসারে থাকতে পার, ব্যাঙাচির যেমন ল্যাজ খসলে জলেও থাকতে পারে আবার ডাঙায় থাকতে পারে।' যতবার কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয়েছে, ঠাকুর ততবার তাঁকে নানা-ভাবে উপদেশ দিয়েছেন, নানা পথ দিয়ে নানা ধর্মের ভেতর দিয়ে ঈশ্বরকে পাওয়া যেতে পারে। মাঝে মাঝে নির্জনে সাধন ভজন করে, ভক্তিলাভ করে সংসারে বাস করা যায়। তোমরা যা করো, নিরাকারের সাধন তা খুবই ভাল। একবার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ

করলে বুঝতে পারবে ভগবানই সত্য আর সবই অনিত্য। ব্রহ্ম সত্য এ জগৎ মিথ্যা। হিন্দু ধর্মে সাকার নিরাকার দুই আছে, নানা-ভাবে ভগবানের পুজো করে। শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য মধুর।'

ঠাকুর উদাহরণ দিয়ে বোঝালেন, 'সানাইঅলার সঙ্গে পো ধরে যে বসে থাকে তার বাঁশিতেও সাতটা ফুটো আছে—অথচ সে কিছুই বাজায় না। অপরজন ওই সাতফোকর বাঁশি থেকেই কতরকম রাগ-রাগিনী বাজিয়ে চলেছে। তোমরা সাকার মান না, তাতে কিছু আসে যায় না। যা করছ তাতে নিষ্ঠা থাকলেই হল। তবে সাকারবাদীদের ভালবাসাটুকু গ্রহণ করবে। মা বলে তাকে ডাকলে ভক্তি প্রেম বাড়বে। কামনাহীন ঈশ্বরকে ভালবাসা ব্যাপারটুকু খাঁটি। একে বলে অহেতুকী ভক্তি। তোমরা বক্তৃতা দাও সকলের উপকারের জন্য কিন্তু তাঁর হুকুম ছাড়া লোকশিক্ষা দেওয়া যায় না। যার ভগবান লাভ হয় তার ভেতরে চিহ্ন ফুটে বেরয়। সে বালকবৎ জড়বৎ উন্মাদবৎ বা কখনো পিশাচবৎ হয়ে যায়। চৈতন্যদেবের মধ্যে এসব দেখা গিয়েছিল।'

শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন শুনে কেশব সেন ভেতর থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন। তাঁকে দেখেই ঠাকুর বললেন, 'তোমার তো অনেক কাজ, তাই হয়তো দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার অবকাশ পাও নি ; তাই আমিই তোমাকে দেখতে এলাম। তোমার অসুখ শুনে মার কাছে ডাব-চিনি মেনেছিলুম, মাকে বলেছিলাম, মা, কেশবের যদি কিছু হয় তো কলকাতায় গিয়ে কার সঙ্গে কথা বলব।'

অন্যান্য কিছু ভক্ত ছিল সেখানে। ঠাকুর সকলের সঙ্গে কথা বলছেন। ব্রাহ্ম ভক্তরা সমাধ্যায়ী নামে একজনকে দেখিয়ে বললেন, ইনি পণ্ডিত বেদাদি শাস্ত্র পড়েছেন। সেই কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'হ্যাঁ এর চোখের মধ্যে দিয়ে ভেতরটা দেখা যাচ্ছে—যেমন কাচের দরজা দিয়ে ঘরের ভেতর দেখা যায়।'

ত্রৈলোক্যের গান হল। গান শুনতে শুনতে ঠাকুর দাঁড়িয়ে পড়লেন।

তারপরই সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। সমাধি ভাঙতেই নিজে নাচতে নাচতে গান ধরলেন। তাঁর এই সমস্ত কিছু যেন কেশব সেনকে আপন করে পাবার জন্য। যাতে তিনি না পর হয়ে যান।

শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন সমাধিতত্ত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন ভক্তদের। 'সচ্চিদানন্দ লাভ করলে পর সাধকের সমাধি হয়। তখন তার আর কাজ থাকে না। কাজ শেষ হয়ে যায়। আমি ওস্তাদের নাম করছি তখন যদি ওস্তাদ নিজেই এসে হাজির হন তাহলে আর নামের কি দরকার। যতক্ষণ ফুলের ওপর না বসে ততক্ষণই মৌমাছি গুনগুন করে। সচ্চিদানন্দকে পাওয়ার পর যাঁরা বিচার করে তারা মধুপানরত মৌমাছির আধ আধ গুনগুন করার মতো করে।'

এক গানের ওস্তাদ কিছু আগে ঠাকুরকে গান গেয়ে শোনান। তাঁর গানে তিনি খুব খুশি। তাই তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, 'যে লোকের একটি বড় গুণ আছে—যেমন ধরো সঙ্গীতবিদ্যা—তাঁর মধ্যে ভগবানের বিশেষ শক্তি পাওয়া যায়।'

ওস্তাদ এবারে শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা তাঁকে কিভাবে পাওয়া যায়?'

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'ভক্তিই সব। তিনি তো সর্বত্র রয়েছেন। তবে ভক্ত কাকে বলব? যার মন সবসময় ঈশ্বরেতে আছে। শুধু ভক্তি হলেই হল না। অহঙ্কার অভিমান এসব থাকলে হয় না। 'আমি' রূপ চিনিতে ভগবানের কৃপারূপ জল দাঁড়ায় না—গড়িয়ে পড়ে যায়।' সব ভক্তদের উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, 'সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। সব ধর্মই সত্য। ছাদে ওঠা নিয়ে কথা, তা যে ভাবেই তুমি ওঠ না কেন। পাকা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পার। কাঠের সিঁড়ি দিয়েও। বাঁশের সিঁড়ি, দড়ি এমন কি একটা আছোলা বাঁশ বেয়েও তো ওঠা যায়।

'যদি অন্যের ধর্ম দেখিয়ে বল, ওদের ধর্মে অনেক ভুল আছে, কুসংস্কার আছে, তাহলে আমি বলি সব ধর্মেই তো ভুল রয়েছে। সবাই ভাবে আমার ঘড়িই বুঝি ঠিক যাচ্ছে। আকুলতা থাকলেই হল, তাঁর প্রতি ভালবাসা, মনের আন্তরিক টান। তিনি অন্তর্যামী, হৃদয়ের টান আন্তরিকতা দেখতে পান। সবাই তাঁর সন্তান। মনে করো এক বাপের অনেকগুলো ছেলে। বড় যারা, তারা কেউ স্পষ্ট বাবা পাপা এই সব বলে ডাকে। আবার যে শিশু নিতান্ত ছোট সে বা কিংবা পা বলেই ডাকে। এই ডাক শুনে বাবা কি তাদের ওপর রেগে যান? বাবা সব জানে। তাঁর কাছে সব ছেলেই সমান।

'নানা ভক্ত তেমনি নানা ভাবে ডাকছে। নানা ধর্মের লোকের পদ্ধতি আলাদা। কিন্তু সবাই ভিন্ন নামে ওই একজনকেই ডাকছে। সেই বিশেষ জন যাঁর নাম ঈশ্বর। এক ঈশ্বর তাঁর নানা নাম।'

ভক্ত সঙ্গে ভগবানের কথা ছাড়া শ্রীরামকৃষ্ণ অন্য কথা কন না। ভগবান বিষয়ে আলোচনা। তাঁকে পাওয়ার উপায় সম্বন্ধে পথ বাৎলানো। ভক্তদের সংসারী বদ্ধজীবের কথা বলছেন রসিয়ে রসিয়ে। সংসারী লোক যেন গুটিপোকাৎ ইচ্ছে করলেই কেটে বেরিয়ে আসতে পারে—কিন্তু তা হয়ে ওঠে না। এত যত্ন দিয়ে তৈরি গুটি ছেড়ে সে যায় না। ফলে ওখানে আটকে পড়ে আর ওতেই শেষ পর্যন্ত তার মৃত্যু ঘটে যায়। ঘূর্ণির মধ্যে যেমন মাছ—হঠাৎ এসে পড়ে। যে পথ দিয়ে এসেছে, সেই পথে বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু জলের মিষ্টি শব্দ আর তা ছাড়া অন্য মাছদের সঙ্গে খেলা করার স্পৃহা। এইতে সে বাইরে আসে না। ছেলেমেয়েদের আধ আধ কথাবার্তা কি সুন্দর! সেই ফেলে বেরিয়ে আসার পথ সংসারীরা চোখে দেখতে পায় না।

'জীব যেন ডাল, জাঁতার ভিতর পড়েছে, পিষে যাবে। কিন্তু

খুঁটির কাছে যে কটা ডাল থাকে তারা পেষে না। তাই খুঁটি ধরে থাকতে হয় অর্থাৎ ঈশ্বরের আশ্রয় নিতে হয়। তাঁকে ডাক, তাঁর নাম করো তবেই মুক্তি। তা নাহলে কালরূপ জাঁতায় পিষে যাবে।'

এতক্ষণ বিশ্বাস রায় একজন ভক্ত ঠাকুরের সঙ্গে বসেছিলেন। তিনি এবার চলে গেলেন। বলরামবাবু শ্রীরামকৃষ্ণকে তাঁর বিষয়ে বললেন, 'এখন ওর খুব সাধুসঙ্গ করার ইচ্ছা।'

শ্রীরামকৃষ্ণ কথা শুনে হাসলেন। বললেন, 'সাধুর কমণ্ডলু চার ধাম ঘুরে আসে। কিন্তু যেমন তেতো ঠিক তেমনিই থাকে। মলয়ের হাওয়া যে গাছে লাগে তারা চন্দনে রূপান্তরিত হয়। তাবলে শিমূল অশ্বথ আমড়া এরা পাল্টায় না। অনেকে সাধুসঙ্গ করে গাঁজা খাবার জন্য। তাই তাদের কাছে এসে গাঁজা সেজে দিয়ে প্রসাদ পায়।' সবাই তাঁর কথায় হেসে উঠল। সত্যি এমন ভক্ত অনেক পাওয়া যায়।

মনোমোহনের বৈঠকখানায় আসর বসেছে। তেমনি মজলিশ। ধর্ম আলোচনা সৎকথা। ঠাকুর বলছেন, 'যে দীন তার ভক্তি ভগবানের খুব প্রিয় জিনিস। খোল মাখান জাব যেমন গরুর কাছে উপাদেয়। শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের অত ঐশ্বর্য দেখেও বিদুরের কুটিরে গেলেন। কারণ তিনি ভক্তবৎসল।

'চৈতন্যদেবের কৃষ্ণ নামে অশ্রু পড়ত। ভগবানই সবকিছুর সার আর সব অসার। লোকেরা ইচ্ছে করলেই ভগবান লাভ করতে পারে। কিন্তু তারা কামিনী-কাঞ্চন নিয়েই মেতে থাকে। মাথায় রয়েছে মানিক, তবু ব্যাঙ সাপ খেয়েই মরে। ভক্তিই সব। ঈশ্বরকে বিচার করে কে জানবে? তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্যের অত জানবার দরকার কি! এক ঘটি জলে আমার তেষ্টার নিবৃত্তি সেখানে পৃথিবীতে কত জল আছে সে খবরে কি প্রয়োজন!'

মনোমোহনের বাড়ি থেকে সুরেন্দ্রর বাড়ি। প্রত্যেকের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করছেন ঠাকুর। সেখানেও একই দৃশ্য! বহু জন দর্শনার্থী।

তাঁর অমৃতবাণী শ্রবণের অভিলাষী। সুরেন্দ্রর দাদার সঙ্গে কথা বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি একজন জজ। তাঁকে বলছেন, 'আপনি জজ, তা বেশ। জানবেন সবই ভগবানের ক্ষমতা। বড়পদ তিনিই দিয়েছেন। লোকে ভাবে আমরা বড়লোক, ছাদের জল সিংহের মুখঅলা নল দিয়ে পড়ে দেখে মনে হয় সিংহ মুখ থেকে বার করে দিচ্ছে। কিন্তু দেখ কোথাকার জল! আকাশে মেঘ হল, তাতে বৃষ্টি—সেই জল ছাদে পড়ে তারপর গড়িয়ে নলে যাচ্ছে, তারপর সিংহের মুখ দিয়ে বেরচ্ছে।'

সুরেন্দ্রর ভাই বললেন, 'ব্রাহ্ম সমাজ স্ত্রী স্বাধীনতার কথা বলে, জাতিভেদ ওঠাতে চায়—এ ব্যাপারে আপনার কি মত?'

'ঈশ্বরেতে ভালবাসা জন্মালে ঐরকম মনে হয়। ঝড় এলে ধুলো ওড়ে; আম কোনটা তেঁতুল কোনটা আর কোনটা আমড়া গাছ চেনা যায় না—ঝড় থামলে বোঝা যায়। নতুন ভালবাসার জোয়ার কমলে বোধ জাগে ভগবানই শ্রেষ্ঠ বাকী সব অনিত্য। সাধুসঙ্গ তপস্যা প্রভৃতি না করলে এসব বোঝা যায় না। পাখোয়াজের বোল মুখে বললে কি হবে, হাতে আনা খুব শক্ত। তেমনি শুধু লেকচাবে কি হবে, তপস্যা চাই তবে তো বোধে এ চিন্তা জন্ম নেবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বললেন, 'জাতিভেদ? কেবল একটা উপায়ে জাতিভেদ উঠতে পারে। তা হল ভক্তি। ভক্তের কোনো জাত নেই। অস্পৃশ্য জাত শুদ্ধ হয়ে যায়। চণ্ডালের ভক্তি হলে সে আর চণ্ডাল থাকে না। চৈতন্যদেব তাই আচণ্ডাল সবাইকে কোল দিয়েছিলেন। সব পথ দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়। এক ঈশ্বরকে নানা নামে ডাকে নানা জন।'

সুরেন্দ্রর ভাই আবার বললেন, 'থিওজফির কিছু বোঝেন?'

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'শুনেছি ওতে নাকি অলৌকিক শক্তি হয়। দেব মোড়লের বাড়িতে একবার এক পিশাচসিদ্ধকে দেখেছিলাম।

পিশাচ কত কি জিনিস এনে দিত। কিন্তু ওই শক্তি দিয়ে কি হবে? ও দিয়ে কি ভগবানকে পাওয়া যায়? ভগবানকেই যদি না পেলাম তাহলে সব মিথ্যা।'

কলকাতার আরেক ভক্তের বাড়িতে গিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মণিলাল মল্লিকের বাড়ি। ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা হবে। বিজয়কৃষ্ণ এসেছেন। তিনিই উপাসনা করবেন। কথকতা হচ্ছে। বিষয় প্রহ্লাদ চরিত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের চোখ দিয়ে জল পড়ছে ভগবান নাম শ্রবণে। আধা ভাবাবস্থা। একটু বাদেই তিনি ভক্তদের বলছেন, ভক্তিই সার! দেখ শিবনাথের কি ভক্তি! যেন রসে ফেলা ছানাবড়া। এ রকম ভাবা উচিত নয় যে আমার ধর্মই ঠিক। আর অন্য সব ধর্ম ভুল। সব পথ দিয়েই তাঁর কাছে যাওয়া যায়। অন্তরের আকুলতা থাকা দরকার। অনন্ত পথ—অনন্ত মত। ঈশ্বরকে দেখা যায়। অবাঙমনসগোচর বেদে এ কথা বলেছে, এর মানে বিষয়াসক্ত মনের অগোচর। বৈষ্ণবচরণ বলত তিনি শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। তাই সাধুসঙ্গ প্রার্থনা গুরুর উপদেশ এ সবের দরকার। এতে চিত্ত-শুদ্ধি হয়। তখন দর্শন ঘটে। ঘোলা জলে ওষুধ ফেললে তা পরিষ্কার হয়। তখন মুখ দেখতে পাওয়া যায়। ময়লা আয়নায় মুখ দেখা যায় না।

'চিত্তশুদ্ধির পর ভক্তিলাভ—তবে তাঁর দয়ায় দর্শন। দর্শনের পর চাই আদেশ। তাহলেই লোকশিক্ষা দেওয়া চলে। আগে থাকতে লেকচার দেওয়া ভাল নয়। হৃদয় মন্দির প্রথমে সাফ করা দরকার। তারপর প্রতিমা এনে তাঁর পূজার ব্যবস্থা করতে হয়। আয়োজন কিছু নেই—এদিকে ভোঁ ভো করে শাঁখ বাজানো—তাতে কি হবে বলতে পার?'

যেমন ভক্তের বাড়িতে তেমনি দক্ষিণেশ্বরে। সর্বদা শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বর প্রসঙ্গ নিয়ে আছেন। রসের ভেতর দিয়ে মজার মজার কাহিনীর

মধ্য দিয়ে শরণাগত ভক্তদের ধর্মপথে নিয়ে আসছেন। এ এক অলৌকিক ক্ষমতা! কি অসাধারণ বলবার সহজ ভঙ্গি। রসবোধের সঙ্গে ধর্মানুরাগের কি অপূর্ব মিশ্রণ।

একদিন বিকেলে মন্দির সংলগ্ন নিজের ঘরে ভক্ত সঙ্গে কথা বলছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন, 'ঈশ্বর সব করছেন এ জ্ঞান হলে তো জীবন্মুক্ত। শম্ভু মল্লিকের সঙ্গে কেশব সেন এসেছিল, তাকে বললাম, গাছের একটি পাতাও তাঁর ইচ্ছা ছাড়া নড়ে না। সুতরাং স্বাধীন ইচ্ছা কোথায়? সবাই তাঁর অধীন। ন্যাংটা অতবড় জ্ঞানী, সেই জলে ডুবতে গিয়েছিল। এখানে এগারো মাস ছিল। পেটের ব্যারাম হল—রোগের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে গঙ্গায় ডুবতে গেল। ঘাটের কাছে অনেকটা চড়া, যত যায় হাঁটু জলের চেয়ে আর বেশি হয় না। তখন বুঝলে, আবার ফিরে চলে এল।'

নন্দনবাগানের শ্রীনাথ মিত্র তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে এসেছেন। ঠাকুর তাঁকে দেখেই বলছেন, 'এই যে এর চোখের ভেতর দিয়ে সবটা দেখা যাচ্ছে।'

মাস্টার মহেন্দ্র গুপ্ত বললেন, 'বিদ্যাসাগর মহাশয় অভিমান করে বলেন, ঈশ্বরকে ডাকবার আর কি দরকার? দেখ চেঙ্গিস খাঁ লুটপাট করে অনেককে বন্দী করলে—অত লোক খাওয়াবে কে? তখন তাদের বধ করলে নিষ্ঠুর ভাবে। এই হত্যাকাণ্ড তো ঈশ্বর দেখলেন, কই তিনি তো তা বন্ধ করলেন না—তা তিনি থাকেন থাকুন, আমার তাঁকে দরকার লাগছে না। আমার তো কোনো উপকার হল না।

শ্রীরামকৃষ্ণ এ কথা শুনে উত্তর দিলেন, 'ভগবানের কাজ কি বোঝা যায়—তিনি কখন কি উদ্দেশ্যে কোন্ কাজ করেন। তিনি সৃষ্টি পালন সংহার সবই করছেন। কেন জীব মারছেন আমরা কি বুঝতে পারি? আমি তাই বলি মা আমার বোঝবার দরকার নেই, শুধু তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দাও। মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য এই ভক্তি লাভ। আর সব মা

জানেন। বাগানে আম খেতে এসেছি, কত গাছ কত ডাল কত পাতা, এসব বসে বসে হিসাব করার দরকার কি আমার?'

শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনে বহু মাড়োয়ারী তাঁর কাছে যেত। তারা অনেক সময় উদ্দেশ্য নিয়ে গিয়ে বসত। ঠাকুর তা জানতেন। তবু তিনি তাদেরও উপদেশ দিতেন। একবার উপদেশ প্রার্থী কয়েকজন মাড়োয়ারীকে বললেন, 'দেখ, আমি আর আমরা এ দুটি অজ্ঞান। হে ভগবান, তুমি কর্তা আর এসব তোমার—ওর নাম জ্ঞান। কাম ক্রোধ এসব যাবার নয় তাই এর মোড় ঈশ্বরের দিকে ঘুরিয়ে দাও। লোভ করতেই যদি হয় তো ভগবানকে লাভ করার লোভ করো। তোমরা তো ব্যবসায়ী, ক্রমে ক্রমে উন্নতি করতে হয় তা জান। ঠিক সেই ভাবেই ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। পার তো মাসে মাসে কিছুদিন নির্জনে একলা থেকে তাঁকে ডাক। তবে একটা কথা জানবে সময় না হলে কিছু হয় না। কারো কারো ভোগ কর্ম অনেক বাকী থাকে। তার জন্য দেরীতে হয়। ফোঁড়া কাঁচা অবস্থায় ফাটলে উল্টো বিপত্তি দেখা দেয়। পেকে মুখ হলে তবে ডাক্তার কাটে।' রহস্য করে বললেন, 'একটি ছেলে বলেছিল, মা এখন আমি ঘুমোই বাহ্য পেলে তুমি আমায় ডেকে দিও। মা উত্তর দিলে, বাবা বাহ্যই তোমায় ডেকে তুলবে, আমায় তুলতে হবে না।' এই রহস্যটুকু শুনে সবাই হেসে উঠল রসিকতায়।

'সব সময় তাঁর নাম করতে হয়; কাজের সময় মনটা তাঁর কাছে ফেলে রাখতে হয়।' শ্রীরামকৃষ্ণ জটিল তত্ত্ব বুঝিয়ে দিচ্ছেন সহজতম প্রকাশে। 'যেমন ধরো আমার পিঠে ফোঁড়া হয়েছে, সব কাজই করছি কিন্তু মন রয়েছে ওই ফোঁড়ার দিকে।'

বেলঘরের গোবিন্দ মুখুজ্যের বাড়িতে একদিন গিয়েছিলেন ভক্তসহ। সেখানে কীর্তন দেখা ও ভক্তকে সুখী করা উদ্দেশ্য। কীর্তন হয়ে যাবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ বসলেন হৃষ্টমনে। বহু মানুষ তাঁর পায়ে প্রণত হচ্ছে।

মাঝে মাঝে তিনি তাঁদের বলছেন, 'ঈশ্বরকে প্রণাম করো।' আবার বলছেন, 'তিনিই সব হয়েছেন। তবে এক এক স্থানে তাঁর প্রকাশ বেশি। যেমন সাধুর মধ্যে। বলতে পার দুষ্ট লোকও আছে। বাঘ সিংহও। তা বাঘ নারায়ণকে আলিঙ্গন করার দরকার নেই—দূর থেকে প্রণাম করে চলে যেতে হয়। যেমন ধরো জল। একই জলের কত রকমফের। একটা খাওয়ার, একটা পুজো করার—কোনটায় বা শুধু আচান শোচান চলে।'

একজন প্রতিবেশী প্রশ্ন করলেন, 'বেদান্তমত কিরূপ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'বেদান্তবাদীদের মত হল ব্রহ্মই সত্য—তারা বলে সোহহং, আমিও মিথ্যা। কেবল সেই পরব্রহ্মই সব।' একটু থেমে তিনি বললেন, 'কিন্তু আমি তো যায় না—তাই আমি তাঁর দাস, তাঁর সন্তান এই অভিমানই ভাল। কলিযুগে ভক্তিযোগই সর্বোত্তম। ভক্তি দিয়ে তাঁকে লাভ করা যায়। দেহবুদ্ধি থাকলেই বিষয়বুদ্ধি থাকবে। বিষয়বুদ্ধি দূর করা খুব শক্ত। রূপ রস স্পর্শ গন্ধ শব্দ এ সবই বিষয়ের অন্তর্গত। বিষয়বুদ্ধি থাকতে সোহহং হয় না। ত্যাগীদের বিষয়বুদ্ধি কম, সংসারীরা সবসময়ই বিষয় নিয়ে ভাবে তাই তাঁদের পক্ষে দাস ভাবই উপযুক্ত।'

প্রতিবেশী বললেন, 'আমরা পাপী, আমাদের কি হবে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ অভয় দিয়ে বললে, 'তাঁর নামগুণগান করলে দেহর সব পাপ পালিয়ে যায়। শরীর ধরো গাছ, সেই গাছে পাখি—তাঁর নাম করা মানে হাততালি দেওয়া। হাততালি দিলে যেমন গাছের পাখি পালায় তেমন নাম গান শুনলে পাপ পাখিরাও শরীর ছাড়ে। অন্য ভাবে দেখ, মেঠো পুকুরের জল সূর্যের তাপে শুকোয় নিজে থেকে, তেমনি তাঁর নামের তাপে পাপ পুকুরের জল নিজে নিজেই শুকিয়ে যায়।' অপূর্ব দুটি উপমা দিয়ে মনের সংশয় দূর করলেন ঠাকুর। তারপর বললেন, 'দুটো উপায় মুক্তির—অভ্যাস আর অনুরাগ—মানে

তাঁকে দেখবার জন্য আগ্রহ।' সহজতর কথার মধ্য দিয়ে সমাধান

অমাবস্যার দিন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে। তাঁর ভেতর জগন্মাতার জাগরণ হচ্ছে। তিনি আপন মনে বলছেন, 'ভগবানই সার আর সব অসার। মা তারা মহামায়া দিয়ে জগৎকে মুগ্ধ করে রেখেছে। মানুষের মধ্যে বদ্ধ জীবের সংখ্যাই বেশি। এত দুঃখ কষ্ট—তবু সবার আসক্তি কামিনী-কাঞ্চনে। উট যেমন কাঁটা ঘাস খায়—দরদর করে মুখ দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে তবু সেই একই খাদ্য। যখন প্রসব ব্যথা ওঠে, মেয়েরা বলে ওগো আর স্বামীর কাছে যাব না; হয়ে গেলেই ভুলে যায়। কেউ ঈশ্বরকে খোঁজে না। আনারস গাছের ফল ছেড়ে মানুষ তার পাতা খায়।'

একজন ভক্ত প্রশ্ন করেন, 'আচ্ছা তিনি কেন আমাদের সংসারে রেখে দেন!'

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'সংসার হল কর্মক্ষেত্র, কাজ করতে করতে তবে মানুষের জ্ঞান হয়। গুরু বলে দেন, এই কাজ করো আর একাজ করো না। তিনি আবার নিষ্কাম কর্মের উপদেশ দেন। কাজের মধ্যে দিয়ে মনের ময়লা কেটে যায়, ভাল ডাক্তারের ওষুধ খেলে যেমন রোগ হোক না কেন সেরে যায়। তিনি কেন সংসার থেকে ছাড়েন না? রোগ সারবে তবে ছাড়বেন। যখন কামিনী-কাঞ্চন ভোগের ইচ্ছা চলে যাবে তখন ছেড়ে দেবেন। হাসপাতালে নাম লেখালে আর রক্ষে নেই। রোগের কসুর থাকলে ডাক্তার সাহেব ছুটি দেবেন না। বেশি বিচার করা ভাল না—মার পাদপদ্মে ভক্তি থাকাটাই আসল। বেশি বিচার করলে সব গুলিয়ে যাবে। এ দেশে পুকুরের জল ওপর ওপর খাও, বেশ পরিষ্কার, বেশি নিচে হাত দিয়ে নাড়লে জল ঘুলিয়ে যায়।'

ভক্ত প্রশ্ন করলেন, 'ভগবানকে পাব কি করে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ঐ ভক্তি দিয়ে। তবে তাঁর কাছে জোর খাটাতে হয়।'

'ঈশ্বরকে কি দেখা যায়?' ভক্তের মনে সংশয়, সন্দেহ।

শ্রীরামকৃষ্ণ নিঃসংশয়। তিনি বলে উঠলেন, 'তাঁকে নিশ্চয়ই দেখা যায়। নিরাকার সাকার দুরূপেই। সাকার চিন্ময়রূপ দর্শন হয়। আবার মানুষও সাকার—তার মধ্যেও তুমি তাঁকে দেখতে পাবে। অবতারকে দেখাও যা ঈশ্বর দেখাও তা। ভগবানই যুগে যুগে মানুষ রূপে জন্মলাভ করেন।'

ঠাকুর মহানন্দে রয়েছেন সেদিন। কালীবাড়িতে নরেন্দ্রনাথ এসেছেন। সঙ্গে বন্ধুবান্ধব। এ ছাড়া রাখাল রামলাল হাজরা আছেন। প্রসাদ খাওয়ার পর নরেন্দ্রদের বিশ্রামের জন্য বিছানা হয়েছে ঘরের মেঝেতে। ঠাকুর বিছানায় নরেন্দ্রর পাশে বসেছেন। মুখে হাসি বিস্তৃত। তিনি কথা বলছেন সকলের সঙ্গে। কথার মধ্য দিয়ে নিজের চরিত্রর ছবি তুলে ধরছেন। তিনি বলছেন, 'আমার এই অবস্থার পর শুধু ভগবানের কথা শুনবার জন্য ব্যাকুলতা হত। কোথাও ভাগবৎ, কোথায় অধ্যাত্ম, কোথায় মহাভারত সব খুঁজে ফিরতাম। এঁড়েদয় থাকতেন কৃষ্ণকিশোর। তাঁর কি বিশ্বাস! ওঁর কাছে অধ্যাত্ম শুনতে যেতাম। এঁড়েদর ঘাটে এক সাধু এসেছিল। আমরা তাঁকে দেখতে যাব স্থির করলাম। হলধারীকে যাবার জন্য বললাম। সে বলল, একটা মাটির খাঁচা দেখে কি হবে? কৃষ্ণকিশোরকে গিয়ে এ কথা বলতে তিনি খুব রেগে গেলেন। বললেন, হলধারী এমন কথা বলেছে? যে ঈশ্বরের চিন্তা করে, রামের নাম করে আর সেজন্য সব ত্যাগ করেছে তার শরীরটা মাটির খাঁচা! সে জানে না যে ভক্তের দেহ চিন্ময়! এত রাগ হয়েছিল যে কালীবাড়িতে ফুল তুলতে এলে হলধারীর সঙ্গে দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। কথা বলতেন না।

'আমাকে বলেছিলেন, 'পৈতেটা ফেললে কেন? তাকে কি উত্তর দেব? শুধু বললাম, তোমার একবার উন্মাদ দশা হোক তখন বুঝবে। তাই হল। তিনি নিজেই উন্মাদ হলেন। তখন মুখে শুধু ওঁ ওঁ শব্দ, একটা ঘরে চুপ করে বসে থাকতেন। সবাই মাথা গরম হয়েছে মনে করে কবিরাজ ডাকল। নাটাগড়ের রাম কবিরাজ। তাঁকে দেখে কৃষ্ণকিশোর বললেন, আমার রোগটি সারিয়ে দিন কিন্তু আমার ওঁ কথাটি সারাবেন না।' ঠাকুরের রস পরিবেশনে সবাই হেসে উঠলেন।

'একদিন গিয়ে দেখি বসে ভাবছেন। বললুম, কি হয়েছে? উত্তর দিলে ট্যাক্সওয়ালা এসেছিল তাই ভাবছি। বলেছে টাকা না দিলে ঘটি বাটি বেচে নেবে। আমি শুনে বললাম, ভেবে আর কি হবে? না হয় ঘটি বাটিই নিয়ে যাবে। তোমাকে তো নিয়ে যেতে পারবে না। তুমি তো 'খ' গো। কৃষ্ণকিশোর বলতেন, তিনি আকাশবৎ। অধ্যাত্ম পড়তেন কিনা। তাই হেসে বললাম, তুমি ত 'খ' ট্যাক্স তো আর তোমাকে টানতে পারবে না!' শ্রীরামকৃষ্ণর কথা শেষ হতেই নরেন্দ্রনাথরা আবার হেসে উঠলেন মজা পেয়ে। এমনি মজা দিয়ে তিনি অনন্তর ভক্তদের কাছে টানতেন। রসের মধ্যে সিক্ত করে তাঁদের সাধনপথ নরম করতেন।

'যদু মল্লিকের বাগানে যতীন্দ্র এসেছিল।' ঠাকুর পুনরায় তাঁর পূর্ব কথা শোনাচ্ছেন ভক্তদের। 'আমিও সেখানে ছিলাম তাকে বললাম, ঈশ্বর চিন্তাই আমাদের কর্তব্য কিনা? উত্তরে যতীন্দ্র বললে, আমরা সংসারী লোক, আমাদের কি আর মুক্তি আছে। রাজা যুধিষ্ঠিরকেও যখন নরক দর্শন করতে হয়েছিল। ভারী রাগ হল ওই কথায়। বললাম, তুমি কি রকম লোক হে! যুধিষ্ঠিরের শুধু নরক দর্শনটুকুই মনে রেখেছ! আরো নানা কথা বলতে যাচ্ছিলাম, হৃদে আমার মুখ চেপে ধরলে।'

'অনেকদিন পর কাপ্তানের সঙ্গে সৌরীন্দ্র ঠাকুরের বাড়ি গিয়ে-

ছিলাম। তাঁকে দেখে বললাম, রাজা টাজা বলতে পারব না। তাহলে সেটা মিথ্যে কথা হবে। কিছুক্ষণ আমার সঙ্গে কথা বললে। সাহেব-সুবো আনাগোনা করতে লাগল। রাজা গুণী মানুষ নানা কর্ম নিয়ে আছে। যতীন্দ্রকে খবর পাঠান হল। সে বলে দিল তার গলায় বেদনা হয়েছে। আমার সেই উন্মাদ অবস্থায় একদিন বরানগরের ঘাটে গিয়ে দেখলাম জয় মুখুজ্যে অন্যমনস্ক হয়ে জপ করছে। সঙ্গে সঙ্গে দুই চাপড় দিলাম। রাসমণিকেও ছাড়িনি। একদিন ঠাকুরবাড়িতে এসেছেন। কালীঘরে এলেন। গান গাইতে বললেন। গান গাচ্ছি, দেখি অন্যমনা হয়ে ফুল বাচছে। সঙ্গে সঙ্গে দুই চাপড়। তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে হাতজোড় করলেন। হলধারীকে একদিন ডেকে বললাম, দাদা একি স্বভাব হল। তখন মাকে ডাকতে ডাকতে স্বভাব গেল।

'ওই অবস্থায় ঈশ্বরের কথা ছাড়া আর কিছুই ভাল লাগে না। কোথাও বিষয়ের কথা হচ্ছে শুনতে পেলে একা বসে কাঁদতাম।' কথা শেষ করে তিনি সবাইকে একটু বিশ্রাম করতে বলে নিজেও বিশ্রামের জন্য উঠে গেলেন।

বিকেলে আবার সভা বসল। সূর্য শ্রীরামকৃষ্ণ, তাকে ঘিরে তারকারূপী নবীন ভক্তরা। নরেন্দ্রনাথ খোল বাজাচ্ছেন ঠাকুর গাইছেন। শ্রীরামকৃষ্ণর ভেতরের প্রেমরস আজ উৎস পেয়ে বেরিয়ে আসছে শতধারায়। তিনি প্রেমে পাগল হয়ে লম্বা বারান্দায় পায়চারি করতে লাগলেন। মাঝে মাঝে মার সঙ্গে কথা বলছেন। হঠাৎ পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তুই আমার কি করবি ?'

আবার ঠাণ্ডা হয়ে গল্প করছেন। সেই বালকের হাসি। সেই রসিকতা। অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা। কথায় কথায় নরেন্দ্রনাথ বললেন মাস্টারকে, 'আজকালকার ছোকরাদের কেমন দেখছেন ?'

মাস্টারমশায় উত্তর দিলেন, 'খারাপ কিছু না—তবে ধর্মোপদেশে কিছু হয় না।'

ঘরের ভেতর থেকে হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ওদের কাছে এসে বললেন, 'তোমাদের কিসের কথা হচ্ছে?'

নরেন্দ্রনাথ মাস্টার মহাশয়কে দেখিয়ে বললেন, 'এর সঙ্গে স্কুলের কথা বলছিলাম।'

দুজনের কথার কিছুটা শুনে ঠাকুর গম্ভীর ভাবে বললেন, 'এসব কথাবার্তা ভাল নয়—ঈশ্বরের কথা ছাড়া অন্য সব কথাই বাজে। তুমি তো বয়সে বড়, তোমার বুদ্ধি হয়েছে—এসব কথা তুলতে দিলে কেন?'

শ্রীরামকৃষ্ণর বকুনি খেয়ে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। চুপ করে গেলেন নরেন্দ্রনাথও। একটু পরেই আবার সকলে মিলে গল্প গান শুরু হল। কিছু পরে গান শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বারান্দায় বেড়াচ্ছেন। মহেন্দ্রনাথ সেইখানে বসেছিলেন। হাজরাও ছিল। দুজনে কথা হচ্ছিল। এমন সময় একটি ভক্তকে ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি স্বপ্ন টপ্ন দেখ?'

ভক্ত অবাক হয়ে বলল, 'হ্যাঁ। সম্প্রতি একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। এই জগৎ জলে জল। চারপাশে অনন্ত সীমাহীন জলরাশি! কয়েকখানা নৌকো ভাসছিল। হঠাৎ একটা জলোচ্ছ্বাসে সব ডুবে গেল। কটি লোকের সঙ্গে আমি জাহাজে উঠেছি। এই সময় সেই অকূল সমুদ্রের ওপর দিয়ে একটি ব্রাহ্মণ চলে যাচ্ছেন। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কেমন করে যাচ্ছেন? তিনি যেতে যেতে হেসে উত্তর দিলেন, এখানে কোনো কষ্ট নেই—জলের নিচে বরাবর সাঁকো আছে। পুনরায় প্রশ্ন করলাম, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি উত্তর দিলেন, ভবানীপুর যাচ্ছি। আমি বললাম, একটু দাঁড়ান, আমিও আপনার সঙ্গে যাব।'

শ্রীরামকৃষ্ণ শুনে বললেন, 'আমার এ কথা শুনে রোমাঞ্চ হচ্ছে!'

ভক্ত আবার বলল, 'ব্রাহ্মণটি তখন আমাকে বললেন, আমার এখন খুব তাড়া আছে, তোমার নামতে ঢের দেরী আছে, আমি আসি। এই

রাস্তা দেখে নাও, পরে তুমি এস।'

ঠাকুর শুনে বললেন, 'আমার রোমাঞ্চ হচ্ছে সব শুনে, তুমি তাড়াতাড়ি মন্ত্র নাও।'

অন্য একদিন নরেন্দ্রনাথ সাধনের প্রসঙ্গ তুললেন। সঙ্গে অন্য ভক্তরাও ছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমণ্ডলীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভক্তিই সার। ভগবানকে ভালবাসলে বিবেক বৈরাগ্য আপনা থেকে আসে।'

'আচ্ছা স্ত্রীলোক নিয়ে সাধনের কথা তন্ত্রে আছে?' নরেন্দ্রনাথের প্রশ্ন।

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'ও পথ ভাল নয়। খুব শক্ত আর প্রায়ই পতন ঘটে। বীরভাবে দাসীভাবে মাতৃভাবে এই তিন ভাবে সাধন হয়। আমার মাতৃভাবে। দাসীভাবও বেশ। বীরভাব সাধনা খুব শক্ত। সন্তানভাব খুব শুদ্ধ।' নানকপন্থী কিছু সাধু এসে ঠাকুরকে নমস্কার করে বলে উঠলেন, 'নমো নারায়ণায়।' তাঁদের বসতে বললেন তিনি : তারপর ধর্মব্যাখ্যা করে চললেন। 'ঈশ্বরের দ্বারা সব সম্ভব। তাঁর স্বরূপ কেউ মুখে বলতে পারে না। একটা গল্প শোন। দুজন যোগী ছিল, যারা ঈশ্বরের সাধনা করে। তাদের সামনে দিয়ে নারদ যাচ্ছিলেন। যোগীদের একজন পরিচয় পেয়ে বললেন, 'তুমি তো নারায়ণের কাছ থেকে আসছ, তা তিনি কি করছেন? নারদ উত্তর দিলেন, তিনি ছুঁচের ফুটো দিয়ে হাতি উট ঢোকাচ্ছেন আবার বার করছেন। শুনে একজন বললে, এতে আর অবাক হবার কি আছে, তাঁর দ্বারা সবই সম্ভব। তবু অপরজন নিঃসংশয় হতে পারল না, সে বলল, তা কখনো হয়—তুমি সেখানে যাও নি নিশ্চয়ই।'

বিবেক কাকে বলে শ্রীরামকৃষ্ণ তা বোঝাতে লাগলেন নরেন্দ্র ও তার বন্ধুদের। 'তিনিই বস্তু আর সব অনিত্য, এর নাম বিবেক। শোন তবে একটা কাহিনী। এক গ্রামে পদ্মলোচন বলে একটি ছেলে

ছিল। লোকে তাকে পেদো বলে ডাকত। সেই গ্রামে এক পোড়ো মন্দির ছিল। ভিতরে কোনো বিগ্রহ নেই, গায়ে অশ্বত্থ গাছ গজিয়েছে, চামচিকের বাসা। মেজেতে ধুলো, চামচিকের বিষ্ঠা, কেউ সেই মন্দিরে যায় না। একদিন সন্ধ্যার একটু পরে সবাই মন্দিরের দিক থেকে শঙ্খধ্বনি শুনতে পেল। সবাই ভাবল, কেউ হয়তো ঠাকুর স্থাপনা করে সন্ধ্যের পর আরতি দিচ্ছে। সবাই দৌড়ে সেখানে গিয়ে হাজির। তাদের মধ্যে একজন দরজা খুলে দেখল মন্দির যেমন তেমনিই—একপাশে পদ্মলোচন দাঁড়িয়ে ভোঁ ভোঁ করে শাঁখ বাজাচ্ছে। সে তখন চেঁচিয়ে বলল, পেদো শাঁখে ফুঁ দিয়ে কি হবে—এগার জন চামচিকে যে হাজির রয়েছে, তোর সব গোলমাল হয়ে গেল রে। পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় আর মন এই হল এগারজন। এদের না তাড়িয়ে কিছুই হবে না। আগে চিত্ত শুদ্ধি চাই। তবে ভগবান এসে পবিত্র মনে বসবেন। আগে মাধবের প্রতিষ্ঠা কর, তারপর যত ইচ্ছে লেকচার দাও। আগে ডুব দিয়ে রত্ন তোল, তারপর অন্য কাজ। বিবেক বৈরাগ্য ছাড়া ঈশ্বর লাভ হয় না।' শ্রীরামকৃষ্ণ বার বার এই কথা বললেন।

কাছেই মণি ছিলেন। তিনি বিবাহিত। তিনি এই শুনে ভাবছেন, কি হবে তার? বিবেক বৈরাগ্য মানে তো কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ? সন্দেহাকুল হয়ে তিনি ঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন।' স্ত্রী যদি বলে আমায় দেখছ না আমি আত্মহত্যা করব তাহলে কি হবে?'

গম্ভীরভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'যে স্ত্রী ঈশ্বরের পথে বাধাস্বরূপ সে স্ত্রীকে ত্যাগ করবে। তা সে আত্মহত্যাই করুক আর যাই করুক। ভগবানের পথে বাধাদানকারিণী স্ত্রী অবিদ্যা স্ত্রী।'

ঠাকুরের এই কথা শুনে মণি খুব চিন্তাকুল হয়ে পড়লেন। তিনি চুপ করে রইলেন। ঠাকুর অন্যের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওর ভাবান্তর লক্ষ্য করেছেন। তিনি সর্বদর্শী। সব দেখতে পান

সব বোঝেন। তাই ধীরে ধীরে মণির কাছে এসে হঠাৎ একান্ত হয়ে তাঁকে বললেন, 'কিন্তু যার ভগবানে আন্তরিক ভক্তি আছে—সবাই তার বশে আসে, দুষ্ট লোক স্ত্রী এমন কি রাজাও। নিজের ভক্তি থাকলে তার জোরে স্ত্রীও ক্রমশ ঈশ্বরের দিকে যেতে পারে। নিজে ভাল হলে ভগবান কৃপায় সেও ভাল হয়ে যায়।'

মণি কিছুটা ধাতস্ত হলেন। তবু বললেন ঠাকুরকে, 'সংসারে বড় ভয়।'

ঠাকুব একান্তে বললেন, 'দেখ ঈশ্ববেতে শ্রদ্ধা ভক্তি যদি না হয় তা হলে কোনো গতি নেই। ঈশ্বরলাভ করে সংসারে কেউ যদি থাকে তার আর ভয় নেই।' মণির মনের সংশয় মেঘ কেটে গেল শ্রীরামকৃষ্ণর অমৃতবাণী প্রলেপে।

ভক্ত সঙ্গে বসে একদিন সহাস্য বদন হয়ে গল্প করছেন ঠাকুর। এমন সময় মাস্টার মহেন্দ্রনাথ এসে পৌঁছলেন। তাঁকে দেখেই তিনি বলে উঠলেন, 'এই যে তুমি এসেছ। ভক্তদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, লজ্জা ঘৃণা ভয়, তিন থাকতে নয়। আজ কত আনন্দ হবে। কিন্তু যে শালারা হরিনামে মত্ত হয়ে নাচ গান করতে পাববে না, তাদের কোনোদিন হবে না। ঈশ্বরের কথায় আবার লজ্জা ভয় কি।

দক্ষিণেশ্বরবাসী এক গৃহস্থ ঘরে বসে বেদান্ত চর্চা করেন। তিনি এসেছেন। ঠাকুরের সামনে শব্দব্রহ্ম নিয়ে কথা বলছেন। তিনি বললেন, 'এই অনাহত শব্দ সবসময় ভেতরে বাইরে হচ্ছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ শুনে বললেন, 'শুধু শব্দে কি হবে? তার একটা প্রতিপাদ্য আছে। তোমার নামে কি কেবল আমার আনন্দ হয়? না দেখলে ষোল আনা আনন্দ হয় না।'

গৃহস্থটি তবু বললেন, 'ঐ শব্দই ব্রহ্ম। ঐ অনাহত শব্দ।'

শ্রীরামকৃষ্ণ এবার কেদার প্রভৃতির দিকে তাকিয়ে বললেন,

বুঝেছ, এর অবস্থা ঋষিদের মতো। ঋষিরা রামচন্দ্রকে বলেছিলেন, হে রাম আমরা জানি তুমি দশরথের ছেলে। ভরদ্বাজ প্রভৃতি ঋষিরা তোমাকে অবতার জ্ঞানে পুজো করেন। আমরা চাই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। রাম এ কথা শুনে হেসে চলে গেলেন।'

কেদার বললেন, 'ঋষিরা বোকা ছিলেন। তাই তাঁরা রামকে অবতার বলে বুঝতে পারেন নি।'

গম্ভীরভাবে রামকৃষ্ণ বললেন, 'তুমি এমন কথা বলো না। যার যেমন রুচি। ঋষিরা জ্ঞানী ছিলেন তাই তাঁরা অখণ্ড সচ্চিদানন্দ চেয়েছিলেন। আবার ভক্তরা চান অবতারকে—ভক্তিকে চেখে দেখবার জন্য। তাঁকে দেখলে মনের অন্ধকার দূর হয়ে যায়। অবতার যখন আসেন সাধারণ লোক তা জানতে পারে না। অবতার আবির্ভূত হন গোপনে কজন ভক্ত মাত্র এই খবর পায়। রাম পূর্ণ ব্রহ্ম, অবতার বিশেষ, বারোজন ঋষি শুধু একথা জানত।' ঠাকুর বলে চলেছেন অমৃতময় ধর্মবাণী। 'সবাই কি অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে ধরতে পারে? সেই পারে যে নিত্যে উঠে বিলাসের জন্য লীলায় থাকে। ভরদ্বাজ ঋষিগণ রামের স্তব করেছিলেন, হে রাম তুমিই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ। তুমি মায়া আশ্রয় করেছ বলেই তোমাকে মানুষের মতো দেখাচ্ছে।'

যেমন মানুষ তাঁর কাছে আসে তার সঙ্গে তেমনি আলাপ। একজন বৈষ্ণব গোস্বামী তাঁর কাছে এসেছেন। ঠাকুর তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'আচ্ছা তুমি কি বলো, উপায় কি?'

গোঁসাইজী উত্তর দিলেন, 'নামেতেই সব হবে। কলিতে নাম মাহাত্ম্য।'

'হ্যাঁ ঠিকই বলেছ, নামের খুব মাহাত্ম্য আছে।' শ্রীরামকৃষ্ণ সায় দিয়ে বললেন, 'তবু অনুরাগ ছাড়া কি কিছু হয়? ঈশ্বরের জন্য আকুল হওয়া চাই—কেবল নাম করছি আর এদিকে মন কামিনী-কাঞ্চনে রয়েছে তাতে কি হবে? বিছে বা ডাকুর কামড় অমনি মন্ত্রে সারে না—

ঘুটের ভাবরা দিতে হয়।'

'তাই যদি হয় তাহলে অজামিল?' গোস্বামী উদাহরণ তুললেন, 'মহাপাতকী অজামিল এমন পাপ নেই যা সে করে নি কিন্তু মরবার সময় নারায়ণ বলে ছেলেকে ডাকতেই উদ্ধার পেয়ে গেল।'

'হয়তো আগের জন্মে তার অনেক কাজ করা ছিল।' শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়ে দিলেন, পরে সে তপস্যাও করেছিল।' এ ভাবেও ভেবে দেখো তখন তার অন্তিমকাল। নামেতে এবার শুদ্ধ হল কিন্তু তার পরেই আবার লিপ্ত হল পাপে। হাতিকে স্নান করালে কি হবে—আবার সে ধুলো কাদা মাখবে। গঙ্গা স্নানে পাপ সব যায়, তাতে কি? লোকে বলে পাপগুলো গাছের ওপর থাকে। স্নান করে মানুষ যখন ফেরে তখন ওই পুরনো পাপগুলিই গাছ থেকে ঝাঁপ দিয়ে মানুষের ঘাড়ে চাপে।' সবাই পাপের ঘাড়ে চাপা শুনে প্রাণ খুলে হেসে উঠল। কি অসীম বোঝানোর ক্ষমতা! কি প্রগাঢ় অনুভব। হাসি থামলে ঠাকুর বলতে লাগলেন, 'তাই নাম করার সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা করতে হবে যাতে অনুরাগ জন্মে।'

গোস্বামী এখন শ্রোতা। মহাজ্ঞানী শ্রীরামকৃষ্ণর সামনে শ্রোতা হওয়াই পরম সৌভাগ্য। গোস্বামীর প্রতি তিনি নির্দেশ করে বলে চলেছেন, 'আন্তরিকতা থাকলে সব ধর্মের ভেতর দিয়েই ভগবান লাভ করা যায়। লোকে ঝগড়া করে; বলে, আমাদের মতে না এলে হবে না। এ সব বুদ্ধির নাম মতুয়ার বুদ্ধি—অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের মিথ্যে এ বুদ্ধি খারাপ। ভগবানের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌঁছানো যায়। আবার কেউ কেউ বলে, ঈশ্বর সাকার, তিনি নিরাকার নন। এই নিয়ে আবার ঝগড়া বাঁধে। যদি ঈশ্বরের দেখা পাওয়া যায় তা হলেই ঠিক বলা যায়। যে দেখেছে সেই জানে ঈশ্বর সাকার না নিরাকার। সেই গল্পটা শোনো।—কতকগুলো কানা একটা হাতির কাছে গিয়ে পড়ল। একজন লোক তো বলে দিল এই

জানোয়ারের নাম হাতি। তখন কানাদের প্রশ্ন করা হল, হাতিটা কি রকম? তারা এবার হাতির পা স্পর্শ করতে লাগল। একজন বললে, হাতি একটা থামের মতো। যে একথা বলল, সে হাতির পা-টাই ছুঁয়েছিল, আর একজন বলল, হাতিটা একটা কুলোর মতো। যে বলল, সে শুধু একটা কান ছুঁয়েছিল। বাকীরাও এমনি যে যা ছুঁয়েছে সেই মতো বলতে লাগল। তেমনি ভগবানকে যে যেমন দেখেছে সে তেমনই বলতে পারে আর কিছু নয়।' গোঁসাইজী বিদায় নিলেন অন্তরে এক নতুন আলো জ্বেলে। তিনি যেন একটি জীবন্ত বেদ দেখে গেলেন।

রাখাল ঠাকুরের সঙ্গেই থাকছেন। মাঝে মাঝে তাঁর বাবা তাঁকে দেখতে আসেন। রাখালের বাবা সেদিন এসেছেন। ঠাকুর বার বার তাঁকে দেখছেন। ঠাকুরেরও ইচ্ছে রাখাল বরাবর এখানে থাকুক। শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালের বাবাকে বলছেন, 'আহা আজকাল রাখালের স্বভাবটি যা হয়েছে, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখ—দেখতে পাবে, মাঝে মাঝে ঠোঁট নড়ছে—অন্তরে ঈশ্বরের নাম জপ করে কিনা, তাই ঠোঁট নড়ে। এ সব ছোকরারা নিত্য সিদ্ধের থাক। ঈশ্বরের জ্ঞান নিয়ে জন্মেছে, একটু বড় হলে বুঝতে পারে সংসার গায়ে লাগলে আর রক্ষে নেই। বেদেতে হোমা পাখির কথা আছে তারা আকাশে থাকে মাটিতে নামে না। আকাশেই ডিম পাড়ে। ডিম নিচের দিকে পড়তে থাকে। কিন্তু পাখি এত উঁচুতে থাকে যে ডিম মাটিতে পড়বার আগেই ফুটে বাচ্চা হয়। বাচ্চাটাও পড়তে থাকে। কিন্তু তখনো এত উঁচু যে মাটিতে পড়ে না। সে জানে মাটিতে পড়া মানেই মৃত্যু—তাই ডানা ঝাপটিয়ে উপরে উঠে যায় মার কাছে। তার লক্ষ্য মার কাছে পৌঁছনো। এইসব ছেলেরাও ঠিক তাই। ছোট থেকেই সংসারে ভয়—এক চিন্তা কি করে মার কাছে যাব। ঈশ্বরলাভ করব।

'যদি বল বিষয়ীর মধ্যে থেকে বিষয়ীর ঔরসে জন্মে এমন ভক্তি, এমন জ্ঞান হয় কি করে? তার উত্তর আছে। বিষ্ঠাকুড়ে যদি ছোলা পড়ে যায় তাহলে তাতে ছোলা গাছই হয়। বিষ্ঠাকুড়ে পড়েছে বলে কি অন্য গাছ হবে? আহা! রাখালের স্বভাব আজকাল কেমন হয়েছে। তা হবে না কেন? ওল যদি ভাল হয় তার মুখীটিও ভাল হয়। যেমন বাপ তার তেমন ছেলে।' সবাই হাসিতে যোগ দিল এই রসিকতায়।

মণি মল্লিক এসেছেন কাশী ঘুরে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে দেখেই প্রশ্ন করলেন, 'কি গো কাশীতে গেলে, সাধু-টাধু কিছু দেখলে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ত্রৈলঙ্গ স্বামী ভাস্করানন্দ এদের সব দেখতে গিয়েছিলাম।'

'কি রকম সব দেখলে শোনাও।'

'ত্রৈলঙ্গ স্বামী সেই ঠাকুরবাড়িতেই রয়েছেন। লোকে বলে, আগে নাকি তিনি নানা ধরনের ক্ষমতা প্রকাশ করতেন। এখন নাকি সেসব কমে গিয়েছে।'

'ও সব বিষয়ী লোকেব নিন্দা।' ঠাকুর বলে উঠলেন।

মণিলাল আরও বললেন, 'ভাস্করানন্দ সকলের সঙ্গে মেশেন, ত্রৈলঙ্গ স্বামীর মতো নন, একেবারে কথা বন্ধ।'

'তা ভাস্করানন্দের সঙ্গে তুমি কোনো কথা বললে?' ঠাকুর জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ—অনেক কথা হয়েছে।' মণিলাল উত্তর দিলেন, 'তাঁর সঙ্গে পাপপুণ্যের কথা হল। তিনি বলেছেন, পাপ পথ ত্যাগ করবে পাপ-চিন্তাও, ভগবান এইসব চান। এমন কাজ করবে যা করলে পুণ্য হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ শুনে বোঝাতে লাগলেন, 'হ্যাঁ ও একরম আছে ঐহিকদের জন্য। যাদের চেতনা হয়েছে, জেনেছে ঈশ্বর সৎ আর সব অসৎ তাদের ভাব আরেক রকম। তারা জানে ভগবানই একমাত্র কর্তা—বাকীরা অকর্তা। চেতনাপ্রাপ্তদের বেতালে পা পড়ে না। পাপ-

তাদের জন্য হিসেব কষতে হয় না। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা এত প্রগাঢ় যে, যেকাজ করে সেটাই সৎকর্ম করে বলে ধরে নেয়। তাদের ধারণায় তারা যন্ত্রমাত্র ঈশ্বর যন্ত্রী। তাঁর নির্দেশ মতোই সবকিছু হয়ে থাকে।

'যাদের জ্ঞান হয়েছে তারা পাপ-পুণ্যের বাইরে। তারা জানে ঈশ্বরই সব করছেন। একটা কাহিনী বলি তবে,—' ঠাকুর গল্পচ্ছলে ভক্তদের চৈতন্য জাগিয়ে তুলছেন। 'এক জায়গায় এক মঠ ছিল। মঠের সাধুরা প্রতিদিন ভিক্ষে করে। একদিন এক সাধু ভিক্ষে করতে বেরিয়ে দেখে এক জমিদার একজন লোককে খুব মারছে। সাধু খুব দয়ালু। তিনি তাড়াতাড়ি গিয়ে জমিদারকে মারতে নিষেধ করলেন। জমিদার সাংঘাতিক রেগেছিলেন। এবার রাগটা গিয়ে পড়ল ওই সাধুর ওপর। সাধুটিকেই ধরে আচ্ছাসে মারলেন। জ্ঞান হারিয়ে সাধু ওখানে পড়ে রইলেন। মঠে খবর পেয়ে অন্য সাধুরা এসে পড়ল। তারা ধরাধরি করে সাধুকে মঠে নিয়ে গেল। সবার মন খারাপ। একজন বলল, একটু দুধ দিয়ে দেখা যাক জ্ঞান ফেরে কিনা। মুখে দুধ দিতেই জ্ঞান ফিরল। চোখ মেলে সে সবাইকে দেখতে লাগল। অন্য এক সাধু বললেন, দেখি ও লোক চিনতে পারছে কি না? তিনি প্রশ্ন করলেন, মহারাজ তোমাকে কে দুধ খাওয়াচ্ছে? সাধু উত্তর দিলেন ভাই একটু আগে যিনি আমাকে মেরেছিলেন এখন তিনিই দুধ খাওয়াচ্ছেন। ঈশ্বরকে জানতে না পারলে এমন অবস্থা হয় না।'

মণিলালের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ ঠাকুর বললেন, 'রাখাল বলছিল ওদের দেশে বড় জলকষ্ট—তা তুমি সেখানে একটা পুকুর কাটিয়ে দাও না কেন; তাহলে কত লোকের উপকার হয়। তোমার তো অনেক টাকা—অত টাকা নিয়ে কি করবে? তা শুনেছি তেলিরা নাকি বড় হিসেবী।' ঠাকুর রসিকতায় নিজেই হেসে উঠলেন। সঙ্গে অন্য ভক্তরাও হেসে উঠলেন মজা পেয়ে।

মণিলাল একটু চুপ করে রইলেন। একটু পরে এ কথা ও কথায়

পর বললেন, 'তা আপনি পুকুর করে দেওয়ার কথা বলছিলেন বলুন না, আবার তেলি-ফেলি বলা কেন?'

মণিলালের কথায় ঠাকুর হাসতে লাগলেন। এমন সময় কলকাতা থেকে কজন পুরনো ব্রাহ্ম ভক্ত এসে পড়ল। ঠাকুর তাদের সঙ্গে আলাপে রত হলেন। তিনি ব্রাহ্ম ভক্তদের কটাক্ষ করে বললেন, 'তোমরা যে এত প্রেম প্রেম কর, প্রেম কি সামান্য জিনিস? চৈতন্য-দেবের প্রেম হয়েছিল। প্রেমের দুটো লক্ষণ—এক, জগৎ ভুল হয়ে যাবে। এত ভগবানে ভালবাসা যে বাইরের জ্ঞান লোপ পেয়ে যাবে। দুই, নিজের দেহ এত যা প্রিয় মানুষের কাছে, তার প্রতি মমতা থাকবে না।

'ভগবান দর্শন না হলে প্রেম হয় না। ঈশ্বরলাভেরও কতকগুলো লক্ষণ আছে। যার ভেতরে অনুরাগ ঐশ্বর্য ফুটে ওঠে তার ঈশ্বর লাভে দেরি হয় না। অনুরাগ ঐশ্বর্য হল বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ সত্য কথা ঈশ্বরের ভজন কীর্তন—এই সব। এ সব চিহ্ন থেকে বোধ হয় ঈশ্বর দর্শনের আর দেরি নেই। যেমন ধরো, বাবু কোনো খানসামার বাড়ি যাবেন এমন স্থির হলে খানসামার বাড়ির হাবভাব দেখলে টের পাওয়া যায়। প্রথমে বন-জঙ্গল সাফ, তারপর ঝুলঝাড়া ঝাটপাট। এরপর বাবু নিজেই সতরঞ্চ গুড় গাড়ি পাঁচটা জিনিস পাঠিয়ে দেন। তখন কারো বুঝতে বাকী থাকে না বাবু এসে পড়লেন বলে।'

একজন ভক্ত জানতে চাইলেন, 'আগে বিচার করে তবে কি ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করতে হয়?'

শ্রীরামকৃষ্ণ তার উত্তরে বললেন, 'ঈশ্বরের উপর যত ভালবাসা জমবে ততই ইন্দ্রিয়সুখ আলুনি লাগবে।'

'তাকে ভালবাসতে পারছি কই?' অন্য এক ভক্ত বললেন।

ঠাকুর বললেন, 'তাঁর নাম করতে পারলে সমস্ত পাপ কেটে যায়।

কাম ক্রোধ শারীরিক সুখ ইচ্ছে এসব পালায়। ব্যাকুল হয়ে তার প্রার্থনা করো, তাঁর নামে রুচি হলে তিনিই তোমার মনের কামনা পূর্ণ করবেন।' ঠাকুর গান ধরলেন কথা শেষ করে। গান থামিয়ে আবার বললেন, 'বিকারে যদি অরুচি হয় তাহলে বাঁচার রাস্তা থাকে না। নামে যদি আনন্দ হয় তাহলে বিকার কাটবেই কাটবে। তার কৃষ্ণলাভ হবেই। একটা গল্প শোনো। যেমন ভাব তেমন লাভ। তুজন বন্ধু রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। এক জায়গায় ভাগবত পাঠ হচ্ছে। একজন তাই দেখে বললে, চল একটু পাঠ শোনা যাক। অন্যজন উঁকি মেরে একটু দেখেই বেশ্যাবাড়ি চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে সেখানে তার ভাল লাগল না। সে নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলল, ছিঃ আমার বন্ধু হরিকথা শুনছে আর আমি এখানে পড়ে আছি। এদিকে ভাগবত পাঠ শোনা বন্ধুটির মনেও ধিক্কার এল। সে নিজেকে বলল, আমি কি বোকা—ব্যাড় ব্যাড় কি সব বকছে আমি শুনছি আর ওদিকে আমার বন্ধু কেমন ফুর্তি করছে। এরা তুজনে যখন মরে গেল, যে ভাগবত শুনছিল তাকে যমদূতে ধরল আর যে বেশ্যাবাড়ি ছিল তাকে বিষ্ণুদূত বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেল। ভগবান মন দেখেন, কে কি করছে বা কোথায় পড়ে আছে এসব দেখেন না। হনুমান মনের গুণে সমুদ্র পার হয়ে গেল। এই বিশ্বাস। যতক্ষণ অহঙ্কার ততক্ষণ অজ্ঞান। তাই অহঙ্কার থাকতে মুক্তি নেই, নীচু হলে তবে উঁচুতে ওঠা যায়। একটু কষ্ট করে সৎসঙ্গ করতে হয়। টাকা থাকলেই বড় মানুষ হয় না, বড় মানুষের চিহ্ন তাদের সব ঘরে আলো থাকে। এই দেহমন্দির অন্ধকার রাখতে নেই। জ্ঞানদীপ জ্বেলে দিতে হয়। সকলেরই জ্ঞান হতে পারে। জীবাত্মা আর পরমাত্মা। প্রার্থনা করলেই সেই পরমাত্মার সঙ্গে সবাই যুক্ত হতে পারে। গ্যাসের নল সব বাড়িতেই লাগানো আছে। কোম্পানীর কাছ থেকে গ্যাস পাওয়া যায়। শেয়ালদায় অফিস আছে—দরখাস্ত করো তোমার ঘরেও আলো জ্বলবে।'

অদ্ভুত উপমায় আর রসের পরিবেশনে সবাই হেসে উঠল। ঘন গভীর ধর্মকথা বলতে বলতে শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্ভুতভাবে একটি মজার প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন। শুকনো ধর্মকথার জমিতে তা যেন রস সিঞ্চন করে।

একটু থেমে তিনি আবার বলতে শুরু করলেন। 'দেখ বাঘ যেমন কপ কপ করে পশুদের খেয়ে নেয় তেমনি অনুরাগ-বাঘ কাম ক্রোধ এইসব পশুদের খেয়ে ফেলে। গোপীদের সেই ভাব হয়েছিল। কৃষ্ণে অনুরাগ। যারা কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে পড়ে থাকে তাদের দিয়ে কি কোনো মহৎ কাজ হয়—তারা বদ্ধজীব। যেমন কাকে ঠোকরানো ফল কোনো পুজোয় লাগে না। নিজেও খেতে তৃপ্তি হয় না। সংসারে আবদ্ধ প্রাণীরা গুটিপোকার মতোন। মনে করলে কেটে বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু নিজের তৈরি ঘর ভাঙতে মায়া হয়—শেষে ওখানেই মরে। দু-একজন মায়ার ভেলকিতে ভোলে না। তারা বেরিয়ে আসে। বাজীকরের ভেলকিতে তারা বশ হয় না। বাজীকর কি করছে সব দেখতে পায়। নিত্যসিদ্ধ যারা তাদের জন্মে জন্মে জ্ঞান হয়ে রয়েছে। ধরো যেমন ফোয়ারার মুখ বন্ধ হয়ে আছে। মিস্ত্রী এসে এটা ওটা খুলে মুখটা খুলে দিতেই ফুর ফুর করে জল বেরিয়ে এল।'

অন্য একদিন। ঠাকুর সমাধিস্থ। চারপাশে ভক্তরা। এমন সময় কয়েকজন বন্ধু নিয়ে অধর সেন এসেছেন। ক্রমে কথা শোনা গেল। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে লাগলেন, 'বিষয়ীলোকের জ্ঞান কখনো কখনো দেখা দেয়। দীপের আলোর মতো একেকবার। হঠাৎ সূর্যের কিরণের মতো। ফুটো দিয়ে রশ্মিটুকু আসছে। বিষয়ী লোকদের জেদ নেই। হয় হবে না হল তো না হল।

'আমি আর আমার বলতে অজ্ঞান। বিচার করতে গেলে দেখবে যাকে আমি আমি বলছ আত্মা ছাড়া আর কিছু নয়। বিচার করলে শেষ পর্যন্ত তোমার কিছুই থাকে না, এটা সোনা এটা পেতল—এর নাম

অজ্ঞান। সব সোনা—এই হল জ্ঞান। ঈশ্বরকে পেলে বিচার শেষ হয়। বাচ্চা ততক্ষণ কাঁদে যতক্ষণ না স্তন্যপান করছে। মা বুকে তুলে নিলেই কান্না বন্ধ হয়ে যায়।' কথা শেষ করে ঠাকুর অধর সেনের কুশল নিলেন। তারপর তাকে উপদেশ দিলেন। বললেন, 'দেখ এই যে তুমি ডেপুটি হয়েছ এও ঈশ্বরের অনুগ্রহ। তাঁকে ভুলবে না। সব সময় জানবে সবাইকে এক পথে যেতে হবে। এখানে দুদিনের জন্য। সংসার কর্মভূমি। কাজ করতেই এখানে আসা। কাজ তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হয়। স্যাঁকরারা সোনা গলাবার সময় হাপড় পাখা চোঙা সব দিয়ে হাওয়া করে যাতে বেশি আগুন পেয়ে তাড়াতাড়ি সোনা গলে। সোনা গলার পর বলে, তামাক সাজ। খুব জেদী হতে হয়। তবে সাধন হবে। ঈশ্বরেতে সব সময় মন দেবে। প্রথম দিকে একটু খাটতে হয়। তারপর বসে বসে পেন্সন পাওয়া।'

কি সুন্দর উদাহরণ তৈরি করে বোঝানো। ব্যবহারিক জগতের সবার নাগালের মধ্যে জানা উদাহরণ। বুঝতে কোনো অসুবিধে নেই। কথার মধ্যে রস আর মাধুর্য পাশাপাশি। বক্তব্য আর কবিতা। যার যাতে আনন্দ সে সেইটা বুঝে নেয়।

একদিন সুরেন্দ্রর বাড়িতে গিয়েছেন। ফরাসের ওপর তাকিয়া সাজানো। ঠাকুরকে একটি তাকিয়া নিয়ে বসতে বলা হল। তিনি তাকিয়া নিলেন না। ভক্তদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসা! কি জানো অভিমান ত্যাগ করা খুব শক্ত। এই চিন্তা করে বলছ, ও কিছু নয়; আবার কোথা থেকে এসে পড়ে। ছাগলকে কেটে ফেলেছে, তবু তার শরীর নড়ছে। স্বপ্নে ভয় পেয়ে জেগে উঠে দেখলে বুক দুর দুর করছে। অভিমান তেমনি। তাড়িয়ে দিলেও আবার এসে জোটে।'

সুরেন্দ্রর এক আত্মীয় বৈদ্যনাথ এসে পড়লেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে কটি প্রশ্ন করতে চান। মনে কিছু সংশয় রয়েছে। তার নিরসনের

জন্যই এই প্রশ্ন। তিনি বললেন, 'দেখুন এই যে স্বাধীন ইচ্ছার কথা বলি, মনে করলে ভাল বা মন্দ যে কোনো কাজ করতে পারি এটা কি সত্য? আমরা কি স্বাধীন?'

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'সবই ঈশ্বরের অধীন। তাঁরই লীলা। ছোট বড় খারাপ ভাল দুর্বল শক্তিমান এ সবই তাঁর মায়া। যতক্ষণ তাঁকে না লাভ করা যায় ততক্ষণ মনে হয় আমরা স্বাধীন। এই ভুলটুকু, ভুল বোধটুকু তিনিই রেখে দেন—নইলে পাপ আরো বেড়ে যেত। পাপের দমন হত না। যিনি ঈশ্বর লাভ করেন তার মনে সংসার থাকে না। তিনি জানেন ঈশ্বর যন্ত্রী তিনি যন্ত্র। তাই তর্ক করা ভাল নয়। তোমার কি মনে হয় এ ব্যাপারে?'

বৈদ্যনাথ বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, তর্ক করা ভাবটা জ্ঞান হলে চলে যায়।'

ঠাকুর বলে উঠলেন, 'থ্যাঙ্ক ইয়ু' সবাই হো হো করে হেসে উঠল। হাসি থামলে তিনি বলতে লাগলেন, 'তোমার হবে। ঈশ্বরের কথা কেউ যদি বলে মানুষ তা বিশ্বাস করে না। মহাপুরুষ বললেও না; সবাই ভাবে, ও যদি ভগবান দেখে থাকে তো আমাকে দেখাক। কিন্তু একদিনেই কি নাড়ী দেখা শেখা যায়, বৈদ্যের সঙ্গে কিছুদিন থাকতে হয়—তবে জানা যায় কোনটা কফের আর কোনটা পিত্তির নাড়ী—যাদের নাড়ী টেপা পেশা তাদের সঙ্গ করতে হয়।' আবার হাসি উঠল এই কথায়। ঠাকুর তখনো বলছেন, 'ওমুক নম্বরের সুতো কি যে কেউ চিনতে পারে। যারা সুতোর ব্যবসা করে তাদের দোকানে কিছুদিন থাকলে তবে ঝাঁ করে বলা যায় কোনটা চল্লিশ আর কোনটা একচল্লিশ নম্বর সুতো।'

রামচন্দ্রের বাড়িতে গিয়েছেন ঠাকুর। তিনি ভক্তবৎসল। প্রতি ভক্তের বাড়িতে যান। তাদের আপন করে টেনে নেন নিজের বুকে। ভক্তরাও তাই এমন গুরু কৃপায় নিশ্চিন্ত হয়ে দিন কাটান। শ্রীরামকৃষ্ণ

রয়েছেন কৃপাদৃষ্টি নিয়ে। অতএব মাভৈঃ।

ঠাকুরকে যথাযোগ্য সম্মান দিয়ে বসানো হয়েছে। কথকতা হচ্ছে তাই শোনবার জন্যই এই আয়োজন। হরিশ্চন্দ্রের জীবন কথা। স্থির হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ শুনছেন। কথা শেষ হলে তিনি বাইরের ঘরে এসে বসলেন। এখানে কথক অনুরুদ্ধ হয়ে তাঁকে উদ্ধব কথা শোনাল। সব শুনে কথককে ঠাকুর বললেন, 'গোপীদের ভক্তি প্রেমাভক্তি, অব্যভি-চারিণী। ব্যভিচারিণী ভক্তি কি তা জান? জ্ঞান-মিশ্রিত ভক্তি। যেমন কৃষ্ণই সব হয়েছেন। কিন্তু প্রেমাভক্তিতে এই জ্ঞান মেশানো নেই। প্রেমাভক্তিতে দুটি জিনিস রয়েছে। এক, অহং আর দুই, মমতা।'

একজন ভক্ত জানতে চাইলেন, 'জ্ঞান-মিশ্রিত ভক্তি আর প্রেমা-ভক্তির মধ্যে কোনটা ভাল?'

উত্তর দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'ঈশ্বরে প্রগাঢ় ভালবাসা না হলে প্রেমা-ভক্তি আসে না। আর 'আমার' হল জ্ঞান। বুঝিয়ে দিচ্ছি। তিন বন্ধু বন দিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় বাঘ এসে সামনে পড়ল। একজন তাই দেখে বললে, ভাই আমরা সব মরলুম। আর একজন বলল, মরব কেন এস ভগবানকে ডাকি। তৃতীয়জন তখন বলল, না তাঁকে কষ্ট দিয়ে কি হবে, এস এই গাছে উঠে পড়ি। যে প্রথম মরলুম বলেছিল সে জানে না ঈশ্বর রক্ষাকর্তা হয়ে আছেন। আর যে ঈশ্বরকে ডাকতে চাইল, সে জ্ঞানী, সে জানে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় সব ঈশ্বর করছেন। আর যে তাঁকে কষ্ট দিয়ে কি হবে বলল, তার ভেতর প্রেম ভালবাসা জন্ম নিয়েছে। প্রেমের স্বভাবই এই নিজেকে বড় ভাবে অন্যকে ছোট করে দেখে। তার সব সময়ে ইচ্ছে যাকে ভালবাসে তার গায়ে যেন আঁচড় না লাগে।'

জ্ঞান-মিশ্রিত ভক্তি আর প্রেমাভক্তি সবাই বুঝে গেল জলের মতো। এমন অসাধারণ রস মেশানো গল্প করার ক্ষমতা সাধারণের দেখা যায় না। তিনি ছিলেন অসাধারণ—পরমপুরুষ। তিনি বুঝতেন কাকে

কেমন করে বলতে হবে। কোন ভক্ত কোন রস চায়। চাহিদা মতো রসের যোগান দিয়েছেন বলেই তিনি পরমগুরু।

রসিকতায় ওস্তাদ শ্রীরামকৃষ্ণ। কথায় কথায় রসসৃষ্টি ও লোককে হাসানোর ক্ষমতা তাঁর ভীষণ। দক্ষিণেশ্বরে বসে আছেন। চারপাশে ভক্তরা। কে একজন এক চাঙারি জিলিপি এনেছে। ঠাকুর তাই থেকে ভেঙে একটুকরো মুখে দিয়ে সমস্ত ভক্তদের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে উঠলেন, 'দেখছ আমি মার নাম করি বলে এইসব জিনিস খেতে পাচ্ছি। তা বলে তিনি লাউ কুমড়ো ফল দেন না। তিনি অমৃত দান করেন। জ্ঞান প্রেম বিবেক বৈরাগ্য।'

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর দর্শন সম্বন্ধে ভক্তদের বলতে লাগলেন। 'গেরুয়া জামা পরে আছেন। মুড়ি সেলাই নেই। কথা বলছেন আমার সঙ্গে; আর একদিন এসেছিলেন মুসলমানের মেয়ে সেজে। মাথায় তিলক কিন্তু দিগম্বরী। ছ-সাত বছরের মেয়ে। আমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ফচকেমি করতে লাগল। হৃদের বাড়ি যখন যাই গৌরাঙ্গ দর্শন হয়েছিল। কাল পেড়ে কাপড় পরনে। হলধারী আমায় বলত তিনি ভাব-ভাবনার অতীত। ওর কথা শুনে মাকে গিয়ে বললাম, মা হলধারী এসব বলছে তবে কি রূপটুপ মিথ্যে? মা রতির মার রূপ ধরে আমাকে বললে, তুই ভাবেই থাক। হলধারীকে আমি সে কথা বলে দিলাম। এক একবার ও কথা ভুলে যাই বলে কষ্ট হয়। ভাবে না থেকে আমার দাঁত ভেঙে গেল। তাই দৈববাণী বা প্রত্যক্ষ না হলে ভাব আর ভক্তি নিয়েই থাকব। আগে সাক্ষাৎ দর্শন হত। যেমন তোমাদের দেখছি এই চোখ দিয়ে। এখন ভাবে দর্শন হয়।

'বিষয়বুদ্ধি না ছাড়লে চৈতন্য হয় না—ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। সরলতা ছাড়া তাঁর দেখা মেলা অসম্ভব। তাঁকে পেলে জ্ঞান বিচার আর থাকে না। জ্ঞান বিচার ততক্ষণ যতক্ষণ অনেক বলে এই বোধ থাকে। যখন ঠিক ঠিক জ্ঞানলাভ হয় তখন চুপ হয়ে যায় মন আপনা থেকে।

যেরূপ ত্রৈলঙ্গস্বামী।' কথাটা এবার উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চাইলেন। 'ব্রাহ্মণ ভোজনের সময় দেখ নি? প্রথম হৈ চৈ। তারপর পেট যত ভরে আসছে ততই চেঁচামেচি কমছে। পাতে দই পড়তে শুধু সপসপ শব্দ। আব কোনো আওয়াজ নেই। তারপরই ঘুম অর্থাৎ সমাধি। তখন কোথায় শব্দ কোথায় কি!

'মুখে অনেকে ব্রহ্মজ্ঞানের বুলি আওড়ায় কিন্তু নিজের জিনিস নিয়েই থাকে। ঘর বাড়ি টাকা পয়সা মান সম্মান ইন্দ্রিয় সুখ। মনুমেণ্টের নিচে দাঁড়িয়ে থাকলে গাড়ি ঘোড়া সাহেব মেম এসব দেখা যায়। যেই ওপরে ওঠা যায় তখন কেবল আকাশ সমুদ্র—বাড়ি ঘর ঘোড়া গাড়ি এসবে মন যায় না। সব কিছুই তখন পিঁপড়ের মতো দেখায়।

'ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে সংসারে মন, কমিনী-কাঞ্চনে লোভ সব চলে যায়। কাঠ যখন পোড়ে তখন পড়পড় করে অনেক শব্দ হয় সেই সঙ্গে আগুনের ঝাঁজ। কিন্তু পোড়া শেষ হয়ে যখন ছাই পড়ে রইল তখন সব শব্দের শেষ। অশান্তির অবসান হলেই উৎসাহে ভাঁটা পড়ে—শেষে শান্তি বিরাজ করে। ঈশ্বরের যত কাছে যাবে ততই শান্তি। গঙ্গার যত কাছে এগোবে ততই শীতলতা অনুভব করা যাবে। অবগাহনে আরো শান্তি। তবে প্রাণী জগৎ চতুর্বিশংতি তত্ত্ব এ সব তিনি আছেন বলেই রয়েছে। তাঁকে বাদ দিলে আর কিছুই থাকে না। একের পিঠে যত শূন্য দেবে সংখ্যায় তত বেড়ে যাবে। কিন্তু এককে মুছে দিলে শূন্যের আর কোনো দাম নেই। মূল্যহীন হয়ে পড়ে থাকে।'

বিশুদ্ধ বিজ্ঞান বিষয়ে ঠাকুরের চিন্তাধারার গভীরতা এর থেকে বোঝা যায়। তিনি শূন্যের মূল্যকে ধর্মের সঙ্গে স্থাপনা করে স্বীয় বক্তব্যকে কতখানি জোরদার করে তুললেন। যে রসিক, রসবেত্তা, তিনি সমস্ত জিনিস থেকেই রস গ্রহণ করতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হামেশাই দুরূহ বিষয়গুলিকে জলের মতো তরল করে দিতেন উপমা দিয়ে, নয়তো কোনো কাহিনী বলে।

তিনি বলে চলেছেন, 'সমাধি অবস্থা লাভের পর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেও কেউ-কেউ তুরীয় মার্গ থেকে নেমে আসে। তারা বিদ্যার আমি বা ভক্তির আমি নিয়ে দিন কাটায়। বাজারে কাজ শেষ হলেও কেউ কেউ নিজের ইচ্ছেতে বাজারে থাকে। একটু লোভ থাকলে তাঁকে লাভ করা যায় না। যেমন ধরো সুতোর গায়ে সামান্য আঁশ থাকলে তা ছুঁচের মধ্যে দিয়ে যায় না। ভগবান-প্রাপ্ত মানুষের কাম-ক্রোধ নামেই। যেমন পোড়া দড়ি। দেখতে ঠিক দড়ির মতোই। কিন্তু ফু দিলেই ছাই উড়ে যাবে। যে মুহূর্তে মন থেকে আসক্তি চলে যাবে তখনই তাঁর দর্শন হয়। শুদ্ধ মনে যা উঠে আসে সে তাঁর বাণী। শুদ্ধ মন আর শুদ্ধ বুদ্ধিতে তফাৎ নেই। শুদ্ব আত্মাও একই। তিনি বই আর কিছু শুদ্ধ নেই। তাঁকে পেলেই ধর্মাধর্মের পার হওয়া যায়।

বলরাম এসেছেন। তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ ওখানেই খেতে বললেন। বলরামেব মতো সেবক ভক্ত দুর্লভ। খাবাব দেরী আছে। ঠাকুর সকলকে নিয়ে কথা বলছেন। কথায় কথায় হঠাৎ ঠাকুর বললেন, 'হাজরা আমাকে শিক্ষা দেয়; বলে, তুমি কেন ছোকরাদের জন্য অত চিন্তা কবো? একদিন গাড়ি করে বলরামের বাড়ি যাচ্ছি, পথে চিন্তা হল খুব। বললাম, মা হাজরা বলে আমি নরেন্দ্র এইসব ছেলেদের জন্য কেন ভাবি? ঈশ্বর চিন্তা না করে এদের চিন্তা কেন করি? এই কথা বলতে বলতেই মা দেখালেন তিনিই সব মানুষ হয়েছেন। এই দর্শনের পর যেই সমাধি ভঙ্গ হল হাজরার ওপর রাগ করতে লাগলাম। বলে দিলাম, শালা আমার মনটা খারাপ করে দিয়েছিল। পরে আমার মনে হল, ওরই বা দোষ কি, সে বেচারী বুঝবে কি করে।

'আমি এদের সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞান করি। প্রথম দেখাতেই বুঝলুম নরেন্দ্রর দেহবুদ্ধি নেই। একটু বুকে হাত দিতেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। ক্রমে তাঁকে দেখবার জন্য আকুল হলাম। প্রাণ আটু-পাটু করতে লাগল। মাঝে মাঝে নরেন্দ্রকে দেখব বলে বসে বসে কাঁদতাম।'

ধন্য ভক্তরা। বিশেষ করে ধন্য সেই নরেন্দ্রনাথ। যিনি পরে ঠাকুরের অসীম কৃপায় বিশ্বজয় করেছেন। ঠাকুরের সমস্ত শক্তি তাঁর মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। মানুষ চিনতেন তিনি। আধার বুঝে শক্তি ঢেলেছেন। সেই আধারই হিন্দুধর্মকে নতুন এক উদ্দীপনার আলো দেখিয়েছে।

নিজের সাধন জীবনের কথা বলছেন। 'উঃ সে কি অবস্থাই না গেছে। এই অবস্থার প্রথম দিকে কোথা দিয়ে রাতদিন কাটত বুঝতে পারতাম না। সবাই ভাবল পাগল। তাই বিয়ে দিয়ে দিল। উন্মাদ ভাব মনের ভেতরে। প্রথমে ভাবলাম পরিবারও খাবে দাবে এমনি থাকবে। সেসব দিনের কথা কি বলব। সুন্দরী পুজো করলুম চোদ্দ বছরের মেয়েকে। টাকা দিয়ে প্রণাম করলাম। রামলীলা দেখতে গিয়ে যারা সীতা রাম হনুমান প্রভৃতি সেজেছিল তাদের আসল মনে হওয়ায় পুজো করলাম। মাঝে মাঝেই কুমারীদের এনে পুজো করতুম। সবাইকেই সাক্ষাৎ মা বলে বোধ হত। একদিন বকুলতলায় নীলকাপড় পরিহিতা একটি বেশ্যাকে দেখলাম দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে সীতার উদ্দীপন হল। মনসচক্ষে দেখলাম উদ্ধার পেয়ে সীতা রামের কাছে যাচ্ছেন। জ্ঞান হারিয়ে সমাধি। আরেকদিন গড়ের মাঠে বেলুন ওড়া দেখতে গিয়ে গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো একটি সাহেবের ছেলেকে দেখে কৃষ্ণকে মনে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সমাধি।

'তখন আমার কোনো হুঁশ ছিল না। মেজোবাবু কিছুদিন জানবাজারে নিয়ে গেলেন। সেখানে মার দাসী হয়ে গেলুম। বাড়ির মেয়েরা আমাকে লজ্জা পেত না। ওই ভাবেই কতক দিন কাটল। হুবহু মেয়ের মতোন চালচলন। জান একজন কীর্তনীয়াকে আমি মেয়ে কীর্তনীয়ার সমস্ত ঢঙ দেখিয়েছিলুম। দেখে সে বলল, হুবহু এক। আপনি এমন সব জানলেন কি করে।' কথা শেষ করে তিনি

ভক্তদের মেয়ে কীর্তনীয়ার ঢঙ দেখালেন অঙ্গভঙ্গি করে। তখন কেউ আর হাসি চেপে রাখতে পারল না।

মণিলাল এসেছেন। নানা কথা হচ্ছে। মাস্টারকে ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা এই ভক্তির কি কারণ? ভবনাথ এ সব ছেলেদের ভাব হয় কেন?' মাস্টার চুপ। তিনি কি উত্তর দেবেন! ঠাকুর নিজেই উত্তর দিচ্ছেন, 'কি জান, সব মানুষই দেখতে এক রকম কিন্তু ভিতরে আলাদা। পুলির যেমন—কোনোটার ক্ষীরের পুর। কোনোটার কলাই ডালের। ঈশ্বর জানবার বাসনা, প্রেম ভক্তি এসব হল ক্ষীরের পুর।'

শ্রীরামকৃষ্ণ এ কথা বলে ভক্তদের মনে সাহস যোগাচ্ছেন। তিনি বলতে লাগলেন, 'সবাই ভাবে আমি বুঝি বদ্ধজীব, আমার বোধ হয় জ্ঞানভক্তি হবে না। গুরুর কৃপা হলে আর ভয় থাকে না। একটা গল্প শোন তবে। একটা ছাগলের পালে বাঘ পড়েছিল। লাফ দিয়ে ছাগল ধরতে গিয়ে বাঘের প্রসব হয়ে বাচ্চা হল। কিন্তু বাঘটি মারা পড়ল। বাচ্চাটা ছাগলের সঙ্গেই বড় হতে লাগল। ছাগলের সঙ্গে ঘাস খেতে লাগল। ছাগলের বাচ্চারা ব্যা ব্যা করে। বাঘের ছানাও তাই করে। দেখতে দেখতে সে বড় হল। একদিন ওই ছাগলের পালে অন্য একটা বাঘ এসে পড়ল। ঘাসখেকো বাঘটাকে দেখে সে তো অবাক। সে তাড়াতাড়ি বাঘের বাচ্চাটাকে ধরে তাকে জলের কাছে নিয়ে গেল। তারপর বলল, জলের ভেতর তোর মুখ দেখ—ঠিক আমার মতোন। এই মাংস নে খানিকটা খা। তাকে জোর করে মাংস খাওয়াল। সে তো খেতে চায় না—ব্যা ব্যা করছে। যাইহোক জোরাজুরিতে রক্তের স্বাদ পেয়ে খেতে লাগল। তখন নতুন বাঘটা বলল, এবার বুঝেছিস, আমিও যা তুইও তাই। চল আমার সঙ্গে বনে চল। তাই বললাম, গুরুর কৃপা হলে আর ভয় নেই—তিনি তোমার স্বরূপ চিনিয়ে দেবেন। একটু সাধন করলেই গুরু বুঝিয়ে দেন। তখন সে নিজেই সৎ অসৎ

চিনে নিতে পারে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের প্রকারান্তরে বলতে চাইছেন ভয় কি রে! আমি গুরু তোদের জন্য পাহারা রয়েছি। একটু সাধন কর—তারপর বুঝিয়ে দিলেই তাঁকে চিনে নিতে পারবি! এমন করে যে বলে, যে শেখায়, সেই তো প্রকৃত গুরু। গল্পের পর গল্প বুনে মনের সংশয় দূর করা—এ কি সহজ গুরুর কাজ!

'এক জেলে রাত্রে এক বাগানে জাল ফেলে মাছ চুরি করছিল।' ঠাকুর আবার গল্প বলছেন। 'গেরস্ত জানতে পেরে লোকজন নিয়ে তাকে ঘিরে ফেলল। মশাল জ্বেলে সবাই চোরকে খুঁজতে এল। এদিকে উপায় না দেখে জেলে খানিকটা ছাই মেখে একটা গাছতলায় বসে রইল। অনেক খুঁজেও কাউকে ওরা পেল না, শুধু দেখল ভস্মমাখা এক সাধু গাছতলায় বসে। পরদিন পাড়ায় খবর রটে গেল, বাগানে একজন ভারী সাধু এসেছে। শুনে সব লোক ফুল মিষ্টি নিয়ে সাধুকে প্রণাম করতে এল। সাধুর সামনে অনেক অর্থও পড়তে লাগল। তখন সেই জেলেটা ভাবল কি আশ্চর্য ব্যাপার। আমি সত্যির সাধু নই তবু আমার ওপর কি ভক্তি! তাহলে সত্যিকার সাধু হলে নিশ্চয়ই ঈশ্বর লাভ করব। কপট সাধনাতেই এতদূর জ্ঞানলাভ। তাহলে বুঝে দেখ সত্য সাধনায় কি হতে পারে।'

জেলে এরপর সংসার ত্যাগ করেছিল নিশ্চয়ই। একজন ভক্ত ভাবতে লাগল। কিন্তু যারা সংসারে আছে তাদের কি হবে? তাদেরও কি সংসার ত্যাগ করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু। ভক্তদের দ্বিধা সন্দেহ সংশয় তিনি বুঝে নেন। তাই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'যদি একজন কেরানীকে জেলে দেয়, সে জেল খেটে জেল থেকে বেরিয়ে কি করবে রাস্তায় ধেই ধেই করে নাচবে—তা নয়; সে আবার একটা কেরানীর কাজ জুটিয়ে নিয়ে সেই আগেকার মতোই কাজ করবে। গুরুর কৃপায় চৈতন্য উদয়ের পরও সংসারে জীবন্মুক্ত হয়ে থাকা যায়।

থেকে থেকে তিনি নিজের সাধন অবস্থার কথা ভক্তদের শোনান। উদ্দেশ্য হয়তো বোঝানো এই পথ কত কঠিন সেইটা। তিনি বলছেন, 'তখন কি অবস্থায় দিন কেটেছে। এখানে খেতাম না। বরাহনগরে কি দক্ষিণেশ্বরে কি এঁড়েদয় কোনো বামুনের বাড়িতে গিয়ে উঠতাম। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে খেতে চাইতুম, আর কিছু বলতাম না।

'এইভাবে দিন কাটছে। একদিন সেজবাবুকে ধরে বসলুম দেবেন ঠাকুরের বাড়ি যাব। তাঁকে দেখব। সেজবাবু আর দেবেন ঠাকুর এক সঙ্গে পড়েছিল। সেজবাবু রাজী হল। সে যে কি দিন গেছে।'—

হাজরার সঙ্গে একদিন বিকেলে কথা হচ্ছে। হাজরার সোহহং ভাব। ঠাকুর তাঁকে বলে উঠলেন, 'তিনি আস্তিক তিনি নাস্তিক, তিনিই ভাল, তিনিই খারাপ, জাগরণ নিদ্রা এসব অবস্থা তাঁর, আবার তিনি এ সবের উর্ধ্বে। শোন একটা গল্প তবে। এক চাষীর বেশি বয়সে একটি ছেলে হয়েছিল। ছেলেটিকে খুব যত্ন করলে। সে ক্রমশঃ বড় হচ্ছে। একদিন চাষা যখন ক্ষেতে কাজ করছে একজন তাকে খবর দিল, ছেলেটার খুব অসুখ হয়েছে। চাষা তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরল। বাড়ি এসে দেখল, ছেলেটি মারা গেছে। সবাই খুব কাঁদছে। ছেলের শোকে তো চাষীবউ পাগলের মতোন। কিন্তু চাষার চোখে একফোঁটা জল নেই। অনেকক্ষণ বাদে চাষা বউকে ডেকে বলল, কেন কাঁদছি না জান? কাল আমি স্বপ্ন দেখেছি, যে রাজা হয়েছি আর সাত ছেলের বাপ হয়েছি। স্বপ্নেই দেখলাম ছেলেগুলো রূপে গুণে কি সুন্দর! তারা বড় হয়ে বিদ্বান ধার্মিক হল এমন সময় আমার ঘুম ভেঙে গেল। তাইতো এখন ভাবছি যে তোমার ওই এক ছেলের জন্য কাঁদব না আমার সাত ছেলের জন্য কাঁদব। জ্ঞানীদের মতে জাগরণ আর স্বপ্নের প্রভেদ নেই। দুইই সমান সত্য। ঈশ্বর কর্তা তাঁর ইচ্ছেতেই সব হচ্ছে।'

হাজরা সব শুনে বললে, 'কিন্তু বোঝা খুব মুশকিল। ভূকৈলাসের

সাধুকে কত কষ্ট দিয়ে এক রকম হত্যা করা হল। সাধুটির সমাধি হয়েছিল। সবাই তাঁকে কখনো মাটিতে পোঁতে, কখনো জলের ভেতর রাখে, কখনো গায়ে ছেঁকা দেয়—এ রকম করে তাঁর জ্ঞান ফেরাল। কিন্তু ফিরেও এ রকম যন্ত্রণায় সাধুটি দেহত্যাগ করলে। লোকে তাঁকে যন্ত্রণাও দিলে আবার ঈশ্বরের ইচ্ছেতে সে বাঁচলও না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'যার যেমন কর্ম সে তেমন ফল পাবে। কিন্তু ভগবানের ইচ্ছেয় সেই সাধুর মৃত্যু হল। কবরেজরা মকরধ্বজ তৈরি করে বোতলে। বোতলের চারপাশে মাটির প্রলেপ দিয়ে আগুনে তা ফেলে রাখে। বোতলের ভেতরে রাখা সোনা আগুনের তাতে অন্য সব জিনিসের সঙ্গে মিশে মকরধ্বজে পরিণত হয়। কবরেজ তখন বোতল ভেঙে ভেতরের মকরধ্বজ বার করে নেয়। তখন বোতলের থাকা আর না থাকা সমান। তেমনি লোকে ভাবল সাধুকে মেরে ফেলল কিন্তু বিচার করে দেখ হয়তো তার জিনিস তৈরি হয়েছিল—ভগবান প্রাপ্তির পর শরীরের থাকা না থাকার কি তফাৎ!'

হাজরাকে বোঝাচ্ছেন ঠাকুর। বলছেন, 'ভূকৈলাসের সাধুর সমাধি হয়েছিল। সমাধি অনেক রকম। হৃষীকেশের সাধুর কথার সঙ্গে আমার মিলে গিয়েছিল। কখনো মনে হত দেহের মধ্যে বায়ু চলছে যেন পিঁপড়ের মতো, কখনো আবার সড়াৎ সড়াৎ করে। বাঁদর যেমন লাফিয়ে লাফিয়ে ডাল থেকে ডালে যায়। আবার মাছের গতি কখনো। যার হয় সে বুঝতে পারে। জগৎটা ভুল হয়ে যায়। ঈশ্বর-কোটি মানুষরা সমাধির পর ফেরে না। জীব যারা সাধনার জোরে সমাধি পর্যন্ত যায় তারাও ফিরে আসে না। কিন্তু তিনি যখন মানুষ হয়ে অবতার হন, জীবের মুক্তির চাবি থাকে তাঁর হাতে, তাই তখন ফিরে আসেন—ফেরেন মানুষের কল্যাণের জন্য। জগৎ উদ্ধারের জন্য।'

শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলছেন তার অর্থ কি দাঁড়ায়। তিনি কি ভক্তদের বলতে চাইছেন জীবের মুক্ত হাওয়ার চাবি হাতে করে এসেছেন। তাই

সমাধির পরও নেমে আসেন ভক্তমাঝে—সাধারণে উপদেশ দেন।

হাজরা বললেন, 'ঈশ্বরকে তুষ্ট করা নিয়ে কথা। অবতার থাকুন আর নাই থাকুন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে উঠলেন। হেসেই বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বিষ্ণুপুরে রেজেস্টারীর বড় অফিস, সেখানে নাম লেখাতে পারলেই হল তাহলে গোঘাটে আর গোলমাল থাকে না।'

মণির সঙ্গে কথা বলছেন সন্ধ্যার সময়। তাঁকে বলছেন তিনি, 'দেখ ভগবানকে দেখা যায়। অমুকে তাঁকে দেখেছে, কিন্তু একথা কাউকে বোলো না। আচ্ছা তোমাকে সাকার না নিরাকার ভাল লাগে?'

মণি উত্তর দিলেন, 'এখন একটু নিরাকারেই ঝোঁক, যদিও আস্তে আস্তে বুঝছি যে তিনিই সব সাকার হয়েছেন।'

ঠাকুর বলছেন, 'তাঁকে দর্শন করতে হলে সাধন চাই। আমি কঠোর সাধনা করেছি। বেলতলায় কত রকম সাধন করেছি। গাছতলায় পড়ে থাকতুম মা দেখা দাও বলে। চোখের জলে সারা শরীর ভিজে যেত।'

'আপনি কত সাধনা করেছেন—' মণি বলতে লাগলেন, 'তাই লোকের কি একটুতেই হয়ে যাবে। বাড়ির চারদিকে আঙুল ঘোরালেই কি দেয়াল হয়?'

শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বললেন, 'অমৃত বলে একজন আগুন জ্বাললে দশজন পোয়ায়! আর একটা কথা কি জান? নিত্যে পৌঁছে লীলাতে থাকাই বেশ। জ্ঞান ও ভক্তি দুটো পথ। ভক্তি পথে আচার একটু বেশি। জ্ঞান পথে অনাচার করলে তার ধ্বংস হয়। বেশি আগুন জ্বালালে ভেতরে কলাগাছ ফেললেও পুড়ে যাবে। জ্ঞানীর পথ বিচারের পথ। বিচার করতে করতে কখনো হয়তো নাস্তিকতা এসে যায়। কিন্তু তাঁকে জানবার ইচ্ছে আন্তরিক হলে নাস্তিকতাতেও কিছু হয় না, সে ভগবান চিন্তা ছাড়ে না। যার বাবা-মা চাষের কাজ করে

এসেছে, হাজা সুখা বছরে ফসল না হলেও সে চাষ করবে।'

এভাবেই শিক্ষা। যাকে যেমন, যার যা বিশ্বাস। শ্রীরামকৃষ্ণ সব সময়েই বুঝে নিতেন তাঁর আধারটি কি রকম। আধার বুঝে তিনি তেল ঢালতেন। জ্ঞানবাতি জ্বলে উঠত। তিনি যেন জীবন বেদ হয়ে বেদের সার কথা গল্প করে শোনাতেন। রসের কারবারী ছাড়া এমন রস পরিবেশন অসম্ভব।

রাখালের বাবা ও তাঁর শ্বশুর এসেছেন। ভক্ত সঙ্গে ঠাকুর বসে। তিনি দুজনকেই মাঝে মাঝে দেখছেন।

শ্বশুরমশায় হঠাৎ জানতে চাইলেন, 'গৃহস্থাশ্রমে থেকে কি ভগবান পাওয়া যায়?'

শ্রীরামকৃষ্ণ এই অবিশ্বাস দেখে হাসলেন। বললেন, 'কেন পাওয়া যাবে না। সংসারে পাঁকাল মাছের মতো থাক। সে পাঁকে থাকে কিন্তু তার গায়ে পাঁক থাকে না। আর ঘুসকির মতো থাক। সে সংসারের সব কাজ করে বটে তার মন পড়ে থাকে উপপতির ওপর। মনটা ফেলে দিয়ে ঘরের সব কাজ কবো। যদিও একাজ খুব শক্ত। সংসারে নানা গোলমাল. নির্জন না হলে ভগবানের কথা মনে আসে না। চাল কাঁড়বার সময় একা বসে কাঁড়তে হয়। মাঝে মাঝে চাল হাতে নিয়ে দেখতে হয় কেমন সাফ হয়েছে। সেই চাল কাঁড়া অবস্থায় পাঁচবার ডাকলে কি করে ভাল বাছা হবে!'

অন্য এক ভক্ত প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে এখন উপায় কি?'

'উপায় আছে।' শ্রীরামকৃষ্ণ দৃঢ়তায় বললেন, 'যদি তীব্র বৈরাগ্য আনতে পার তাহলেই হবে। যা মিথ্যে বলে জানছ তা জেদ করে ছাড়বে। আমার খুব অসুখের সময় গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। তিনি ওষুধ দিয়ে বলেছিলেন, জল খেতে পারবে না। সকলে ভাবল জল না খেয়ে কি ভাবে থাকব—আমি জেদ করলাম জল খাব না। আমি তো পরমহংস, পাতিহাঁস নই, দুধ খাব।

'কিছুদিন একলা নিরিবিলিতে থাকতে হয়। বুড়ি একবার ছুঁতে পারলে আর ভয় নেই—সোনায় পরিণত হলে তারপর সে যেখানে থাক কোনো ভয় নেই। নির্জনে ভগবানকে একবার পেয়ে গেলে সংসারেও থেকে যাওয়া যায়।'

আরেকজন ভক্ত জানতে চাইলেন, 'ভগবান যদি সবই করলেন তবে ভালমন্দ পাপপুণ্য এসব দিলেন কেন? পাপও তাহলে তাঁরই ইচ্ছে?'

রাখালের শ্বশুর বললেন, 'তাঁর ইচ্ছা আমরা কি করে বুঝব?'

ঠাকুর এবার উত্তর দিলেন, 'পাপপুণ্য আছে কিন্তু তিনি নিজে তা থেকে নিবৃত্ত। বাতাসে ভাল খারাপ দু গন্ধই ভেসে বেড়ায়। কিন্তু বাতাসের কোন গন্ধ নেই। তাঁর সৃষ্টিই এ রকম।'

আলোচনার মধ্যে আবার গৃহস্থাশ্রমের কথা উঠল। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'একটা কথা কি জান, সংসার করলে মনের বাজে-খরচ হয়ে যায়। এর জন্য মনের খুব ক্ষতি হয়। এই ক্ষতি অনেকটা পূর্ণ হয়ে যায় যদি কেউ সন্ন্যাস গ্রহণ করে। মানুষের জন্ম তিনবার, একবার বাবা জন্ম দেন। দ্বিতীয় জন্ম উপনয়নে আর তৃতীয়বার জন্ম হয় সন্ন্যাসের সময়। কামিনী-কাঞ্চন এ পথে প্রধান বাধা। মেয়েছেলের প্রতি আসক্তি ঈশ্বরের পথ বিমুখ করে। যখন কেউ কেল্লায় যায় তখন জানতে পারে না গড়ানে রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে। ভেতর পৌঁছলে বোঝা যায় কত নীচে পৌঁছে গেছে। সংসারে শুধু কামের ভয় নেই ক্রোধ আছে। কামনার পথে কাঁটা পড়লেই ক্রোধ জ্বলে ওঠে।'

মাস্টার বললেন, 'আমার পাতের কাছে বেড়াল মাছ নিতে আসে কিছু বলতে পারি না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'সে কি! একবার নয় মারলে, তাতে দোষ কি? সংসারী মানুষ ফোঁস করবে। বিষ

ঢালবে না। শত্রুদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য ক্রোধের ভান করতে হয়। না হলে শত্রু ক্ষতি করে। তবে ত্যাগীদের ফোঁস করার দরকার নেই।'

'সাধন খুব প্রয়োজন।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন। 'হবে না কেন? নিশ্চয়ই হবে—যদি বিশ্বাস ঠিক ঠিক হয় তাহলে পরিশ্রম বেশি একটা করতে হবে না। শুধু গুরুবাক্যে বিশ্বাস চাই। ব্যাসদেব যমুনা পার হবেন। নদীর তীরে এসে দেখলেন গোপীরাও সেখানে সমবেত হয়েছে। তারাও ওপারে যাবে। খেয়ার দেখা নেই। তাই দেখে তারা ব্যাসদেবকে বলল, ঠাকুর এখন কি হবে। ব্যাসদেব বললেন, ঠিক আছে তোদের পার করার ব্যবস্থা করছি। তার আগে আমার ক্ষিদে পেয়েছে কিছু খাবার দে। গোপীদের কাছে ক্ষীর দই মাখন অনেক ছিল তিনি সমস্ত খেয়ে ফেললেন। তখন তারা বলল, ঠাকুর এবার পারের কি হল? ব্যাসদেব তখন নদীর কাছে গিয়ে বললেন, হে যমুনে, যদি আজ কিছু না খেয়ে থাকি তো তোমার জল দুভাগ হোক—আমরা সে পথ দিয়ে ওপারে যাব। বলতে না বলতে জল দু পাশে সরে গেল। গোপীরা তো কাণ্ড দেখে অবাক। তারা ভাবতে লাগল, উনি এতক্ষণ এত খেয়েও যদি না খেয়ে থাকি বলছেন, কি ব্যাপার।—

'এর নাম দৃঢ় বিশ্বাস। আমি না, বুকের মধ্যে নারায়ণ তিনিই খেয়েছেন।' শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃত বিশ্বাস ছাড়া তাঁকে পাওয়া যায় না তাই বলতে চাইলেন ভক্তদের।

'মন স্থির না হলে যোগ হয় না, যে পথেই যাও' শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীর ভাবে বললেন, 'মন যোগীর বশ। কিন্তু যোগী মনের বশ নয়। মন ঠাণ্ডা হলে বায়ু স্থির হয় তখন কুম্ভক হয়। ভক্তিযোগেও কুম্ভক হয়—বায়ু ভক্তি যোগেও স্থিত হয়। সোঽহং সোঽহং করে চেঁচালেই হয় না, আর সকলের অবস্থা এক নয়। সবাইকে সাধন

করতে হয় না। অনেকের ফল আগে হয় সাধন পড়ে। যেমন লাউ কুমড়োর আগে ফল পরে ফুল।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ বসে আছেন। দুপুর বেলা। ভক্ত সমাগম কম। মাস্টার মহেন্দ্র গুপ্ত এসেছেন। তিনি ওঁকে প্রণাম করে বসলেন। ওকে দেখেই ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের খোঁজ নিলেন। 'হ্যাঁগো তোমার সঙ্গে নরেন্দ্রর দেখা হয়েছিল?' কথা বলতে বলতে নিজেই হাসলেন, 'নরেন্দ্র নাকি বলেছে, উনি এখনো কালী ঘরে যান, যখন ঠিক হয়ে যাবে সব তখন আর যাবেন না।' ঠাকুর উঠে দাঁড়ালেন। হঠাৎ বললেন, 'তোমার আজ স্কুল নাই, এমন সময় এসেছ?'

মাস্টার উত্তর দিলেন, 'দেড়টায় ছুটি হয়ে গিয়েছে। বিদ্যাসাগর স্কুল দেখতে এসেছিলেন তাই।'

শ্রীরামকৃষ্ণ হঠাৎ বললেন, 'বিদ্যাসাগর সত্য কথা বলে না কেন? সেদিন বললে এখানে আসবে কিন্তু আজও এল না। পণ্ডিত আর সাধুতে ফারাক অনেক। শুধু যিনি পণ্ডিত তার কামিনী-কাঞ্চনে মন আছে। সাধুর মন একমাত্র ঈশ্বর পায়ে। পণ্ডিত মুখে যা বলে তা করে না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ মণির সঙ্গে কথা বলতে বলতে মাকে প্রণাম করে এলেন। হঠাৎ তাঁর কি মনে পড়ল। বললেন, 'আচ্ছা আজকাল কেশব সেন এত বদলে গেল কেন, বলতে পার? এখানে খুব আসত, হরিশ বেশ বলে, এখান থেকে সব চেক পাশ করিয়ে নিতে হবে তবে ব্যাঙ্কে টাকা পাওয়া যাবে।' মজার কথা মনে পড়তেই তিনি হাসলেন। বিমল হাসি তাঁর। কোথাও কপটতা ক্ষুদ্রতা নেই। মণি অবাক হয়ে তাঁর কথা শুনছেন। তাহলে উনিই সেই সচ্চিদানন্দ যিনি চেক পাশ করাবেন। মুক্তির চেক ভক্তির চেক।

'বিচার করতে যেও না।' ঠাকুর আবার বলছেন, 'ন্যাংটা বলত

শুনেছি তাঁর একটা অংশে এই ব্রহ্মাণ্ড। সব সময় মনে রাখবে তাঁকে আমি কিছুই জানি না। কখনো ভাবি ভাল কখনো মন্দ। তাঁর আমি কি বুঝব?'

'আজ্ঞে তাঁকে কি বোঝা যায়, নিজের বুদ্ধিমতো যার যা ক্ষমতা সেই নিয়ে বড়াই করে, আমি সব বুঝে ফেলেছি।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে লাগলেন, 'তাঁকে জানবে কে? আমি চেষ্টাও করি না। শুধু আমি মা বলে ডাকি। মা যা করেন। ছোট ছেলে যেমন, মার কত ঐশ্বর্য জানতে চায় না। সে শুধু জানে আমার মা আছেন। আমার ওই সন্তান ভাব।' হঠাৎ তিনি নিজের বুকের দিকে নির্দেশ করে মণিকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা এখানে কিছু আছে বলে তোমার মনে হয়?'

মণি নিরুত্তর, তিনি অবাক হয়ে দেখছেন। ওই হৃদয়ে কি সাক্ষাৎ মা আছেন! তিনিই জীব মঙ্গলের জন্য দেহধারণ করে এসেছেন!

কেশব সেনের অসুখ ভারী, শ্রীরামকৃষ্ণ খবর পেয়েছেন। কেশবকে ভালবাসেন। খবর পেয়ে চললেন তাঁকে দেখতে। ভক্তসহ কেশবের বাড়ি পেঁীছলেন, বৈঠকখানায় প্রথম তাঁকে বসান হল। খানিকক্ষণ বসে তিনি অপেক্ষা করছেন। দেখা করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কেশবের ভক্তরা বলছেন, 'আপনি বসুন তিনি একটু পড়েই আসবেন।' তাই শুনে তিনি বললেন, 'সে কেন আসবে—তার কি দরকার—আমিই ভিতরে যাই না কেন?'

কথায় কথায় তিনি সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে ঘিরে সবাই উন্মুখ। ভাবের ঘোরে তিনি বলেছেন, 'শরীর আর আত্মা—শরীর রয়েছে আবার যাবে! আত্মার মৃত্যু নেই। যেমন সুপুরি। পাকা সুপুরি ছাল থেকে আলাদা হয়েই থাকে। কাঁচা অবস্থায় আলাদা করা কঠিন তাঁকে দেখলে তাঁকে পেলে দেহবুদ্ধি যায়। তখন দেহ আলাদা, আত্মা আলাদা বোঝা যায়।'

এই কথার মধ্যে কেশব সেন ঘরে এসে পড়লেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। ঠাকুর তখনো ভাবের ঘোরে রয়েছেন। কেশব সেন উঠে বসলেন, কিন্তু ওর ভাব কাটেনি। নিজের মনে কথা বলে যাচ্ছেন। মার সঙ্গে কথা বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণর ঘোর কাটাবার জন্য কেশবচন্দ্র জোরে জোরে বললেন, 'আমি এসেছি—এই দেখুন—' ঠাকুরের বাঁ হাত ধরে তিনি সেই হাতে নিজের হাত বুলোতে লাগলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ খেয়ালই করছেন না। আপন মনে বলে চলেছেন কথা। 'যতক্ষণ উপাধি আছে ততক্ষণ নানারকম বোধ—যেমন কেশব, প্রসন্ন, অমৃত ইত্যাদি। এক চৈতন্য-বোধ হল পূর্ণজ্ঞানে। তাঁর লীলা যে আধারে প্রকাশিত হয় সেখানে বিশেষ শক্তি প্রকাশিত। এই বিশেষ শক্তির প্রকাশ সেখানেই যেখানে কাজের দরকার বেশি।

'আদ্যাশক্তি আর পরব্রহ্ম এক। এক ছেড়ে অন্যকে ভাবা না। যেমন মণি আর তার জ্যোতি। মণি ছেড়ে জ্যোতির কথা চিন্তা করা যায় না। আবার জ্যোতিহীন মণিও ভাবা যায় না। সাপ আর তাঁর গতি। একের সঙ্গে অন্যে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। আদ্যাশক্তিই এই সব কিছু হয়েছেন। রাখাল নরেন এদের জন্য ভাবি, তা হাজরা বলে ওদের জন্য এত ভাব তো ভগবাকে ভাববে কখন।' কেশবচন্দ্র ও অন্যান্যরা হেসে উঠলেন এ কথায়।

'চিন্তায় পড়ে মাকে জিজ্ঞাসা করলাম। তারপর ভোলানাথকে শুধোলাম। সে বললে মহাভারতে নাকি এমন কথা আছে। সমাধিস্থ লোক সমাধি থেকে নেমে কোথায় দাঁড়াবে। তাই সত্ত্বগুণীরা ভক্ত নিয়ে মেতে থাকে। শেষ পর্যন্ত এই প্রমাণ পেয়ে তবে বাঁচলুম।' সবাই পুনরায় হেসে উঠল।

লাভের পর সবকিছুতেই তিনি দৃশ্য। বিশেষ করে মানুষে। মানুষের ভেতরে আবার বেশি দৃশ্যমান সত্ত্বগুণী ভক্তের মধ্যে। তাই

সত্ত্বগুণী শুদ্ধ ভক্তের দরকার সমাধিস্থ লোকের নেমে আসার জন্য। ব্রহ্ম আর আদ্যাশক্তি এক। যখন ক্রিয়াহীন তখন ব্রহ্ম—যাকে পুরুষ বলা যায়। যখন সবকিছু করছেন তখন বলি শক্তি। প্রকৃতি। পুরুষ আর প্রকৃতি। যিনি পুরুষ আবার তিনিই প্রকৃতি। যার পুরুষ জ্ঞান রয়েছে তার মেয়ে জ্ঞান রয়েছে। যার বাপ জ্ঞান আছে তার মা জ্ঞানও তেমনি। তিনি কি মা? না, এই জগতের মা। জগৎ তৈরি করেছেন। পালন করছেন। আর যে যা চাইছে তাই দিচ্ছেন।'

এবার তিনি ভাব কাটিয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠলেন। কেশবের সঙ্গে কথা বলছেন। অন্যরা সবাই সেই অমৃত কথোপকথন শোনার জন্য চুপ করে আছে। কুশল কথা না। ভদ্রতা বিনিময় নয়। কেবল ঈশ্বরীয় আলাপ। তিনি বলছেন কেশব সেনকে, 'ব্রাহ্মজ্ঞানীরা এত মহিমার ব্যাখান দেয় কেন? অনেকে বাগান দেখে তারিফ করে। বাগান বড় না বাবু বড়—বাবুকে কজন দেখতে চায়। নরেন্দ্রকে যখন দেখি একবারও শুধোই না তার বাপের নাম। জানতে চাই না ওর বাপের কখানা বাড়ি। আসল কথা হল মানুষ নিজ ঐশ্বর্য ভালবাসে তাই ভাবে ভগবানও বুঝি ঐশ্বর্যবিলাসী—ওতেই উনি খুশি হবেন। তোমার কাছে যা ঐশ্বর্য তাঁর কাছে তা কাঠ মাটি। তাহলে তাঁকে তুমি আর কি দেবে? ঈশ্বর ঐশ্বর্যের বশ নয় তিনি ভক্তির বশ। টাকা অর্থ এসব নয়—ভাব প্রেম ভালবাসা ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য এই তিনি চান।

'ভাব অনুযায়ী মানুষ ভগবানকে ভাবে। তমোগুণী ভক্ত দেখে মা পাঁঠা খায়; তাই সে বলি দেয়। রজোগুণী ভক্ত নানা ব্যঞ্জন করে ভাত রেঁধে দেয়। সত্ত্বগুণী ভক্তের পুজোয় কোনা হাঁকডাক নেই, লোকে জানতেই পারে না তার পুজো। এছাড়া আছে ত্রিগুণাতীত ভক্ত। এরা ছেলেমানুষের মতো। ভগবানের নাম করলেই তাদের পুজো হয়ে যায়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ এ পর্যন্ত বলে একটু থামলেন। কেশবের দিকে চেয়ে হাসলেন মধুর ভাবে। তারপর আবার বলতে শুরু করলেন, 'এই যে তুমি অসুস্থ হয়েছ এর মানে আছে। দেহের মধ্য দিয়ে নানা রকম ভাব চলে গেছে তাই এই দশা। যখন ভাব হয় তাৎক্ষণিক বোঝা যায় না— বহুদিন পরে দেহে আঘাত লাগে। কি রকম জান! বড় জাহাজ গঙ্গা দিয়ে চলে গেলে তখুনি কিছু টের পাওয়া যায় না। কিছুক্ষণ বাদেই দেখা যায় পারের কাছে জল ধপাস ধপাস করছে। কুঁড়েঘরে হাতি ঢুকলে সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়, তেমনি দেহের মধ্যে ভাব-হস্তী ঢুকলে দেহের একই অবস্থা।' তুলনার পর তুলনা। একটি বোঝাতে সহজতর আর একটি উপমা। ঠাকুরের জিবের আগায় একে একে এসে পড়ে। 'আগুন লাগলে কতক জিনিস ছড়িয়ে একটা অস্থির কাণ্ড বাধায়। জ্ঞানের আগুন তেমনি প্রথমে সব রিপুকে পুড়িয়ে ফেলে, তারপর অহং বোধকে পোড়ায়; তুমি ভাবছ সব ফুরিয়ে গেল! কিন্তু যতক্ষণ রোগের সামান্য বাকী থাকে ততক্ষণ তিনি ছাড়েন না। হাসপাতালে একবার নাম লেখালে রোগের একটু লক্ষণ থাকলে বড় ডাক্তার ছাড়ে না।'

হাসপাতালের কথায় কেশব সেন বার বার হাসছেন। মজার কথায় কে না হাসে। রস খেলে সকলেরই মিষ্টি লাগে। তাতে আবার ঠাকুরের পরিবেশিত অমৃত রস।

'শিশির পাবে বলে বাগানের মালী বসরাই গোলাপের গাছের শেকড় শুদ্ধ তুলে নেয়। শিশির পেলে আরো ভাল গাছ গজাবে। তাই বুঝি তোমারও শিকড় শুদ্ধ তুলে দিচ্ছে। ফিরে ফিরতি বুঝি ভীষণ একটা কাণ্ড হবে।' শ্রীরামকৃষ্ণ ও কেশব সেন এক সঙ্গে হেসে উঠলেন। 'তোমার অসুখ হলেই আমার প্রাণটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে। আগের বারে রাতের শেষ প্রহরে আমি কেঁদেছি পর্যন্ত। এবার অবশ্য ততটা হয় নি। এই দু তিন দিন যা একটু হয়েছে।'

কেশব সেনের মা এলেন। ঠাকুরকে প্রণাম করলেন। একজন জানাল, তিনি ঠাকুরকে বলছেন, কেশবের অসুখ যেন সেরে যায়। উত্তরে ঠাকুর বললেন, 'আনন্দময়ীকে ডাকো, তিনিই দুঃখ দূর করবেন।' কেশবকে বললেন, 'এত বাড়ির ভেতর থেক না। মেয়েদের মধ্যে থাকলে তুমি আরো ডুববে। ভগবানের কথা হলে দেখবে ভাল থাকবে।' কথাগুলো গম্ভীর ভাবে বলেই ছেলেমানুষের মতো হেসে হেসে বললেন, 'দেখি তোমার হাত দেখি।' কেশবের হাতখানা তুলে নিয়ে ওজন পরীক্ষা করে দেখে বললেন, 'নাঃ তোমার হাত বেশ হালকা —গলদের হাত ভারী থাকে।' বালকের মতো এই কথায় আবার সবাই হেসে উঠল।

কেশবের মার হয়ে একজন বলল, 'মা বলছেন কেশবকে আশীর্বাদ করুন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ গম্ভীর। বালকের ভাব আর নেই। উত্তর দিলেন, 'আমার কি সাধ্য তিনিই আশীর্বাদ করবেন।'

কেশব সেনের হঠাৎ কাশি উঠল। একটানা। কাশি থামতে চায় না। অনেক কষ্টের পর কাশি একটু কমল। তখন তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করে নিজের ঘরের দিকে চললেন। উদিত সূর্যের সামনে নতজানু চন্দ্র কিরণ হয়ে বিদায় নিচ্ছেন। কেশব চলে যাবার পর অন্যান্যদের বললেন ঠাকুর, 'অসুখ ভাল হোক একথা আমি বলতে পারি না। মার কাছে ও শক্তি আমি চাইও না। শুধু চাই শুদ্ধ ভক্তি।'

দক্ষিণেশ্বরে ঘরের বারান্দায় বসে ঠাকুর। সঙ্গে ভক্তরাও আছে। তাদের মধ্যে প্রাণকৃষ্ণ। একপাশে হাজরাও বসে রয়েছেন। হাসতে হাসতে একসময় ঠাকুর প্রাণকৃষ্ণকে বলছেন, 'হাজরা কিছু কম নয়। এখানে যদি বড় দরগা হয়, তবে হাজরা ছোট দরগা।' সবাই সেই ঠাট্টায় হেসে উঠল।

প্রাণকৃষ্ণ বিদায় নিলেন। এমন সময় অফিসের সাজে কেদার চাটুয্যে এসে হাজির। ভগবানের কথা হলেই ওর তুচোখে জল নামে। খুব প্রেমিক। ভেতরে গোপীদের ভাব। তাঁকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণর মনে রাধা ভাব উপস্থিত। সেই ভাবে তিনি গান ধরলেন। গান গাইতে গাইতেই সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। একটু বাদে তাঁর জ্ঞান ফিরল। তিনি স্বাভাবিক হলে কেদারবাবু চলে গেলেন।

সকাল তুপুর কাটল নানা কথায়। খাওয়ার পর সামান্য বিশ্রাম করছেন ঠাকুর। এমন সময় কতিপয় মাড়োয়ারী ভক্ত তাঁর কাছে এসে হাজির। শ্রীরামকৃষ্ণ উঠলেন। তারা সব ঘরের মেজেতে বসে। একজন ভক্ত জোড়হাত করে তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'মহারাজ আমাদের কি উপায় ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ তাদের বোঝাতে বসলেন। 'দেখ তুরকম পথ আছে। এক বিচারের পথ—দ্বিতীয় অনুরাগের। সৎ অসৎ বিচার। সৎ মানে ঈশ্বর আর অনিত্য বস্তুই হল অসৎ। বাজীকর সত্য, তার দেখানো জাতু সব মিথ্যা। এই হল বিচার। বিবেক। এ ভাবে সৎ অসৎ বিচারের নাম বিবেক। বিবেক আর বৈরাগ্য! বৈরাগ্য মানেই সংসারের সব কিছুতেই অরুচি। অভ্যাস করলে মনের মধ্যে অসাধারণ ক্ষমতা এসে পড়ে। তখন ইন্দ্রিয় সংযম করতে, কাম ক্রোধ লোভকে হাতের মুঠোয় আনতে কষ্ট হয় না। তারা আর বার হয় না। যেমন কচ্ছপ একবার পা গুটিয়ে নিলে আর বার করে না। কেটে দিলেও না।'

'তু পথ তো বললেন, আরেক পথ কি ?' ভক্ত প্রশ্ন করলেন।—

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'সোজা পথ। অনুরাগের বা ভক্তির পথ। একবার আকুল হয়ে নিরিবিলিতে তাঁর জন্য কাঁদ—গোপনে বলো—মা দেখা দাও।'

মাড়োয়ারী ভক্ত তখন অন্য প্রশ্ন তুললেন, 'মহারাজ সাকার পূজার

অর্থ কি? আর নিরাকার, নির্গুণ এই কথারই বা কি মানে?'

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'তবে শোন, বাপের ছবি দেখলে তাঁকে যেমন মনে পড়ে তেমনি প্রতিমার পুজো করতে করতে সত্যের রূপ চোখের সামনে খুলে যায়। সাকার রূপ কি বুঝতে পারলে না? ধরো যেমন জলরাশির মধ্যে থেকে ভুরভুরি উঠছে সে রকম। অবতারও একটি রূপ। অবতার লীলা আসলে আদ্যাশক্তিও লীলা। পাণ্ডিত্যে কিছু নেই। ব্যাকুল হয়ে একবার তাঁকে ডাকলে পাওয়া যায়। নানা বিষয় কিছু জানবার দরকার নেই, যিনি আচার্য তারই পাঁচরকম জানা বড় দরকার। অপরকে বধ করতে হলে একটি ছুঁচ বা নরুণ হলেই হয়। আমি কে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলেই তাঁকে পাওয়া যাবে। বিচারের শেষে দেখা যায় আমি এসব কিছুই না।'

মাড়োয়ারী ভক্তরা প্রণাম করে বিদায় গ্রহণ করল।

অন্য আরেক দিন। ভক্তদের মধ্যে চৌধুরী এসেছেন কলকাতা থেকে। তাঁর বউ মারা গেছে সম্প্রতি। তিনি ঠাকুরকে দেখতে এসেছেন। সরকারী চাকুকে। শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলছেন, 'রাখাল নরেন্দ্র ভবনাথ এরা নিত্যসিদ্ধ, চৈতন্য নিয়েই জন্মেছে। দেহ ধরেছে লোককে শিক্ষা দেবার জন্য। একদল লোক আছে যারা কৃপাসিন্ধু— হঠাৎ ঈশ্বরের কৃপা হল সঙ্গে সঙ্গে তারা জ্ঞান ও দর্শন পেয়ে যায়। আঁধার ঘরে আলো নিয়ে ঢুকলে যেমন পলকে হাজার বছরের কালো মুছে যায়, কিন্তু সংসারীকে সাধন করতে হবে। নিরিবিলিতে একা হয়ে ভাবতে হবে। পাণ্ডিত্য দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় না। আর তাঁকে বুঝবেই বা কে! ভগবানের ঐশ্বর্য অনন্ত—বিচার করে তা জানা বা বোঝা যায় না।'

'তাঁকে কি করে দেখা যায়?' চৌধুরী প্রশ্ন করলেন।

'এ চোখে তাঁকে দেখা যায় না। যদি তিনি দিব্য চক্ষু দেন তবেই

দর্শন হয়। অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শনের সময় ঠাকুর তাই দিয়ে ছিলেন।' ঠাকুর এই কথা বলে ঠাট্টার সুরে বললেন, 'তোমার ফিলজফিতে কেবল হিসাব আর কিতাপ—খালি শুকনো বিচার, ওতে হয় না। অনুরাগের সঙ্গে ভক্তি মেশাতে পারলে ভগবান আর স্থির থাকতে পারেন না। ভক্তি তার অতি প্রিয়—খোল দিয়ে জাব যেমন গরু ভালবেসে গবগব করে খায়। অহেতুকী ভক্তি চাই। তা না হলে হয় না।'

চৌধুরী নতুন প্রশ্ন করলেন, 'গুরু না হলে কি হবে না—আপনি কি বলেন?'

শ্রীরামকৃষ্ণর উত্তর, 'সচ্চিদানন্দই গুরু। যিনি গুরু তিনি ইষ্ট। গুরু খেই ধরিয়ে দেন। যদি প্রশ্ন করো কোন মূর্তি পুজো করব—যাকে ভাল লাগে তারই ধ্যান করো—মনে রেখ সব এক। শিব কালী হরি একেরই বিভিন্ন রূপ। যে এক করেছে সে ধন্য। শরীর রাখতে গেলে একটু কাম ক্রোধাদির প্রয়োজন। তাই তোমরা তা কমানোর চেষ্টা করবে।' শ্রীরামকৃষ্ণ কেদারের দিকে নির্দেশ করে বললেন, 'ইনি বেশ, নিত্যও মানেন আবার লীলাও মানেন।' নিত্যগোপালকে দেখিয়ে ঠাকুর বললেন, 'এর অবস্থা বেশ ভাল।' হঠাৎ তাকে শাসনের সুরে বলে উঠলেন, 'তুই কিন্তু সেখানে খুব যাবি না। ভক্ত হোক না কেন—তবু মেয়েমানুষ তাই সাবধান থাকবি। সন্ন্যাসীর নিয়ম বিষম কঠিন। স্ত্রীলোকের ছবি দেখাও তাদের বারণ। সাধুর ষোল আনা ত্যাগ দেখলে অন্য লোক ত্যাগী হতে শিখবে।'

বলরামের বাড়িতে গিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বলরাম সৌভাগ্যবান। ঠাকুর তাঁর বাড়িতে বার বার আসেন। সেখানেই মধ্যাহ্ন ভোজের আয়োজন। ঠাকুর একা নয়, সশিষ্য এসেছেন। খাওয়া দাওয়ার পর তিনি বিশেষ ভক্তদের দেখিয়ে বললেন, 'এদের খাইও তাহলেই বহু সাধুকে খাওয়ানোর পুণ্যলাভ হবে।'

নরেন্দ্র ভবনাথকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি মাছ পান ত্যাগ করেছেন।'

'সে কি রে!' অবাক হয়ে ঠাকুর হাসিমুখে ভবনাথকে বললেন, 'পান মাছে কি হয়েছে! ওতে কোনো দোষ নেই। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগই ত্যাগ। রাখাল কোথায়?' শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালের খোঁজ করলেন।

একজন বলল, 'তিনি ঘুমোচ্ছেন।'

হেসে উঠলেন ঠাকুর। 'একজন লোক মাতুর বগলে নিয়ে যাত্রা শুনতে গিয়েছিল।' রসের চুটকি বলছেন তিনি। 'যাত্রার দেরী দেখে সে মাতুর পেতে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন ঘুম ভাঙল তখন সব শেষ।' এবার সবাই হেসে উঠল। 'সে মাতুর বগলে নিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।' হাসির ফোয়ারা ছুটল।

বিকেলে কজন ব্রাহ্মভক্ত এসে পড়ল। ঠাকুর তাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। একজন ভক্ত ঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি পঞ্চদশী দেখেছেন?'

'সাধন অবস্থায় ওই সব শুনতে হয়। তাঁকে লাভ করলে আর জ্ঞানের অভাব হয় না। মা-ই রাশ টেনে দেন।' ঠাকুর উত্তর দিচ্ছেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হার্দ্য ভঙ্গিমায়। 'প্রথমে লেখা বানান করে করে শিখতে হয়। তারপর অমনি টেনে যাও। সোনা গলাবার সময় খুব তোড়জোর করতে হয়। হাপড় পাখা চোঙা নিয়ে—গলার পর যেই গড়নেতে ঢালা হল অমনি নিশ্চিন্তি।'

আরেকদিন শ্রীরামকৃষ্ণ গেছেন নন্দনবাগানে কাশীশ্বর মিত্রর বাগানবাড়িতে। ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে ভক্তদের নিয়ে বসেছেন। উপাসনা মন্দিরে তাঁকে বসানো হয়েছে। উপাসনার দেরী আছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বেদীর সামনে প্রণাম করেই বললেন, 'নরেন আমায় বলেছিল, সমাজ মন্দিরে প্রণাম করে কি হয়? মন্দির দেখলে তাঁকেই যে মনে পড়ে।

একজন ভক্ত বাবলা গাছ দেখে ভাবাবিষ্ট হয়েছিল। ওই গাছ দেখে তার মনে পড়ে যে এই গাছের কাঠে রাধাকান্তর বাগানের কুড়ুলের বাঁট হয়। একজন গুরুভক্ত ভক্ত গুরুর পাড়ার লোককে দেখেই বিভোর হয়ে গিয়েছিল। মেঘ নীলবসন প্রভৃতি দেখে রাধার মনে শ্রীকৃষ্ণব উদ্দীপন হত। তিনি তখন কোথায় কৃষ্ণ বলে উন্মত্ত হয়ে পড়তেন।'

ঘোষাল এই কথা শুনে বললেন, 'উন্মাদ হওয়া তো ভাল নয়।'

'সে কি গো।' ঠাকুর বলে উঠলেন, 'এ কি বিষয়চিন্তায় উন্মাদ যে জ্ঞান লোপ পাবে! এ অবস্থা যে ভগবানের চিন্তা করে হয়। প্রেমোন্মাদ জ্ঞানোন্মাদ এসব কি শোন নি!'

'কি ভাবে তাঁকে পাওয়া যায়?' একজন ব্রাহ্মভক্ত প্রশ্ন করলেন।

'তাঁর ওপর অর্পিত ভালবাসা। আর সবসময় এই বিচার, তিনিই সত্য—জগৎ অনিত্য।'

'কিন্তু কামক্রোধ রিপু রয়েছে এদের নিয়ে কি করা যায়?' পুনরায় প্রশ্ন করলেন ভক্তটি। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'ছ রিপুর মোড় ভগবানের দিকে ফিরিয়ে দাও—আত্মার সঙ্গে রমণের কামনা করো। যাঁরা ঈশ্বর পাবার পথে বাধা দেবে তাদের ওপর রাগ করো। লোভ করো তাঁকে পাবার। আমার আমার যদি করতেই হয় তো বলো আমার কৃষ্ণ আমার রাম। একান্তই অহংকারী হতে হলে বিভীষণের মতো হও, আমি রামকে প্রণাম করেছি অন্য কাউকে প্রণাম করব না।'

ব্রাহ্মভক্ত এবার বললেন, 'তিনিই যদি সব করাচ্ছেন তাহলে পাপের জন্য আমি দায়ী নই।'

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসলেন। 'দুর্যোধন তোমার মতোই বলেছিল। যাঁর বিশ্বাস সঠিক সে পাপ করে না। যে নাচতে জানে বেতালে তার পা পড়ে না। অন্তর পবিত্র না হলে ঈশ্বর আছেন এ বিশ্বাসই হয় না। তবে কি জান, সংসারী মানুষের ভগবানে ভালবাসা ক্ষণকালের—

গরম লোহার গায়ে জলের ছিটে দিলে তা যতক্ষণ থাকে সেইটুকু।'

উপাসনা শুরু হল। সমবেত ভাবে সবাই তাতে যোগ দিয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ক্রমশঃ তাই শুনে ভাবাবিষ্ট হচ্ছেন। এক সময় শেষ হল গম্ভীর স্তোত্রধ্বনি। এবার নিমন্ত্রিতদের খাওয়ানোর পালা। ভক্ত-সমেত ঠাকুর অপেক্ষা করছেন। কিন্তু সংসারী ভক্তদের আপ্যায়ন করতে ব্যস্ত গৃহস্বামী শ্রীরামকৃষ্ণর খোঁজ নিতে পারছেন না। সদা রসালাপী ঠাকুর তাই দেখে রাখালদের বলছেন, 'কি রে কেউ যে ডাকে না?'

রাখাল রেগে গেছেন। রাত হয়েছে। মন্দিরে ফিরতে হবে। তিনি বললেন, 'চলুন, আমরা চলে যাই।'

ওঁর রাগ দেখে হেসে উঠলেন পরমপুরুষ মহামানব। তাঁকে বললেন, 'আরে থাম্, তিন টাকা ছ আনা গাড়ি ভাড়া দেবে কে! রাগ দেখালেই হয় না। পয়সা নেই পকেটে আবার ফাঁকা আওয়াজ। তাছাড়া এত রাত্রে গিয়ে খাব কোথায়!'

শেষ পর্যন্ত আহার মিলল। ভক্তসঙ্গে বসে ঠাকুর খেলেন। খাওয়ার পর শ্রীরামকৃষ্ণ গাড়িতে উঠলেন। কিন্তু গাড়ি ভাড়া দেয় কে? গৃহস্বামীদের পাত্তা নেই। একজন গাড়ি ভাড়া চাইতে গেলে প্রথমে তাকে হাঁকিয়ে দিল। তারপর যাহোক তিন টাকা দিল। বলল, ঐতেই হবে। এ কথা হাসতে হাসতে ভক্তদের পরে ঠাকুর গল্প করেছেন।

পেনেটির মহোৎসবে রাজপথে বহুলোকের মধ্যে মাতোয়ারা হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ নাচছেন। অবাক মানুষরা দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখছে। প্রতি বছরই এই উৎসব হয়। শ্রীরামকৃষ্ণও প্রায় প্রতি বছর এখানের উৎসবে যোগ দেন। সঙ্গে অন্য ভক্তরা এসেছে। গাড়িতে আসবার সময় সে অন্য এক ঠাকুর। ভক্তদের সঙ্গে রসালাপ। কিন্তু পেনেটিতে পৌঁছনো মাত্র তিনি সবেগে গাড়ি থেকে নেমে কীর্তনের

দলের ভেতর মিশে গেলেন। নৃত্যের দলের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে সমাধিস্থও হচ্ছেন। তাঁকে দেখে সবাই ভাবছে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু আজ এই পরমপুরুষের শরীরে আবির্ভূত হয়েছেন।

কীর্তনের পর ভক্তদের নিয়ে তিনি মণি সেনের বৈঠকখানায় এলেন। একটু বিশ্রামের পর মণি সেন ও তাঁর গুরুদেব নবদ্বীপ গোস্বামী ঠাকুরকে প্রসাদ দিলেন, ভক্তরাও সকলে প্রসাদ পেল।

দেখতে দেখতে দুপুর গড়িয়ে গেল। তখনো মণি সেনের বৈঠকখানা ঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ বসে রয়েছেন। মণি সেন তাঁর গাড়িভাড়া দিতে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'গাড়িভাড়া ওরা কেন নেবে? ওরা রোজগার করে। নবদ্বীপ গোস্বামী অবসর পেয়ে ওর কাছে এসে বসলেন। ভগবান বিষয়ক আলাপ শুরু হল। ঠাকুর তাঁকে বললেন 'ভক্তি পাকলে ভাব; তারপর সেই ভাব হল মহাভাব, মহাভাব থেকে প্রেম—প্রেম থেকে তাঁকে লাভ। গৌরাঙ্গের মহাভাব-প্রেম। এই প্রেম একবার হলে হঠাৎ ভুল হবেই; এমন কি এত প্রিয় নিজের দেহও ভুল হয়ে যায়। গৌরাঙ্গের এই প্রেম হয়েছিল। সামনে সমুদ্র দেখে তিনি যমুনা ভেবে ঝাঁপ দিয়েছিলেন। জীবের শুধু ভাব—মহাভাব বা প্রেম তদের উপলব্ধির বাইরে। গৌরাঙ্গের তিনটি অবস্থা হত, আপনি কি বলুন?'

নবদ্বীপ গোস্বামী বললেন, 'ঠিক বলেছেন, অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্য দশা আর বাহ্য দশা।'

'অন্তর্দশায় তিনি সমাধিস্থ থাকতেন।' ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন। অর্ধবাহ্য দশায় শুধু নাচতেন। বাহ্য দশায় করতেন হরিনাম-কীর্তন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ যেন নিজের কিছু কিছু অবস্থাকেও প্রকারান্তরে বলে চলেছেন। ভক্তরা ভাবছে—তাই তো! এঁরও তো এমন হয়। তবে কি ইনি সেই মহিমান্বিত অবতার থাকের—!

নবদ্বীপ গোস্বামীর ছেলে এসে ঠাকুরকে প্রণাম করল। নবদ্বীপ

বললেন, 'ও ঘরে শাস্ত্র পড়ে। এদেশে তো বেদ একরকম অমিলই ছিল। ম্যাক্সমুলার ছেপে ছিলেন তাই যা হোক লোকে পড়েছে।

'বেশি শাস্ত্র পাঠ ক্ষতি করে।' ঠাকুর তাঁর অভিমত বললেন। 'শাস্ত্রের সার জানতে হয় তারপর আর গ্রন্থের প্রয়োজন কি! সারটুকু জেনে ঈশ্বর লাভের জন্য ডুব দিতে হয়। বেদান্তের সার মা আমায় জানিয়ে দিয়েছেন। ব্রহ্ম সত্য আর জগৎ মিথ্যা। গীতার সার দশ-বার গীতা বললে উল্টে যা হয়। অর্থাৎ ত্যাগী ত্যাগী।'

'ত্যাগী ঠিক হয় না, তাগী হয়।' নবদ্বীপ গোস্বামী বলছেন, 'তাহলেও সেই মানে, ত্যাগ আর তাগীতে—তফাৎ নেই।'

ঠাকুর বললেন, 'গীতার সার মানে, হে জীব সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে ভগবানের জন্য সাধনা করো। যাতে তাঁকে পাওয়া যায়।'

'কিন্তু ত্যাগ করবার মন হচ্ছে কই?' নবদ্বীপ গোস্বামী বলে উঠলেন।

'আপনারা গোস্বামী, আপনাদের রয়েছে ঠাকুর সেবা—সংসার ত্যাগ করলে চলবে না। তাই আপনারা মনে মনে ত্যাগ করবেন। লোকশিক্ষার জন্য তিনিই আপনাদের রেখেছেন। যোগ ভোগ। আপনাদের দুইই রয়েছে। এখন শুধু ঐকান্তিক প্রার্থনা, হে ঈশ্বর তোমার মায়ার ঐশ্বর্য আমি চাই না—আমি তোমাকে চাই। তিনি তো সব বস্তুতে রয়েছেন। তবু ভক্ত কাকে বলে—যিনি তাঁতে রয়েছেন; যার মন প্রাণ আত্মা সবকিছুই তাঁতে আরোপিত হয়েছে।' নিজেকে দেখিয়ে তিনি বলছেন, 'আমার এই যে অবস্থাটা হয়, অনেকেই বলে রোগ, আমি বলি যার জ্ঞানে পৃথিবী জ্ঞানময় তাঁর কথা ভাবলে কেউ কি অজ্ঞান হয়?'

মণি সেন অভ্যাগতদের দক্ষিণা দিচ্ছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে পাঁচ টাকা দিতে গেলেন। ঠাকুর নিলেন না। তিনি মণিকে গুরুর দিব্যি দিলেন। মণি তবুও সন্দেশ খাবার নাম করে রাখালের হাতে টাকা দিলেন।

তাই দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'গুরুর দিব্যি দিয়েছি আমি অতএব আমি খালাস। টাকা রাখাল নিয়েছে সে এখন বুঝুকগে।'

পথেই মতি শীলের ঠাকুরবাড়ি। ঠাকুরবাড়িতে ভক্তদের নিয়ে তিনি নামলেন। পুবদিকে বিরাট ঝিল। ঝিলের মধ্যে মাছ রয়েছে। তাই দেখতে নিয়ে গেলেন সবাইকে। ঠাকুর সেই সব মাছদের দেখিয়ে মহেন্দ্র গুপ্তকে বলছেন, 'এই দেখ কি সুন্দর মাছগুলি। এ রকম চিদানন্দ সাগরে এই মাছের মতো আনন্দে ঘুরে বেড়াও।'

আবার দক্ষিণেশ্বর। সেই পরিচিত ঘর। ভক্তদের নিয়ে ঠাকুর বসে রয়েছেন। মণি এসেছেন। তিনি মেজেতে বসে। খাটের ওপর শ্রীরামকৃষ্ণ। দুজনে কথা বলছেন। ভগবানের পথে থেকেও যারা স্ত্রী সঙ্গ করে তাদের প্রতি তিনি রাগ ও ঘৃণা প্রকাশ করছেন। বলছেন, 'লজ্জা করে না। ছেলে হয়ে গেছে। তবুও স্ত্রীসঙ্গে ঘৃণা হয় না। পশুর মত আচরণ। যে শরীর থাকবে না, সেই দেহ নিয়ে আনন্দ! লজ্জা হয় না!'

মণি চুপ। মুখে কথাটি নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলছেন, 'তাঁর প্রেমের এক ফোঁটা পেলে কামিনী কাঞ্চন সব তুচ্ছ হয়ে যায়। মিছরির পানা পেলে চিটেগুড়ের পানা বিস্বাদ লাগে।'

রাখাল লর্ড এরস্কিন-এর বিষয়ে স্মাইলস্ সেলফ হেলফ বইটি পড়ছেন। তাই দেখে মাস্টার মহেন্দ্র গুপ্তকে ঠাকুর জিজ্ঞেস করছেন, 'ওতে কি আছে?'

মহেন্দ্র গুপ্ত বললেন, 'এক সাহেব ফলাকাজ্ক্ষা না করে নিজের কর্তব্য কাজ করতেন। এই কথা লিখেছে। নিষ্কাম কর্ম।' ঠাকুর শুনে বললেন, 'তাহলে তো বেশ কথা। কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ হল সঙ্গে কোনো বই থাকবে না। যেমন শুকদেব। সব তার মুখে। বইয়ে শাস্ত্রে—বালিতে চিনিতে মিশেল আছে। সাধু চিনিটা নেয় বালি ফেলে দেয়। সে সার গ্রহণ করে।' শ্রীরামকৃষ্ণ কি ভক্তদের নিজের

দিকে নির্দিষ্ট করছেন এই কথা বলে! তাঁর লীলা এমনি। সহজ কথা বললেও নিজেকে সঙ্কুচিত করে রাখতেন। শুধু ইঙ্গিত! জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে যতটুকু পার বুঝে নাও।

সকালের মতো বিকেলেও তিনি ঘরে বসেছেন ভক্তদের নিয়ে। জনাই থেকে মুখুয্যে বলে একজন এসেছেন। সঙ্গে একজন শাস্ত্রজ্ঞানী ব্রাহ্ম বন্ধু।

প্রণাম করে মুখুয্যে বললেন, 'আপনাকে দেখে আজ খুব আনন্দ পেলুম।'

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'তিনি সকলের মধ্যেই রয়েছেন। সবার ভিতর সেই এক সোনা। কোথাও বেশি প্রকাশ, আবার সংসারে সোনা অনেক সময় মাটি চাপা।'

মুখুয্যে এবার হেসে প্রশ্ন করলেন, 'ঐহিক আর পারত্রিকে তফাৎ কি?'

শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রশ্নের জবাব দিলেন, 'সাধনার সময় নেতি নেতি করে ত্যাগ করতে হয়। তাঁকে পেলে বোঝা যায় সমস্ত কিছুই তিনি! যখন রামের বৈরাগ্য হল তখন দশরথ বশিষ্ঠের কাছে গিয়ে রামকে নিরস্ত করতে বললেন। বশিষ্ঠ রামের কাছে গেলেন। দেখলেন তীব্র বৈরাগ্যে রামচন্দ্র বিমনা। বশিষ্ঠ তাঁকে বললেন, তুমি সংসার ত্যাগ করবে কেন? তাঁকে বাদ দিয়ে কি সংসার? আগে আমাকে বোঝাও। রাম দেখলেন, সত্যিই সেই পরব্রহ্ম থেকেই সংসারের উৎপত্তি। বাধ্য হয়ে তিনি চুপ করে রইলেন। যেমন যে জিনিস থেকে ঘোল আবার তা থেকেই মাখন। তখন ঘোলেরই মাখন আবার মাখনের ঘোল, অনেক কষ্টে মাখন তুললে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করলে, তখনও দেখা গেল মাখন থাকলেই ঘোল আছে। যেখানে মাখন সেখানেই ঘোল। ব্রহ্ম আছেন এ বোধ থাকলেই জীব জগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্বও আছে মানতে হবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ মুখুয্যেকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা ধনী তবুও ঈশ্বরকে ডাকছ—এটা খুবই ভাল। গীতায় আছে যারা যোগভ্রষ্ট তারাই ভক্ত হয়ে ধনীর ঘরে জন্মায়। তিনি মনে করলে জ্ঞানীকে সংসারেও রাখতে পারেন। তিনি ইচ্ছাময়—তাঁর ইচ্ছাতে এই জীবজগৎ।'

মুখুয্যে হেসে বললেন, 'তার আবার ইচ্ছা কি! তাঁর কি কিছুর অভাব আছে?'

হাসলেন শ্রীরামকৃষ্ণও। 'তাতেই বা দোষ কি? জল স্থির থাকলেও জল। আবার ঢেউ হলেও সেই জল। সাপ চুপচাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ আবার এঁকেবেঁকে চললেও সাপ। বাবু যখন চুপচাপ বসে তখনো যে ব্যক্তি আবার তার কাজের মধ্যেও সেই ব্যক্তি। জীব জগৎকে বাদ দেবে কেমন করে। তবে তো ওজনে কম হয়ে যায়। বেলের খোলা বীচি বাদ দিলে তার পুরো ওজন পাওয়া যায় না। ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। বায়ু নির্লিপ্ত যদিও তাতে দুর্গন্ধ ভেসে বেড়ায়। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। সেই আদ্যাশক্তিতেই জীবজগৎ হয়েছে।'

মুখুয্যে জানতে চাইলেন, 'লোকে কেন যোগভ্রষ্ট হয়?'

উত্তরে ঠাকুর একটি ছড়া বললেন, 'গর্ভে ছিলাম যোগে ছিলাম, ভূমে পড়ে খেলাম মাটি, ওরে ধাত্রী কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ী কিসে কাটি। কামিনী কাঞ্চনই সেই মায়া। এ দুটোকে মন থেকে তাড়াতে পারলেই যোগ। আত্মা-পরমাত্মা হল গিয়ে চুম্বক, জীবাত্মা হল ছুঁচ—তিনি টেনে নিলেই যোগ। কিন্তু ছুঁচের গায়ে মাটি মাখান থাকলে চুম্বক তা টানবে না। পরিষ্কার করে দিলেই টানবে। এই কামিনী কাঞ্চন সাফ করতে হবে।'

'কি ভাবে তা সাফ করা যায়?' মুখুয্যে জানতে চাইলেন।

'তাঁর জন্য আকুল হয়ে কাঁদ। সেই অশ্রুতে মাটি ধুয়ে যাবে—যখন একদম পরিষ্কার হবে তখনই চুম্বকে ধরবে। তবেই যোগ হবে।'

ঠাকুরের কি উপমা ! কি অপূর্ব বোঝানোর ক্ষমতা।

শুনেই মুখুয্যে রোমাঞ্চিত। এভাবে তো কেউ বলে নি। কোনো শাস্ত্রে লেখে নি। কি অপূর্ব রস ! কথার কি মাধুর্য ! তিনি বলে উঠলেন, 'কি অপূর্ব বাণী।'

শ্রীরামকৃষ্ণ অমৃতময় উপদেশ দিচ্ছেন। অপরিমেয় তাঁর কথার ভাণ্ডার। তিনি বলছেন, 'সংসারী লোকের প্রয়োজন সাধুসঙ্গ। তাদের সবসময় কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে থাকতে হয়। সংসারে রোগ লেগেই আছে।'

'তা যা বলেছেন।' মুখুয্যে বললেন।

'সুতরাং তাকে বকলমা দাও, যা হয় তিনি করুন তোমার হয়ে। তুমি শুধু বেড়াল ছানার মতো ব্যাকুল হয়ে ডাক।' শ্রীরামকৃষ্ণ বোঝাচ্ছেন সমর্পণ। সর্বস্ব তাঁকে নিবেদন করতে। এমন গুরু কোথায় যিনি ভক্তকে আমমোক্তারি দিতে বলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, তাই তিনি পরমপুরুষ। ঈশ্বর প্রতিভূ—কথায় কাজে সরলতায় বিশ্বাসে তাই প্রমাণ করে গেছেন।

মুখুয্যেরা যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। ঠাকুরও উঠলেন ওঁদের সম্মান দেখাবার জন্য। তাই দেখে মুখুয্যে বললেন, 'আপনার আবার ওঠাবসা !'

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসলেন বালকের হাসি। স্নেহসিক্ত ভালবাসা ঝলকিত। 'ওঠাবসাতেই বা লোকসান কি ! স্থির থাকলেও জল—আর হেললে দুললেও জল।'

মণি এতক্ষণ একান্তে ভাবছিলেন। তাঁর মনে বেদান্ত দর্শন সার ঘুরে বেড়াচ্ছে। সবকিছু স্বপ্নবৎ। তাই ভাবছেন তাহলে এ জগৎ কি মিথ্যা ! মণি তাঁর সংশয় জ্ঞাপন করে বললেন, 'এ জগৎ কি মিথ্যে ?'

'মিথ্যে কেন ?' ভগবানরূপী গুরু উত্তর দিলেন, 'ওসব বিচারের কথা।' একটু থেমে বললেন, 'দেখ যার অটল আছে তার টলও

আছে। আমি যায় না। যতক্ষণ আমি ঘট থাকে ততক্ষণ জীবজগৎও থাকে। তাঁকে পেলে দেখা যায় তিনিই জীবজগৎ হয়ে আছেন। শুধু বিচারে হয় না। মা আমায় কালীঘরে দেখিয়ে দিলেন যে মা-ই মা হয়েছেন। ঘরের সবকিছু চিন্ময়। দেখতে পেলাম ঘরের ভেতর সবকিছু সচ্চিদানন্দ রসে ডুবে আছে। কালীঘরের সামনেই একজন দুষ্ট লোক কিন্তু তার ভেতরেও জ্বলজ্বল করছে মার শক্তি। তাই তো বেড়ালকে ভোগের লুচি খাইয়ে দিলাম। মা-ই বেড়াল হয়েছে দেখতে পেলাম। তবে মন থেকে ভগবান যদি আমি একেবারে পুঁছে দেন তবে কে কি হয় তা মুখে বলা সম্ভব নয়। রামপ্রসাদের কথায়, তখন তুমি ভাল কি আমি ভাল সে তুমিই বুঝবে। সে অবস্থা আমার মাঝে মাঝে হয়।'

পরের দিন মণি প্রণাম করে বসতেই বললেন, 'কথাটা হল সচ্চিদানন্দ প্রেম। কামিনীকাঞ্চনে মন থাকলে হবে না। কামিনীর সঙ্গে রমণে যে সুখ তার চেয়ে কোটি গুণ আনন্দ হয় ঈশ্বরকে দেখলে। গৌরী বলত মহাভাব হলে দেহর লোমকূপের ছিদ্র পর্যন্ত মহাযোনি হয়ে যায়। গুরুর জ্ঞান পরিপূর্ণ হলে তবেই তিনি পথ দেখিয়ে দিতে পারেন।'

পূর্ণজ্ঞানী গুরু বলতে তিনি কাকে বোঝাচ্ছেন। যার স্বভাব বালকের ন্যায়। যিনি সবকিছু জয় করে সমস্ত শাস্ত্রের সার টুকু নিয়ে বসে আছেন। নিজে সচ্চিদানন্দ রসে ভাসছেন। ভাসাচ্ছেন তরুণ নবীন উজ্জ্বল একদল ভক্তবৃন্দকেও।

'ত্রিগুণাতীত ভক্তি কাকে বলে?' মণি প্রশ্ন করলেন।

'যে ভক্তি হলে সব চিন্ময় দেখা যায়। এ ভক্তি খুব কম মানুষের হয়।'

মধু ডাক্তার হেসে বললেন, 'অর্থাৎ ভক্ত কোনো গুণের বশ নয়।'

হেসে বলে উঠলেন ঠাকুর, 'ঠিক! যেমন পাঁচ বছরের বালক—

কোনো গুণের বশ নয়।'

অন্য এক সময়ে ঠাকুরের কাছে মণি রয়েছেন। তিনি মণির প্রতি বললেন, 'কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ছাড়া কিছু হবে না।'

'কেন!' মণি বলে উঠলেন, 'বশিষ্ঠদেব তো রামচন্দ্রকে বলেছিলেন, 'রাম, সংসার যদি ভগবান বাদে হয় তো তুমি সংসার ত্যাগ করো।'

শ্রীরামকৃষ্ণ সামান্য হাসলেন। 'সে রাবণ বধের জন্য। তাই রাম সংসারেও রইলেন বিয়েও করলেন!'

'আজ্ঞে নিরাকার সাধন কি করা যায় না?' মণির প্রশ্ন।

'হবে না কেন?' শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন। 'তবে ও পথ খুব শক্ত, এ সাধনে বিষয় বুদ্ধির একটু লেশ থাকলেও হবে না। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ থেকে মনকে সরাতে হবে। তবে আত্মা শুদ্ধ হবে। বিষয় চিন্তা মনকে নিমীলিত হতে দেয় না। বিষয় বুদ্ধি বোধ একেবারে ত্যাগ হলে স্থির সমাধি হয়। এই রকম সমাধিতে আমার দেহত্যাগ হতে পারে কিন্তু ভক্তি ভক্ত নিয়ে খানিক থাকবার ইচ্ছে রয়েছে। আর এক হল উন্মাদ সমাধি। ছড়ানো মন একত্র করে নিয়ে আসা। এ সমাধি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। বিষয় চিন্তা এসে ভেঙে দেয়। বিষয়ী লোকদের এক একবার সমাধি হতে পাবে। সূর্য উঠলে পদ্ম ফোটে। যদি সূর্য মেঘে ঢাকা পড়ে তবে পদ্ম বুজে যায়। বিষয় হল মেঘ।'

মণি পর পর কদিন দক্ষিণেশ্বরেই বাস করছেন। মনের সমস্ত সন্দেহ ধুয়ে মুছে নিচ্ছেন। অবাক হয়ে দেখছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে আর ভাবছেন ঠাকুর যা যা বলেন, তিনি নিজেই কি সেই অবতার! ভক্ত বাঞ্ছাকল্পতরু হয়ে শরীর ধারণ করে আছেন। উপরে উঠেও নিচে নেমেছের লোকশিক্ষার জন্য। না হলে এমন ক্ষমতা কার। এমন রসিক সে হতে পারে যে সচ্চিদানন্দ রসে সর্বদা ভাসছে!

মণির কাছে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি

বললেন, নিরাকারও সত্য, সাকারও সত্য। ন্যাংটা আমাকে উপদেশ দিত সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম কেমন। যেমন অনন্ত অসীম জল। চারিদিকে জলময়। জল স্থির—কার্য হলে তবেই ঢেউ। সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয় এ সব হল কার্য। সে বলত, বিচার করতে গিয়ে ব্রহ্ম থেমে যায়। যেমন কর্পূর জ্বাললে পুড়ে যায় নিঃশেষে—কোনো অবশিষ্ট ছাই থাকে না। দেখ, যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। ঈশ্বরলীলা, দেবলীলা, নরলীলা ও জগৎলীলা। নরলীলা কি জান? যেমন ধরো ছাদের বড় নল দিয়ে হুড় হুড় করে জল পড়ছে। তাঁরই শক্তি একটি প্রণালী দিয়ে—নলের ভেতর দিয়ে আসছে। নরলীলায় অবতার। এই অবতারকে সবাই চিনতে পারে না।'

মণির সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টে শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন, 'আচ্ছা আমাকে তোমার কি মনে হয়? অনেকে অনেক কিছু বলে। সেজবাবু বলে, বাবা তোমার মধ্যে এক ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছু নেই। আমাকে আরো একবার আসতে হল। তাই যারা ঘিরে আছে তাদের জ্ঞান দিচ্ছি।' কথা বলতে বলতে হেসে ফেললেন, 'তোমাদের যদি সব জ্ঞান দিয়ে দি তাহলে আর সহজে কাছে আসবে কেন!'

মণিকে তিনি পুনরায় সেই ছাগলের কাছে পালিত ঘাস খাওয়া বাঘের গল্প বললেন। যাকে একদিন সত্যি বাঘ এসে নিয়ে গেল। ছাগলেব মতো ঘাস খাওয়াকে তিনি বললেন কামিনীকাঞ্চন নিয়ে থাকা। 'ভ্যা ভ্যা করে ডাকা আর পালানো হল সামান্য জীবের আচরণ করা, বাঘের সঙ্গে চলে যাওয়ার মানে গুরু যিনি জ্ঞান দিলেন তার শরণাগত হওয়া, তাঁকেই নিজের বলে চেনা, সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্বরূপ আবিষ্কার করা।'

মণি মন্ত্রমুগ্ধ। এমন গুরুর কথা শাস্ত্রে নেই। শাস্ত্রের অতীত তিনি। জ্ঞানের শেষ সার। রসের সমুদ্র। রসালাপে শাস্ত্রজ্ঞান।

কঠিন বিষয়কে অপূর্ব পরিবেশন গুণে প্রাঞ্জল করা—ঈশ্বর নিজে ছাড়া কি শুধু মানুষে এমন প্রকাশ হয় !

সুরেন্দ্রকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন বললেন, 'দেখ তোমাদের যোগও আছে, ভোগও আছে। ব্রহ্মর্ষি দেবর্ষি রাজর্ষি। ব্রহ্মর্ষি যেমন শুকদেব—কাছে একখানাও বই নেই। দেবর্ষি যেমন নারদ ও রাজর্ষি হলেন জনক। নিষ্কাম কর্ম করেন। দেবীভক্ত ধর্ম মোক্ষ দুই-ই লাভ করে আবার অর্থ কামও ভোগ করে। তোমাকে একদিন দেবীপুত্র দেখেছিলাম। যোগ আর ভোগ দুই-ই তোমার মধ্যে আছে। তা না হলে তোমার চেহারা শুকনো হত। যাঁরা সর্বত্যাগী তাঁদের চেহারা শুকনো।'

সুরেন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন, 'বলতে পারেন ধ্যান হয় না কেন ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ উল্টে প্রশ্ন করলেন, 'তাঁকে স্মরণ মনন করো তো ?'

সুরেন্দ্র জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ তা আছে। তাকে মা মা বলে ঘুমিয়ে পড়ি।'

'বেশ ভাল কথা।' শ্রীরামকৃষ্ণ খুশি হলেন। 'স্মরণ মননটা বজায় থাকলেই হল। আর ভাবনার কিছু নেই।'

ভাবনার আবার কি ! সুরেন্দ্র মহা নিশ্চিন্ত। তাঁর ভার তো ঠাকুর নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছেন। শুধু একটু স্মরণ মনন করা। করলেই হল।

এমনি করেই তিনি ভক্তদের ঈশ্বরাভিমুখী করেছেন। যোগ্য ভক্তের জন্য নিজেই বকলমা নিয়ে নিয়েছেন। যাতে কষ্টর ভয়ে ভক্ত না পেছিয়ে যায় শুদ্ধতা থেকে। বাধা না পায় সংসারে।

ঠাকুর ভক্তদের নিয়ে বসে ষটচক্রের বিষয় বলছেন নিজের সাদামাটা সাবলীল ভাষায়। তিনি বলছেন, 'যিনি আদ্যাশক্তি তিনি সকলের শরীরের কুলকুণ্ডলিনী রূপে বিরাজমানা। যেন সাপ নিজেকে

গুটিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে। ভক্তিযোগে এই কুলকুণ্ডলিনী খুব তাড়াতাড়ি জেগে ওঠে। এটা না জাগিয়ে তুলতে পারলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। গান করে করে তাঁকে জাগাবে।'

মণি বললেন, 'একবার এসব করতে পারলে মনে আর আক্ষেপ থাকে না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ আরো বিশদ করে বলতে লাগলেন, 'তা তো বটেই। যোগের বিষয় তোমাকে মোটামুটি কিছু বলে দিতে হবে। একটা কথা জানবে, যতক্ষণ না ডিমের ভেতর ছানা বেড়ে ওঠে ততক্ষণ পাখি ঠোকরায় না। সময় হলেই ডিম ফুটে বাচ্চা বেরয়। তাহলেও খানিক সাধনার দরকার। গুরুই সব করেন তবুও শেষটা একটু সাধন করিয়ে নেন। বড় গাছ যখন কাটা হয় তখন প্রায় সবটা কাটা হলে একটু সরে দাঁড়াতে হয়। একটু পরেই গাছটা আপনিই মড়মড় করে ভেঙে পড়ে। খাল কেটে জল আনবার সময় যেখানে আর একটু কাটলেই নদীর সঙ্গে যোগ হবে সেখানে যে কাটে সে সরে দাঁড়ায়। বাকী মাটিটুকু ভিজে আপনিই পড়ে যায় আর নদীর জল খালে ঢুকে পড়ে। অহঙ্কার মানুষের উপাধি, তাকে ত্যাগ করতে পারলেই ভগবৎ দর্শন সম্ভব। একটু খাটতে হবে। খাটলেই তাঁর দর্শন ও আনন্দলাভ। কোনো এক স্থানে সোনার কলসী আছে শুনে মানুষ ছুটে গিয়ে সেই জায়গা খুঁড়তে শুরু করে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খুঁড়তে থাকে। অনেক খোঁড়ার পর এক জায়গায় কোদালের ঠন করে শব্দ হলেই সে কোদাল ফেলে দেখে কলসী বেরিয়েছে কিনা। কলসী দেখে আনন্দে নাচতে থাকে। কলসী তুলে মোহর ঢালে, হাতে করে গোনে—তখন তার আনন্দ দেখে কে! একে বলে দর্শন স্পর্শন সম্ভোগ! বুঝলে কেমন।'

মণি হাসলেন, 'হ্যাঁ বুঝেছি।'

'আমার যারা নিজের লোক তাদের বকলেও ফের আসবে। এই

যে নরেন্দ্র ! আঃ কি স্বভাব ওর। আগে মা কালীকে যা ইচ্ছে তাই বলত। বিরক্ত হয়ে একদিন বলেছিলাম, 'শালা তুই আর এখানে আসিস না। এই কথা শুনে সে উঠে গিয়ে তামাক সেজে আনে। নিজের জনকে তিরস্কার করলেও রাগে না। কি বল ?'

মণি উত্তর দিলেন, 'তা ঠিক।'

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রর ভাব বর্ণনা করছেন, 'নরেন্দ্র স্বভাবসিদ্ধ—নিরাকারে ওর নিষ্ঠা।'

'যখন আসে তখন একটা কাণ্ড বাধায় সে।' মণি বললেন নরেন্দ্র সম্পর্কে।

আনন্দে শ্রীরামকৃষ্ণ হাসতে থাকেন। বলেন, 'তা যা বলেছ, একটা কাণ্ডই বটে।'

মণি একদিন বাগানে বেড়াচ্ছেন। এমন সময় একজন ভক্ত তাঁকে এসে বলল, 'ঘরে ঠাকুর আপনাকে ডাকছেন।' ডাক শুনে মণি ঘরে এসে প্রণাম করে মেজেতে বসে পড়লেন। কলকাতা থেকে রাম কেদার অনেকে এসেছেন। তাদের সঙ্গে বেদান্তবাদী এক সাধু। সাধুর সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ খুশি মনে আলাপ করছেন। নিজের কাছে তাঁকে বসিয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ সব তোমার কেমন লাগে ?'

'আমার কাছে সব স্বপ্নবৎ।' বেদান্তবাদী সাধু উত্তরে বললেন।

'ব্রহ্ম সত্য আর জগৎ মিথ্যা ? এই তো ?' শ্রীরামকৃষ্ণ আবার প্রশ্ন করলেন, 'বেশ সাধুজী তা ব্রহ্মের রূপ কি ?'

'শব্দই ব্রহ্ম—অনাগত শব্দ।'

'কিন্তু জীব শব্দের একটা প্রতিপাদ্য তো আছে, কি বলো ?' শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করলেন।

সাধু তার উত্তর দিলেন 'বাচ্য ভি ওই হ্যায়—ঈশ্বর ভি ওহী।'

এই কথা শুনেই ঠাকুরের সমাধি হয়ে গেল। স্থির চিত্রার্পিত।

তিনি বসে আছেন। সাধু আর অন্য ভক্তরা হতবাক হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখছেন। কেদার তখন সাধুকে বললেন, 'এই দেখ জী ইসকো সমাধি বোলা যাতা হ্যায়।'

সাধু শুধু বইতে সমাধির কথা পড়েছেন। কখনো চাক্ষুস দেখেন নি। ভাবের ঘোরে কথা বলছেন ঠাকুর। সাধু বিস্ময়পূর্ণ নয়নে তাই দেখছেন। তিনি সমাধি থেকে ফিরে আবার সাধুর সঙ্গে কথা বলছেন। আর সোহহং উড়ায়ে দেও। আর হাম তোম বিলাস, যতক্ষণ আমি তুমির বিনাশ হয়নি ততক্ষণ মাও রয়েছেন।'

সাধু চলে গেল নতুন এক অভিজ্ঞতা নিয়ে। এ কে? কি এঁর পরিচয়!

সাধু চলে গেলে ভক্তদের হেসে জিজ্ঞেস করলেন রামকৃষ্ণ, 'সাধুকে কেমন দেখলে?'

'ও শুকনো হাঁড়ি মাত্র—সবে চড়েছে—এখনো চাল পড়ে নি' কেদার বলে উঠলেন।

'তা হতে পারে।' কেদারের কথা মেনে নিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'তাহলেও লোকটি ত্যাগী। সংসাব ত্যাগ করেছে। যে সংসার ত্যাগ কবে সে অনেকটা এগিয়ে যায়। সাধুও এগিয়েছে।'

কালীঘরে ঢুকে মাকে প্রণাম করছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সাধুটি এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। সেও বার বাব মাথা নিচু করে মাকে প্রণাম করছেন, তাই দেখে ঠাকুর বললেন, 'জী দর্শন ক্যায়সা হ্যায়?'

সাধু এবার ভক্তিভরে বলল, 'কালী প্রধানা হ্যায়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বললেন, 'কালী আর ব্রহ্ম অভেদ; কেমন জী?'

সাধু এবার বিশদ জবাব দিলেন, 'যতক্ষণ মনের মুখ বাইরে—ততক্ষণ কালী মানতে হবে।' দুজনে কথা বলতে বলতে ঘরে ফিরলেন। ঠাকুর মণিদের সাধুর কালীকে প্রণাম করা

দেখালেন।'

মণি ও বলরামকে আলাদা করে বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'হলধারীর জ্ঞানীর ভাব ছিল। সে দিনরাত অধ্যাত্ম উপানন্দ পড়ত। এদিকে সরকারের কথায় মুখ ঘুরিয়ে নিত। এমনি ছিল ওর বুদ্ধি।' বলরামরা উপদেশ আর আশীর্বাদ নিয়ে চলে গেলেন।

ঘরে বসে শ্রীরামকৃষ্ণ। মণিকে বেশি বিচার করতে বারণ করেছেন তিনি। রাখালের প্রতি উদ্দেশ্য করে বললেন, 'বেশি বিচার করা মোটেই ভাল নয়। আগে ঈশ্বর পরে তাঁকে—তাহলেই ঈশ্বর নিজেই তাঁর জগৎ দেখিয়ে দেবেন। বাল্মিকীকে ঋষিরা মরা মরা জপ করতে বলেছিলেন। এর একটা আলাদা মানেও আছে। তা হল ম-অর্থে ঈশ্বর রা-মানে জগৎ। আগে ভগবান পরে জগৎ। তাই বাল্মিকীর মতো মরা বলে গোপনে অশ্রু বিসর্জন করতে হবে। আগে তাঁর দেখা পেতে হবে, পরে বিচার করো শাস্ত্রপাঠ করো। মণিকে বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'দেখ বেশি বিচার করো না। তাতে ক্ষতি হবে। শেষে হাজরার মতো হয়ে যাবে। এক একদিন রাত্রে তাই মাকে কেঁদে আমি বলতাম মা বিচার-বুদ্ধির মাথায় বজ্রঘাত দাও। ভক্তিতেই সব পাওয়া যায়। তাঁর দয়া থাকলে জ্ঞানের অভাব কি, ধান মাপার সময় যেই রাশ ফুরোয় অমনি অন্য একজন রাশ ঠেলে দেয়। মা তেমনি জ্ঞানের রাশ ঠেলে দেন।'

ভক্তিতত্ত্ব বোঝাচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ঈশ্বরকে পাওয়ার সহজতম পথ। মণিকে তিনি উপদেশ দিচ্ছেন এই ভক্তির আশ্রয় নিতে। 'ভক্তিতেই সব হয়।' ঠাকুর বলছেন, 'তাকে ভালবাসলে আর কিছুরই অভাব হয় না। একটা গল্প শোন। মা ভগবতীর কাছে দু ভাই কার্তিক গণেশ বসে। ভগবতীর গলায় মণিময় রত্নমালা। তিনি দুই ছেলেকে বললেন, তোমাদের মধ্যে আগে যে ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসবে তাকে আমি এই হার দেব। কার্তিক কথাটা শুনেই তাঁর ময়ূরে চেপে বেরিয়ে

পড়লেন। গণেশ তখন ধীরে ধীরে মাকে প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করলেন। গণেশ মার ভিতরেই যে ব্রহ্মাণ্ড তা জানতেন ফলে তিনি হার পেলেন। মাকে কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করেছিলাম বেদে পুরাণে কি আছে তা আমাকে জানিয়ে দাও। মা ক্রমে ক্রমে আমাকে তা জানিয়েছেন। বিচার করে গভীর কথা জানা যায় না। তিনি যখন দেখাবেন তখন কোনো জ্ঞানের অভাব থাকবে না।'

অন্য একদিন মণিকে ডেকে বলছেন, 'তোমরা কি রকম ধ্যান করো আমি বেলতলায় নানারূপ দেখতে পেতাম। একদিন দেখলাম সামনে টাকা শাল এক সরা সন্দেশ সহ দুজন মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে। মনকে জিজ্ঞেস করলাম, তুই কি এসব চাস? সঙ্গে সঙ্গে সন্দেশ দেখতে পেলাম গু, সেই মেয়ে দুজনের ভেতর পর্যন্ত দেখলাম, নাড়ী ভুঁড়ি মলমূত্র হাড় মাংস রক্ত। মন কিছুই চাইল না। তাই বলছি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করলে হবে না। আমি তিন ত্যাগ করেছিলাম, জমিন জরু টাকা। সন্ন্যাসীর সঞ্চয় করতে নেই। অন্নদানের চেয়ে জ্ঞানদান ভক্তিদান আরো মহৎ। শ্রীচৈতন্য আচণ্ডালে ভক্তি বিলিয়েছিলেন। 'যাঁরা তাঁকে পায় তাঁরা জানে দেখাতেই স্বাধীন ইচ্ছা— আসলে তিনিই যন্ত্রী, আমি যন্ত্র ; তিনি ইঞ্জিনীয়ার আমি গাড়ি।'

অন্য এক সময় মণিকে তিনি বললেন, 'শ্রীকৃষ্ণ মথুরা যাবার পর যশোদা শ্রীমতীর কাছে যান। শ্রীমতী তখন ধ্যানমগ্না। তিনি তখন যশোদাকে কিছু বর দিতে চান। যশোদা উত্তরে বললেন, বর আর কি দেবে, এই বর দাও, মনপ্রাণ দিয়ে যেন তাঁর সেবা করতে পারি। যেন এই চোখে তাঁর ভক্তের দর্শন হয়—তবে যাদের খুব পাকা হয়ে গেছে তাদের ভক্ত না হলেও চলে। অনেক সময় ভক্ত ভাল লাগে না। পঙ্খের কাজের ওপর চুনকাম ফেটে যায়। অর্থাৎ যাদের ভেতর বাইরে সর্বত্র ভগবান তাদের এই অবস্থা হয়।'

মন্দিরে আরতি হয়ে গেল। ঠাকুরঘরে শ্রীরামকৃষ্ণ বসে। সঙ্গে

মণি রয়েছেন। হঠাৎ ঠাকুর সমাধিস্থ হলেন। একটু বাদেই সমাধি ভাঙল। তখনো ভাবে মন পরিপূর্ণ—ভাবের ঘোরে মার সঙ্গে কথা বলছেন ঠাকুর। 'মা বিশ্বাস চাই, যাক শালার বিচার। সাত চোনার বিচার এক চোনায় যায়। বিশ্বাস চাই। ছেলেমানুষের মতো বিশ্বাস।' কথা বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন, কাঁদতে কাঁদতে বলছেন, 'মা তোর কাছে যারা আসছে তাদের মনের ইচ্ছা পূর্ণ কর। সব ত্যাগ করাস না মা। আচ্ছা শেষে যা হয় করিস—।'

সিঁথিতে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বেণী পালের বাগানে। ব্রহ্ম-সমাজের ছ মাসেব উৎসব হবে। বহু ব্রাহ্মভক্ত হাজির। ব্রাহ্মভক্তদের সঙ্গে ঠাকুরের আলাপ চলছে। ধর্মকথায় তিনি ক্লান্তিহীন। একজন ভক্ত তাঁকে কাছে পেয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে উপায় কি ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ সেই জবাবটিই দিলেন, 'উপায় অনুরাগ। যার মানে ভগবানকে ভালবাসা। ভালবাসার সঙ্গে চাই প্রার্থনা।'

'অনুরাগ না প্রার্থনা ?'

'দুটোই। আগে অনুরাগ তারপর প্রার্থনা।' শ্রীবামকৃষ্ণ বুঝিয়ে দিচ্ছেন তাঁর সেই অননুকরণীয় উপমা দিয়ে। 'প্রার্থনা আর নাম-গুণগান সবসময়েই করতে হয়। পুরনো ঘটি রোজ মাজতে হয়—একবার মাজলে কি হবে ? বিবেক বৈরাগ্য, এই সংসার অনিত্য এ বোধকে জাগাতে হবে।'

ব্রাহ্মভক্ত বললেন, 'সংসার ছেড়ে যাওয়া কি ভাল ?'

'সকলের জন্য নয়—' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'যাদের ভোগের আশ মেটেনি তাদের জন্য সংসার ত্যাগ নয়।'

'তারা তাহলে সংসার করবে ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন, 'করবে। তারা নিষ্কাম কাজ করে যাবে। হাতে তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙবে। এর নাম হল ত্যাগ। তোমাদের

ত্যাগ হবে মনে। সন্ন্যাসীর দু রকম ত্যাগই করতে হবে—মনে ও বাইরে।'

'ভোগান্ত কি জিনিস?'

'কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি। এই আসক্তির শেষ না হলে ঈশ্বরের জন্য আকুলতা জন্মায় না।'

'সংসারে মেয়েরা খারাপ না পুরুষরা?'

'বিদ্যারূপিনী স্ত্রী অবিদ্যারূপিনী স্ত্রী সংসারে দুরকম স্ত্রীই আছে। বিদ্যারূপিনীরা পুরুষকে ঈশ্বরের দিকে চালনা করে। অবিদ্যারূপিনীরা ভগবান ভুলিয়ে দেয়—সংসার ডুবিয়ে ছাড়ে।' শ্রীরামকৃষ্ণ গূঢ়তত্ত্ব ব্যক্ত করছেন সহজতম ভাষায়। 'তার মহামায়াতেই এই জগৎ সংসার তৈরি হয়েছে। বিদ্যামাযা যদি আশ্রয় করো তো সাধুসঙ্গ ভক্তি ভালবাসা জ্ঞান বৈরাগ্য এসব হয়। আবার অবিদ্যামায়াতে ইন্দ্রিয় ভোগের ব্যবস্থা; অবিদ্যামায়া মানে পঞ্চভূত আর ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল, রূপ রস শব্দ গন্ধ স্পর্শ। এসব ঈশ্বর ভুলিয়ে দেয়।'

ব্রহ্মভক্ত তখন প্রশ্ন করলেন, 'অবিদ্যা যদি মানুষকে জ্ঞানহীন করে তাহলে তিনি অবিদ্যার সৃষ্টি করেছেন কেন?'

'এ সবই তাঁর লীলা—' শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দেন, 'অন্ধকার না থাকলে আলোর কোনো মাহাত্ম্য বোঝা যায় না, দুঃখ না থাকলে সুখের অনুভব হয় না; মন্দ-জ্ঞান যদি থাকে তবেই ভাল জ্ঞানের উপলব্ধি হয়। আরো ভেবে দেখ, আমেব খোসা আছে বলেই সে পাকে ও বাড়ে; আম তৈরি হয়ে গেলে খোসা ফেলে দেওয়া হয়। তেমনি মায়ারূপ ছাল থাকে বলেই ব্রহ্ম-জ্ঞান হয়; বিদ্যার মায়া অবিদ্যার মায়া আমের খোসার মতো। দুয়েরই যে প্রয়োজন আছে।'

'আচ্ছা বৈরাগ্য কেমন করে আসে আর সকলেরই বা আসে না কেন?' ব্রহ্মভক্ত তাঁর সমস্ত সংশয়ের সমাধান করে নিচ্ছেন এই

পরমপুরুষের কাছ থেকে। এমন করে কে আর বোঝাতে পারবে এই গুহ্য তত্ত্ব।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন, 'দেখ, ভোগের তৃপ্তি না হলে বৈরাগ্য আসে না। ছোট একটি ছেলেকে সাময়িক খাবার আর পুতুল দিয়ে ভোলানো যায় ; কিন্তু খানিক পরেই সে মা যাব বলে বায়না ধরে। তখন তাকে মার কাছে নিয়ে না গেলে সে খাবার পুতুল ফেলে দিয়ে কাঁদতে বসে।'

এক সময় উপাসনা শেষ হল। শ্রীরামকৃষ্ণ এবার আচার্যের সঙ্গে আলাপ শুরু করলেন। তিনি আচার্যকে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা সাকার নিরাকার দুই-ই সত্য, আপনার মত কি ?'

আচার্য উত্তর দিলেন, 'যেমন ধরুন নিরাকার হল বিদ্যুৎ প্রবাহ—উপলব্ধি করা যায় কিন্তু চোখে দেখা যায় না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন বললেন, 'হ্যাঁ, সাকার আর নিরাকার দুই-ই সত্য—শুধু নিরাকার বলতে কি বোঝায় জান ? যেমন ধরো রোশনচৌকির পোঁ ধরে থাকে একজন—যদিও তার বাঁশিতেও সাতটি ফুটো। অন্যজন দেখ কত রাগরাগিণী বাজায়। সেই রকম সাকারবাদীরা বহুভাবে ভগবানকে দেখে। নানারূপে তাঁর সঙ্গে সম্ভোগ করে। আসলে কথা হল তোমার কোনো রকমে অমৃত কুণ্ডে পড়া। তা সে যেভাবেই হোক—যে পড়বে সেই অমর হবে। ব্রহ্মাণ্ডের পক্ষে জল বরফ এই উপমাটাই মানানসই। অনন্ত জলরাশি যেন সচ্চিদানন্দ। ঠাণ্ডা দেশে নানা জায়গায় মহাসাগরের জল বরফ হয়ে যায়। তেমনি ভক্তি হিম লেগে সচ্চিদানন্দও সাকার রূপ গ্রহণ করেন। ভক্তের শরীর প্রেমময়—সেই চিন্ময়রূপ ভাগবতীতনু দ্বারা দেখা যায়।'

আচার্য বললেন, 'বেদান্তে এমন কথা আছে বটে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে লাগলেন, 'ভগবানের মায়ায় মানুষ স্বরূপকে

ভুলে যায়। ত্রিগুণময়ী তাঁর মায়া—যেন তিনটে ডাকাত, সেই মায়া সব হরণ করে নেয়। সত্ত্ব রজঃ তম তিনগুণ। এর মধ্যে সত্ত্ব গুণই ঈশ্বরের পথ দেখায়। কিন্তু সত্ত্ব গুণ থাকলেই ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায় না। একটা গল্প বলি তবে। একজন ধনী বনের রাস্তা দিয়ে পথ চলছিল। এমন সময় তিনজন ডাকাত তাকে ধরল। তার সব কিছু কেড়ে নিল। তখন একজন ডাকাত বলল, একে রেখে আর লাভ কি? একে মেরে ফেল। দ্বিতীয়জন বলল, মেরে দরকার কি, তার চেয়ে বেঁধে এখানে ফেলে রাখি। তাহলে ও আর পুলিশে খবর করতে পারবে না। এই বলে ওকে বেঁধে ডাকাতরা চলে গেল। কিছুক্ষণ পরেই তৃতীয় ডাকাতটি ফিরে এসে ওর বাঁধন খুলে দিয়ে বলল, তোমার বড্ড লেগেছে তাই না। চল তোমাকে পৌঁছে দি। ডাকাতটি তাকে সরকারী রাস্তার পথ দেখিয়ে নিয়ে এল। তাবপর বলল, এবার তুমি সহজে বাড়ি যেতে পারবে। সে বলল, সেকি আপনিও আমার সঙ্গে চলুন। আপনি আমার কত উপকাব করলেন। ডাকাতটি বলল, আমার যাবার উপায় নেই, তাহলে পুলিশ ধরবে। প্রথম ডাকাতটির ছিল তমোগুণ—তাই সে লোকটিকে খুন করতে চেয়েছিল। দ্বিতীয়জনের রজোগুণ—রজোগুণে মানুষ সংসারে আবদ্ধ হয়। দয়া ধর্ম ভক্তি এ সব সত্ত্বগুণ থেকে হয়। সত্ত্বগুণ হল সিঁড়ির শেষ ধাপ। তার পরেই ছাদ। ত্রিগুণাতীত না হলে ব্রহ্মজ্ঞান হয না।'

আচার্য বললেন, 'আপনার কথা কি সুন্দর!'

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসলেন। বললেন, 'ভক্তের স্বভাব কি জান? আমি বলি তুমি শোন। আবার তুমি বলো আমি শুনি। তোমরা আচার্য, কত লোককে শোনাচ্ছ—তোমরা হলে জাহাজ, আমরা সেখানে জেলেডিঙি মাত্র।'

এই কথায় সকলেই হেসে উঠল।

দক্ষিণেশ্বরের মন্দির। রবিবারের দিন প্রচুর ভক্ত আসেন ধর্ম-সংগ্রহে অমৃত কথা শুনতে। রসে বসে ঠাকুর তাদের দিনটিকে অনবদ্য সুখে ভবিয়ে দেন। তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় ভক্তদের বলছেন, 'বিদ্বেষভাব কখনোও ভাল নয়, শাক্ত বৈষ্ণব বৈদান্তিক এরা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে এটা খুব খারাপ। বর্ধমানের সভাপণ্ডিত পদ্মলোচন এমন এক ঝগড়ার বিষয়ে খুব সুন্দর কথা বলেছিলেন। শিব বড় না ব্রহ্মা বড় এর উত্তবে তিনি বলেন, শিব বা ব্রহ্মা কারো সঙ্গেই আমার আলাপ নেই—তাই আমি জানি না।' সবাই অনাবিল মজার কথায় হেসে উঠলেন।

'ব্যাকুলতা থাকলে যে ভাবেই ডাক তাঁকে পাওয়া যায়। নিষ্ঠা চাই। নিষ্ঠা ভক্তির আর এক নাম অব্যভিচারিণী ভক্তি। যেমন এক ডেলে গাছ—ব্যভিচারিণী ভক্তি হল পাঁচ ডেলে। স্ত্রী যে স্বামীব সেবা করে সেও নিষ্ঠা ভক্তি। সে দেওর ভাসুর সকলের সেবাই কবে কিন্তু স্বামীর সঙ্গে তাঁব সম্বন্ধ আলাদা। তেমনি নিজেব ধর্মে নিষ্ঠা আছে বলেই অন্যের ধর্মকে ঘৃণা করবে না। ববং তাদের সঙ্গে মধুব ব্যবহাব করবে।'

মনোহব সাঁই গোস্বামী এসে পড়লেন। তিনি কীর্তন শুরু করলেন। পূর্বরাগ-মধুর বর্ণন। শুনতে শুনতেই শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন। মহাভাবে তাঁর শরীর কাঁপছে। আঁখি নিমীলিত। তিনি এবার নিজেই সুর করে গাইছেন। গোস্বামী ঠাকুরের এই ভাব দেখে মোহিত। তাড়াতাড়ি তিনি করজোড়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলেন, 'হে প্রভু আমার বিষয় বুদ্ধি ঘুচিয়ে দিন।'

হেসে উঠলেন রসিকরাজ শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি রসিকতা করে বললেন, 'সাধু বাসা পাকড় লিয়া। তুমি এতবড় রসিক, তোমার ভিতর থেকে মিষ্টিরস যে গড়িয়ে পড়ছে।'

'প্রভু, আমি চিনির বলদ মাত্র—চিনির আস্বাদন করলাম কই?'

ঠাকুর কলকাতা যাবেন। গাড়িতে উঠছেন—উঠতে উঠতে ভক্তদের বলছেন, 'দেখ তার উপর প্রেম জমলে পাপ-টাপ সব পালিয়ে যায়। সূর্যের তাপে যেমন মেঠো পুকুরের জল শুকিয়ে যায়। বিষয়ের উপর, কামিনী কাঞ্চনের উপর ভালবাসা থাকলে এ হয় না। সন্ন্যাস করলেও না—যদি মনে লোভ থেকে যায়—যেমন থুথু ফেলে আবার থুথু গেলা।'

অধরের বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। বৈঠকখানা ঘর ভরে গেছে ভক্ততে। ঠাকুর তাদের বলছেন, 'সংসারে থাকা আর মুক্তি পাওয়া দুইই ভগবানের ইচ্ছে। তাঁর ইচ্ছেতেই অজ্ঞানতা; তিনি প্রয়োজনে ডেকে মুক্তি এনে দিচ্ছেন। ভক্তর মধ্যে ব্যাকুলতা জাগ্রত করে।'

'এই ব্যাকুলতা কি রকম?' একজন জানতে চাইলেন।

সেই রস মিশিয়ে ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'কেরানীর চাকরি গেলে যেমন ব্যাকুলতা হয়—সে যেমন ছটফট করে নতুন কাজের জন্য। গোঁফে তা দিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে যারা পান চিবোয়—যাদের কোনো চিন্তা নেই, তাদের ঈশ্বরলাভ হয় না।'

'সাধু সঙ্গে কি এ ধরনের ব্যাকুলতা বাড়ে?'

'হতে পারে। তা বলে পাষণ্ডের হৃদয় পরিবর্তন হয় না। সাধুর কমণ্ডলু চার ধাম ঘুরে এলেও যেমনকে তেমন থাকে। তার তিক্ততা যায় না।' শ্রীরামকৃষ্ণ বিশদ করে বললেন। পঞ্চভূতের অধীন শরীর —তাইতো রাম সীতার জন্য কত কেঁদেছেন। কথায় আছে, পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে।'

দক্ষিণেশ্বরে ভক্তদের কাছে নিজের কৈশোর জীবনের কথা বলছেন।

'সবাই আমাকে ভালবাসত, বিশ্বাস করত। সদাব্রত, অতিথিশালা দেখলেই সেখানে যেতুম—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখতুম। কোনোখানে রামায়ণ বা ভাগবত পড়া হলে মন দিয়ে শুনতুম। ঢং করে পড়লে তার নকল করে সবাইকে শোনাতুম। মেয়েদের ঢং বেশ বুঝতে

পারতাম। তাদের কথা সুর নকল করতুম। খারাপ মেয়েমানুষ দেখলেই বুঝতাম।' বলতে বলতে তিনি থেমে পড়লেন, বললেন, 'এ সব বিষয়ীদের কথা থাক।'

'ছেলেবেলায় পালাগান খুব গাইতাম। তাই কেউ কেউ বলত আমি কালীয়দমন যাত্রা দলে ছিলাম।'

মণিরামপুরের ভক্তরা জিজ্ঞেস করল, 'কি ভাবে ঈশ্বর লাভ হয় আমাদের তা দয়া করে বলুন।'

'একটু সাধন ভজন করতে হয় তাঁকে পাওয়ার জন্য।' ঠাকুর উত্তর দিলেন। 'দুধে মাখন আছে বললেই মাখন মেলে না। দুধকে দই করে তাকে মন্থন করলে তবে মাখন পাওয়া যায়। একটু নির্জনে থাকা দরকার। কয়েকদিন নির্জনবাস করে ভক্তিলাভের পর আবার সংসারে থাকা যায়। জুতো পায়ে থাকলে কাঁটাবনে হাঁটতেও কষ্ট হয় না। আসল কথা হল বিশ্বাস। একবার বিশ্বাস এলে আর ভয় নেই।'

একজন ভক্ত প্রশ্ন করলেন, 'ঈশ্বর পেতে গেলে কি একজন গুরুর দরকার আছে?'

'অবশ্যই আছে।' শ্রীরামকৃষ্ণ জোর দিলেন কথায়। 'তবে তাঁর প্রতি গভীর বিশ্বাস চাই। তাঁকেই ঈশ্বর জ্ঞান করতে হবে। বৈষ্ণবরা এজন্য বলে থাকে গুরু-কৃষ্ণ বৈষ্ণব। গুরু ছাড়াও চাই সৎসঙ্গ। গঙ্গার যত কাছে যাওয়া যায় তত ঠাণ্ডা হাওয়া পাওয়া যায়। আগুনের যত কাছে যাওয়া যায় তত তাপ বাড়ে। ঢিমে তেতালা লোকের দ্বারা ঈশ্বর লাভ সম্ভব নয়। সংসারে ভোগের ইচ্ছা যাদের বর্তমান তারা বলে, 'হবে, কখন না কখন ভগবানকে পাওয়া যাবে। আমি কেশবকে বলেছিলাম, ছেলেকে ব্যাকুল দেখলে তার বাপ তিন বছর আগেই তার হিস্যে ফেলে দেয়। মা রাঁধছে, কোলের ছেলে চুসি মুখে শুয়ে। যখনই সে চুসি ফেলে চেঁচিয়ে কাঁদে মা তখন হাঁড়ি নামিয়ে এসে ছেলে কোলে নিয়ে মাই দেয়। কলিতে বলে এক দিন একরাত কাঁদলেই

ভগবান দেখা দেন।

'সংসারেই থাক আর যেখানেই থাক ভগবান তোমার মনের ওপর লক্ষ্য রাখেন। ভিজে দেশলাইর মতো বিষয়ে পড়ে থাকা মন—শত ঘষলেও জ্বলতে চায় না। যারা অজ্ঞান তারা মাটির দেওয়াল ঘেরা বন্দী—ভেতরেও আলো নেই আবার বাইরেটাও তারা দেখতে পাচ্ছে না। জ্ঞানী সংসারে যেন কাচের ঘরে থাকে। তার ভেতর বার উভয় দিকেই আলো।' শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন। কোনো সংশয়ে ভক্তদের রাখতে তিনি চান না। রসের পর রসের কলসী উপুড় করছেন। 'তিনি এক ছাড়া আর কিছু নন। যিনিই ব্রহ্ম তিনিই আদ্যাশক্তি। তাহলে একটা গল্প শোন। এক রাজা এক যোগীর কাছে বলেছিল, আমায় এককথায় জ্ঞান দিতে হবে। যোগী উত্তর দিয়েছিলেন, তাই হবে। একটু বাদেই রাজার কাছে এক জাদুকর হাজির। সে এসে রাজার সামনে দুটো আঙুল ঘোরাচ্ছে আর বলছে রাজা এই দেখ, এই দেখ। রাজা অবাক হয়ে দেখছে: খানিকবাদেই সে দেখল যাদুকরের দুটো আঙুল একটা হয়ে গেছে। যাদুকর একটি আঙুল ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, রাজা এই দেখ, এই দেখ। এর মানে ব্রহ্ম আর আদ্যাশক্তি প্রথমে দুটো আলাদা মনে হয়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান হলে এক। যে একের দুই নেই। অদ্বৈতম'।

মণি মল্লিককে বোঝাচ্ছেন একদিন ঠাকুর, 'মায়া দরজা ছেড়ে না দিলে ভগবানকে দেখা যায় না। তবে তাঁর কৃপা হলে মায়ার দ্বার খুলে দেন। যেমন দারোয়ানরা বলে বাবু হুকুম দিন ওকে দরজা খুলে দি। যতক্ষণ আমি বোধটুকু রয়েছে ততক্ষণ সবই আছে। তখন স্বপ্নবৎ একথা বলা যায় না। নিচে আগুন জ্বলছে তাই হাঁড়ির ভেতরে ডাল ভাত আলু পটল সব লাফাচ্ছে। লাফিয়ে লাফিয়ে যেন বলছে আমি আছি, তাই লাফাচ্ছি। এই দেহটা হাঁড়ি, মন হল বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলি চাল ডাল আলু। তাদের অভিমান হল অহং, আমি টগবগ

করছি। আগুন হল সচ্চিদানন্দ।'

ঠাকুর রসাল ভাষায় ভাবের আবেগে বলে যাচ্ছেন, 'ঈশ্বর মায়ায় জীব-জগৎ এক দেখে। সবুজ চশমা পড়লে যেমন সব সবুজ দেখায়। গুরুর দরকার সাধনায়। জীবের একদিকে চোখ বাঁধা আবার সেই কাপড়ের ওপর পিঠে আটটা স্ক্রু আঁটা—অষ্টপাশ। লজ্জা ঘৃণা ভয় জাতি কুল শীল শোক জুগুপ্সা এইআট। গুরু না খুলে দিলে হয় না।'

বেলগরের এক ভক্ত এসব শোনার পর বললেন, 'আপনি আমাদের কৃপা করুন।'

'সকলের ভেতরই ঈশ্বর আছেন—তিনিই কৃপা করবেন।' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'যাদের ভোগ একটু বাকী তারা সংসারে থেকেই তাঁকে ডাকবে। নিতাই বলেছিলেন, মাগুর মাছের ঝোল, যুবতী নারীর কোল, বল হরিবোল।'

ঠাকুরের বলার ঢঙে সবাই হেসে উঠল। ত্যাগী এই মহাপুরুষ প্রয়োজনে উপমা দিচ্ছেন যুবতী নারীর কোল। এত সরস আর এত বাস্তব করে কে বোঝাতে পেরেছে ধর্ম তত্ত্ব!

মাস্টারকে একদিন বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'তাঁব লীলা অনন্ত—কিন্তু আমি চাই প্রেম ভক্তি। ক্ষীরটুকু শুধু আমার দরকার। গাভীর বাঁট দিয়েই ক্ষীর আসে। অবতার হল গাভীর বাঁট।'

একথার তাৎপর্য কি! তিনি কি বলতে চেয়েছিলেন, আমাকে দেখলেই তোমাদের ঈশ্বর দর্শন হবে। সেই অবতার রূপে আমি এসেছি তোমাদের মধ্যে।

'তাঁকে কি বোঝা যায়?' শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যক্ত করছেন জ্ঞান, 'তাঁর মহামায়ার মধ্যে আমাদের রেখেছেন। কখনো হুঁশে কখনো বেহুঁশে। একবার অজ্ঞান সরে যায় আবার ঘিরে ফেলে মনকে। যেমন পানাপুকুরে ঢিল মারলে খানিকটা জল দেখা যায়; আবার

একটু বাদেই পানা নাচতে নাচতে এসে সে জলটুকুকেও ঢেকে দেয়। যতক্ষণ এই দেহবুদ্ধি, ততক্ষণই জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ শোক ভোগ ; আত্মজ্ঞান হলে এসব তখন স্বপ্নের মতো। কিছুই আর থাকে না।'

একটু চিন্তা বা মননের প্রয়োজন নেই। ঠাকুর তাৎক্ষণিক উত্তর দেন সমস্ত প্রশ্নের। অবসান ঘটান সমস্ত সংশয়ের। অবতার ছাড়া এই শক্তি কি মানুষের সম্ভব ! তিনি নিজেই এক জায়গায় বলেছেন, 'অবতার লোকশিক্ষার জন্য ভক্তি আর ভক্ত নিয়ে থাকে।' অধিকন্তু তিনি রস নিয়েছিলেন। রসিক হয়ে সকলকে অমৃত দিয়েছেন। 'যেমন ছাদে উঠেও অবতার সিঁড়িতে আনাগোনা করেন। মানুষ ছাদে ওঠবার জন্য ভক্তি পথে থাকবে—যতক্ষণ না জ্ঞান হয়—মন থেকে বাসনা না মুছে যায়। সব বাসনার শেষ হলেই ছাদ পাওয়া যায়। দোকানদাব যতক্ষণ না হিসাব মেলে ততক্ষণ ঘুমায় না। হিসাব ঠিক কবে তবে তার শান্তি। জীবনের উদ্দেশ্যই হল ঈশ্বর দর্শন।'

হাসির কথার ওস্তাদ তিনি। ভক্তদের প্রাণখোলা হাসি ফোটাতে তাঁর জুড়ি নেই। বিশ্বাস কি রকম চায় সে কথা বলতে তিনি ঈশানকে বললেন, 'তোমার সেই বাচ্চা ছেলেটির ঈশ্বরকে চিঠি পাঠানোর গল্পটা বলো তো !'

ঈশান হেসে উঠলেন। সবাইকে বললেন, 'একটি ছেলে শুনল ঈশ্বরই সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। তাই সে তার প্রার্থনা জানাবার জন্য একটা চিঠি লিখে চিঠিখানি ডাকবাক্সে ফেলেছিল। ঠিকানা লিখেছিল, স্বর্গ।' গল্প শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন।

ঠাকুরও হাসলেন ভক্ত সঙ্গে। তারপর বললেন, 'দেখলে তো, একে বলে বিশ্বাস—এই বালকের মতো বিশ্বাস থাকলে তবে হয়। ঈশান এবার তোমার সেই কর্মত্যাগের গল্পটি শোনাও।'

ঈশান পুনরায় বলতে লাগলেন, 'ঈশ্বর লাভ করে সন্ধ্যাদি কর্মত্যাগ হয়ে যায়। একদিন গঙ্গার তীরে বসে সবাই সন্ধ্যা করছে শুধু একজন

করছে না। তাকে কি ব্যাপার জিজ্ঞেস করায় সে বললে, আমার অশৌচ হয়েছে সন্ধ্যা করতে নেই। মরণাশৌচ আর জন্মাশৌচ দুইই হয়েছে। অবিদ্যা মার মৃত্যু ঘটেছে সেই সঙ্গে জন্ম নিয়েছে আত্মারাম।'

শিবপুর থেকে ভক্তরা এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বললেন, 'এ জগতে ঈশ্বরই সত্য আর সব অনিত্য। ব্যাকুল হয়ে তাঁকে ডাকতে হবে। যাদের সময় আছে তারা ধ্যান ভজন করবে। যাঁরা তাও পারবে না তারা দুবেলা দুটো প্রণাম করবে। তিনি অন্তর্যামী—সব জানেন—তাই যাদের সময় নেই তারা তাঁকে বকলমা দাও। কিন্তু তাঁকে দর্শন না হলে কিছুই লাভ হবে না।'

'আপনাকে দেখলেই তো ঈশ্বর দর্শন হয়। আপনিও যা ভগবানও তাই।' একজন ভক্ত এই কথা বললেন।

তাই শুনে সঙ্গে সঙ্গে বাধা দিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, 'ছিঃ এ কথা বলতে নেই। গঙ্গারই ঢেউ হয়—ঢেউর গঙ্গা নয় তাবলে। আমি অমুক, আমি এত বড়। এই সব অহঙ্কার থাকলে তাঁকে লাভ করা যায় না। ঢিপিকে ভক্তির জলে ভিজিয়ে সমভূমি করে দাও আগে।'

ভক্ত এবার প্রশ্ন করলেন, 'কেন তিনি তাঁর মায়া দিয়ে আমাদেব সংসারে ভুলিয়া রেখেছেন?'

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিতে লাগলেন, 'তিনি যদি স্বর্গীয় সুখ একবার দেন তো কেউ আর তাহলে সংসার করবে না। তবে তো সৃষ্টিই বন্ধ হয়ে যাবে। চালের আড়তে বড় বড় ঠেকের মধ্যে চাল থাকে। পাছে ইঁদুরে ওই চাল খেয়ে ফেলে তাই দোকানদার একটা কুলোয় কিছু খই মুড়কি রেখে দেয়। মিষ্টি খই মুড়কি পেয়ে সারারাত ইঁদুরেরা তাই খায়। চালের খোঁজ নেয় না।। অথচ দেখ এক সের

চালে চোদ্দ গুণ খই হয়। কামিনী কাঞ্চন হল খই মুড়কি—তার আনন্দের চেয়ে তাহলে ভগবানের আনন্দ কত বেশি। তাঁর রূপের কথা ভাবলে রম্ভা তিলোত্তমার রূপকে চিতার ছাই বলে মনে হয়।'

'ব্যাকুলতা কেন আমাদের মধ্যে জন্মায় না?' ভক্ত জানতে চাইল।

'ভোগের শেষ না হলে আকুলতা দেখা যায় না। খেলায় মেতে থাকা ছেলের মাকে মনে পড়ে না। খেলা শেষ হলেই সে মাকে চায়। সংসারের খেলা সাঙ্গ হলে জগজ্জননীকে মনে পড়ে।'

সন্ধ্যের পর কলকাতা থেকে অধর এলেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কেমন আছেন?'

'এই দেখ না হাতে লেগে কি হয়েছে আমার?' হাসি ও স্নেহ মিশিয়ে তিনি উত্তর দিলেন। 'তুমি একটু হাত বুলিয়ে দাও তো!' নানা কথা চলছে। ঠাকুর বলছেন ভক্তদের, 'স্ত্রীলোক সম্বন্ধে খুব সাবধান না থাকলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। সংসার খুব কঠিন ঠাঁই। যুবতীর সঙ্গে নিষ্কামেরও কাম হয়। তবে জ্ঞানীর পক্ষে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে কখনো সখনো গমনে দোষ হয় না। যেমন মলমূত্র ত্যাগ, তেমনিই রেতঃ ত্যাগ। কিন্তু সন্ন্যাসীর পক্ষে অন্য পথ। তারা স্ত্রীলোকের সঙ্গে বসে আলাপ পর্যন্ত করবে না। তাঁদের ষোলো আনা ত্যাগ দেখে সাধারণ লোকের সাহস হবে। ত্যাগের শিক্ষা সন্ন্যাসী না দিলে কে দেবে!'

শ্রীরামকৃষ্ণ গল্প করলেন। নানা কথা নানা আলোচনা। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'দেখ জয়নারায়ণ পণ্ডিত খুব উদার ছিলেন। তাঁর ভাব বেশ। ছেলেগুলো সাহেব। একদিন বললে, আমি কাশী যাব। যেমন কথা তেমন কাজ। কাশীতেই গেলেন আর সেখানেই দেহত্যাগ।' কথা বলতে বলতে মণিলালকে বললেন, 'তোমার সেই কথাটি এদের বলো না?'

হেসে মণিলাল গল্প শুরু করলেন, 'কজন লোক নৌকো করে গঙ্গা

পার হচ্ছিল। এক পণ্ডিত তাঁর বিদ্যার বড়াই করছে। আমি ন্যায় শাস্ত্র পড়েছি ; বেদ বেদান্ত ষড়দর্শন। একজনকে প্রশ্ন করল, বেদান্ত জান ? সে উত্তর দিল, না। এই রকম নানা জনকে নানা রকম। অহঙ্কারে পণ্ডিত ডগমগ। সকলে চুপ। এমন সময় প্রচণ্ড ঝড় উঠল। নৌকো ডুবুডুবু। এবার যাত্রীদের একজন পণ্ডিতকে জিজ্ঞেস করল. আপনি সাঁতার জানেন ? পণ্ডিত উত্তর দিল, না। এবার ব্যক্তিটি বলল, আমি সাংখ্য পাতঞ্জল না জানলেও সাঁতার জানি।'

সরস মন্তব্যে ঠাকুর গল্পে উপসংহার টানলেন, 'নানা শাস্ত্র জানলে কি হবে ? ভবনদী সাঁতরে পার হওয়াই দরকার।'

একদিন ঠাকুর বললেন ভক্তদের, 'আমি মূর্খোত্তম।' সবাই এই কথায় হেসে উঠল।

'তাই যদি হয় তো আপনার মুখ থেকে বেদ বেদান্ত—এ ছাড়াও অন্যান্য কথা আসে কি করে ?'

'তার কৃপা পণ্ডিত মূর্খ সব ছেলেদের উপরই সমান—' শ্রীরামকৃষ্ণ জবাব দিলেন, 'যে তাঁকে পাবার জন্য ব্যাকুল তাঁকেই তিনি স্নেহ করেন। এই হাত ভাঙার পর আমার অবস্থান্তর ঘটছে। নরলীলার দিকে মনটা খুব যাচ্ছে। তিনিই খেলছেন মানুষ হয়ে।'

দু একজন বন্ধু সঙ্গে নিয়ে ঠাকুরদাদা বরাহনগর থেকে হেঁটে এসেছেন। সাধন ভজন করেন। তাঁকে দেখে ঠাকুর বললেন, 'এখানে কি দরকার ছিল ?'

'আপনাকে দেখতে এসেছি।' তিনি উত্তর দিলেন ; 'তাঁকে ডাকি, কদিন বেশ থাকি, তারপর আবার কেমন হয়ে যায়। মাঝে মাঝে অশান্তি হয় কেন ?'

ঠাকুরদাদার কথা শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'বুঝেছি—ঠিক ঠিক পড়ছে না। দাঁতে দাঁত বসিয়ে দেয় কারিগররা, তবে গিয়ে হয় ; কোথায় একটু যেন আটকে আছে। সংসারে থাকতে গেলেই একটু

আধটু সুখ দুঃখ অশান্তি আছে। শঙ্কর হরিভক্তি দেবেন।'

মহিমাচরণ বলে উঠলেন, 'পাশমুক্তঃ সদা শিবঃ।'

ঠাকুর তাই শুনে বললেন, 'লজ্জা ঘৃণা ভয় সঙ্কোচ—এ সব তাহলে পাশ—কি বলো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' মহিমাচরণ সায় দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন বলতে আরম্ভ করলেন, 'জ্ঞানের লক্ষণ দুই। প্রথম কূট বুদ্ধি। হাজার দুঃখ কষ্ট বিপদে নির্বিকার। যেমন কামার-শালায় লোহা—যার উপর অনবরত হাতুড়ির ঘা পড়ছে। আর দুই হল পুরুষাকার—প্রচণ্ড রোখ—কাম ক্রোধে অনিষ্ট হচ্ছে তাহলে একেবারে ত্যাগ।' ঠাকুরদাদার দিকে ফিরে বলতে লাগলেন,'বৈরাগ্য দু রকমের। তীব্র বৈরাগ্য আর মন্দ বৈরাগ্য। মন্দ বৈরাগ্য হচ্ছে হবে ঢিমে তেতালা ভাব। তীব্র বৈরাগ্য ক্ষুরের ধারের মতো—যা মায়াপাশকে কচকচ করে কাটে। আর এক ধরনের বৈরাগ্য আছে, যাকে বলে মর্কট বৈরাগ্য। সংসারের জ্বালা অসহ্য হওয়ায় গেরুয়া পরে কাশী গেল। বহুদিন খবর নেই। তারপর একদিন একটা চিঠি এল, তোমরা ভাবিও না, আমি একটি কাজ পাইয়াছি।'

মহিমাচরণ প্রশ্ন করলেন, 'মানুষ বিষয়ে মুগ্ধ হয় কেন?'

'তাঁকে লাভ না করে বিষয়ের মধ্যে বাস করে বলে।' ঠাকুর উত্তর দিলেন। ভগবানকে পেলে আর মুগ্ধ হয় না। বাদুলে পোকা একবার আলো দেখতে পেলে আর তার অন্ধকার ভাল লাগে না। তাঁকে পেতে হলে বীর্য ধারণ করতে হয়। বীর্যপাতে বলক্ষয়। যদিও স্বপ্নদোষে যেটুকু বেরোয় তাতে দোষ নেই। ও সব গিয়েও যা থাকে তাতেই কাজ হয়। তবু স্ত্রী সঙ্গ করা উচিত নয়। শেষে যা থাকে তা খুব রিফাইন—লাহাদের ওখানে গুড়ের নাগরি রেখেছিল নিচে একটা ফুটো করে—এক বছর বাদে দেখা গেল রস যা বেরিয়ে যাবার গেছে-ফুটো দিয়ে। ভেতরে সব দানা বেঁধে আছে মিছরির মতো। সন্ন্যাসীর

পক্ষে বীর্যপাত খুবই খারাপ। তাই তাদের জন্য চাই সাবধানতা। যাতে স্ত্রীরূপ না দর্শন হয়। সন্ন্যাসীর হচ্ছে নির্জলা একাদশী। একা-দশী আরো দু রকমের হয়—ফলমূল খেয়ে আর লুচি ছক্কা খেয়ে।' সবাই এই রসিকতায় হেসে উঠল হো হো করে। 'লুচি ছক্কার সঙ্গে দুখানা রুটি ভিজছে দুধে।' সবাই পুনরায় হেসে উঠল প্রাণ খুলে। 'তা তোমরা নির্জলা একাদশী পারবে না।'

কজন ভক্ত পঞ্চবটী দেখতে গিয়েছিল। তারা ফিরে এলে ঠাকুর তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'কি গো কি রকম দেখলে? তোমাদের গজ দিয়ে মাপলে তো?'

কথায় কথায় অনাবিল ঠাট্টা। রঙ্গ রসিকতা। বিষয় যত শক্ত হোক শ্রীরামকৃষ্ণ তাকেই প্রাঞ্জল করে তোলেন নিজেব মনের রস মিশিয়ে। তিনি অতীন্দ্রিয় বলেই এই মিশেল দিতে পারতেন নিপুণ হাতে। যা ভক্তদের মুহূর্তে বিশ্বাসী করে তুলত। রস আর বসিকতার মধ্যেই জীবন—সন্ন্যাসী বলে রসকষহীন হতে হবে এ বিশ্বাসকে তিনি গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন।

কৃচ্ছ্রসাধনের ভয়ে ত্যাগের ভয়ে ভক্তরা ধর্মপথ ত্যাগ করে এই ভেবে তিনি তাঁদের বলতেন, 'তোমাদের সব ত্যাগের দরকার নেই। সংসারে কচ্ছপের মতো থাক। কচ্ছপ নিজে জলে চরে বেড়ায় কিন্তু ডিম পাড়ে ডাঙাতে—তার পুরো মনটা তাই পড়ে থাকে ডিমের কাছে।'

'বীর্য ধারণ না করলে এসব ধারণা হয় না।' শ্রীরামকৃষ্ণ মহিমা-চরণকে বললেন। 'একজন চৈতন্যদেবকে বললে, এদের এত উপদেশ দেন কই উন্নতি তো হচ্ছে না? হবে কি করে? চৈতন্যদেব উত্তর দিয়েছিলেন, এরা যোষিৎ সঙ্গ করে সব অপব্যয় করেছে তাই ধারণা করতে পারে না! ফুটো কলসীতে জল রাখলে আস্তে আস্তে তা বেরিয়ে যায়।'

ঠাকুরের জন্মদিন। সশিষ্য তিনি বসে রয়েছেন দক্ষিণেশ্বর আলো

করে। সব ভক্তদের মধ্যে ভবনাথ গায়ে জামা দিয়ে বসে আছেন।
তাই দেখে সুরেন্দ্র ঠাট্টা করে বললেন, 'কি ব্যাপার বিলেত যাবে
নাকি ?'

নির্মল রসিকতায় হেসে উঠলেন পরমপুরুষ। বললেন, 'আমাদের
বিলেত তো ঈশ্বরের কাছে।' একটু থেমে তিনি বললেন, 'এ সব
হল অষ্টপাশ বন্ধন। লজ্জা ঘৃণা ভয় জাতি-অভিমান, সঙ্কোচ
গোপনের ইচ্ছা এই সব। মায়া দড়ি হল গিয়ে মাগ ছেলে। বিষয়ে
মেজেছ মাঞ্জা, তাই কর্কশ হয়েছে দড়ি। বিষয়—কামিনী-কাঞ্চন।
সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণেতেই মানুষ বশ। তিন গুণই চোর।'

হেসে ফেললেন বিজয়, 'সত্ত্ব-ও চোর কিনা !'

হাসলেন ঠাকুর। বললেন, 'ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যেতে পারে
না, তাহলেও পথ দেখায়। একটু পরেই বললেন, 'সবাইকেই
দেখি মেয়েমানুষের বশ। কাপ্তেনেব বাড়ি গেছি। ওখান থেকে
রামের বাড়ি যাব। গাড়ি ভাড়া চাইলাম। সে তার মাগকে
বললে। মাগ চেঁচাতে লাগল। কাপ্তেন তখন বললে, ওরাই দেবে।
গীতা ভাগবত বেদান্ত সব ওর ভিতরে।'

ঠাকুরের সরস উক্তিতে সবাই হেসে উঠল।

স্ত্রীলোক প্রসঙ্গে বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। 'সবাই বলে আমার বউ
ভাল।' এ কথাতেও সকলে হাসল। 'সংসারের নেশায় কিছু বুঝতে
পারে না। স্ত্রী জাতি মায়ারূপিণী। সাধুর মন ঈশ্বরে বার আনা
চার আনা কাজে। ঈশ্বরের কথাতেই মনোযোগ। সাপের ন্যাজ
মাড়ালে আর রক্ষে নেই। ন্যাজে বোধ হয় তার বেশি লাগে।'

পঞ্চবটীতে বসে কথা হচ্ছিল। ঝড় দেখা দেওয়ায় সবাই ঘরে
গিয়ে বসল। শ্রীরামকৃষ্ণ গোপালকে বললেন, 'ছাতিটা এনেছ ?'
ছাতিটা পঞ্চবটীতেই পড়ে রয়েছে। গোপাল তাড়াতাড়ি আনতে
ছুটল। তাই দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'আমি যে এত এলোমেলো

তাও এতদূর নয়। রাখাল এক জায়গায় নেমতন্নের দিন ১৩ কে ১১ বলে, আর গোপাল গরুর পাল।'

তাঁর সরস মন্তব্যে উপস্থিত সবাই হেসে ফেলল।

ঠাকুর বিজয়কে বললেন, 'সন্ন্যাসীকে দেখে সকলে শিখবে তাই তাদের এত কঠিন নিয়ম। কালো পাঁঠা মার সেবায় বলি দিতে হয় কিন্তু তার গায়ে সামান্য ঘা থাকলে চলবে না।'

কথায় কথায় মণি একদিন বললেন, 'সব ত্যাগ করতে পারাটা ভাগ্য।'

'তা তো বটেই।' শ্রীরামকৃষ্ণ জবাব দিলেন। তবে সংস্কার যতটুকু। তোমার এখনো কিছু কাজ বাকী আছে, সেটুকু শেষ হলেই শান্তি—তখন তুমি ছাড়া পাবে।'

একথা ওকথার পর বললেন, 'আচ্ছা এই হাত ভাঙার মানে জান ?' মণি চুপ করে রইলেন। অর্থ তিনিই বললেন, 'সব অহঙ্কার নির্মূল করার জন্য হাত ভেঙেছে। এখন আর আমিকে খুঁজে পাচ্ছি না। সব জায়গায় দেখছি তিনি রয়েছেন।'

সিদ্ধাইর কথা হচ্ছে। মাস্টার বললেন, 'আপনি বলেছেন অষ্ট-সিদ্ধির একটি থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায় না।'

'ঠিক কথা।' শ্রীরামকৃষ্ণ জবাব দিলেন, 'নীচ বুদ্ধির মানুষ সিদ্ধাই চায়। যে ব্যক্তি ধনীর কাছে গিয়ে কিছু চেয়ে বসে সে আর খাতির পায় না। সে লোককে ধনী এক গাড়িতে চড়তে দেয় না। চড়তে দিলেও কাছে বসায় না।'

সাকার নিরাকার প্রসঙ্গে নতুন করে বললেন, 'পাখি উপরে অনেক উঁচুতে উঠে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন ফিরে এসে গাছের ডালে বিশ্রাম করে। নিরাকারের পর সাকার।'

বলরামের বাড়িতে গিয়েছেন পরমপুরুষ। বহুবার এই ভক্তের গৃহে এসে তাঁর সেবা সানন্দে গ্রহণ করেছেন। সেদিন উল্টোরথ।

সেই উপলক্ষ্যে এসেছেন। রথের দিন আলাপ হয়েছিল শশধরের সঙ্গে। আজ এখানে তিনিও আসবেন কথা আছে। খানিক গল্পের পর ঠাকুর একবার বারান্দা হয়ে ঘরে ফিরে এলেন। বাইরে যাবার সময় বিশ্বম্ভরের মেয়ে তাঁকে প্রণাম করেছিল। ছয় সাত বছর বয়স। তার সঙ্গে সমবয়সী আরো ছু একজন রয়েছে। ঘরে ফিরবার পর সে কথা বলছে ঠাকুরের সঙ্গে। 'আমি তোমায় নমস্কার করলুম, দেখলে না?'

হেসে ফেললেন ঠাকুর, 'কই দেখি নি তো!'

বিশ্বম্ভরের মেয়ে একথা শুনে বললে, 'তবে দাঁড়াও, আবার নমস্কার করি।' ঠাকুর দাঁড়িযে মেয়েটির নমস্কার নিলেন ও তাকে প্রতি নমস্কার করলেন ভূমি পর্যন্ত মাথা নত করে। মেয়েটিকে গান গাইতে বললেন ঠাকুর। মেয়েটি উত্তর দিল, 'মাইরী গান জানি না।' তখন ঠাকুরই তাদের গান শোনাতে লাগলেন। হাসির গান—আয় লো তোর খোঁপা বেঁধে দি, তোর ভাতার এলে বলবে কি, এইসব। সকলে তাই শুনে পুলকিত হয়ে হাসতে লাগল।

ভক্তদের বললেন তিনি, 'পরমহংসের স্বভাব পাঁচ বছরের বালকের মতো হয়ে যায়। সব চৈতন্যময় দেখে। আত্মপর জ্ঞান থাকে না। ঐহিক সম্পর্কের কোনো আঁট নেই। কি করছে কোথায় যাচ্ছে তার হিসেব থাকে না। পরমহংসের আবার পাগলের মতো স্বভাব হয়ে যায়। আমিও উন্মাদ হতাম। শিবলিঙ্গ জ্ঞানে নিজের লিঙ্গ পূজা করতাম। এখন আর তা পারি না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ কথা বলছেন মাস্টারের সঙ্গে। অন্য ভক্তরা ঘিরে রয়েছেন তাঁকে। ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, 'শশধরকে তোমার কেমন লাগে?'

'ভালই মনে নয়।' মহেন্দ্র জবাব দিলেন, 'খুব পণ্ডিত।'

'শুধু পাণ্ডিত্যে কি হবে, সামান্য তপস্যার প্রয়োজন—অন্তত কিছুটা

সাধনা। নারায়ণ শাস্ত্রীও খুব পণ্ডিত, তবে সাধ্যসাধনা করেছে। কেশব সেনকে সেই প্রথম দেখে এসে আমাকে বলে। সে যখন ছিল তখনই মাইকেল এসেছিল। মথুরবাবুর ছেলে দ্বারিকের সঙ্গে কথা কয়েছিল। সে প্রশ্ন করেছিল, 'তুমি স্বধর্ম ত্যাগ করলে কেন? মাইকেল পেট দেখিয়ে বললে, পেটের জন্য। তখন নারায়ণ শাস্ত্রী বলল, যে পেটের জন্য ধর্ম ত্যাগ করে তার সঙ্গে কি আর কথা বলব। তখন মাইকেল আমাকে বলল, আপনি কিছু বলুন। উত্তর দিলাম, আমার কিছু বলতে ভাল লাগছে না। কে যেন আমার মুখ চেপে ধরছে।'

হঠাৎ মনোমোহন বললেন, 'চৌধুরী আসবেন না। তিনি বলেছেন, সেই ফরিদপুরের বাঙাল আসবে তাই যাব না।'

সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'কি হীনবুদ্ধি। বিদ্যার অহঙ্কারের সাথে আবার দ্বিতীয় পক্ষ করে ধরাকে সরা জ্ঞান করছে। কামিনী-কাঞ্চনের প্রতি আসক্তিই মানুষের বুদ্ধিকে ছোট করে দেয়। এই দেখনা হরমোহন প্রথমে বেশ ছিল। লক্ষণও ভাল। এখন সে মাগ নিয়ে আলাদা বাসা করেছে। রোজ পরিবারের বাজার করে।'

সবাই হাসল ওঁর কথা শুনে। এমন সময় শশধর এলেন। প্রণাম সেরে বসলেন। ওকে দেখেই ঠাকুর বলে উঠলেন, 'আমরা সবাই বাসকসজ্জা জেগে আছি, কখন বর আসবে।'

হেসে ফেললেন শশধর পণ্ডিত। কি স্নিগ্ধ ঠাট্টা। কি গভীর রসানুভূতি।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে ধর্মীয় আলাপে মগ্ন হলেন। কথার মধ্যেই মাস্টারকে বললেন, 'চুপ করে আছ কেন? একটা খোঁচা দাও না!'

বলরামের বাড়ির দোতলায় ছোট রথটি সাজিয়ে আনা হয়েছে। বারান্দাতেই রথ টানা হবে। ঠাকুর দড়ি ধরেছেন। রথ টানলেন গান গাইলেন। শেষে শুরু করলেন নাচতে। সবাই উন্মুখ হয়ে তাঁর এই কাণ্ড দেখছেন। রথ টানা হয়ে গেলে তিনি পুনরায়

বসবার ঘরে ফিরে এলেন। শশধর পণ্ডিতকে বললেন, 'এর নাম ভজনানন্দ। ভজনে তাঁর কৃপা হলে তিনি যখন দেখা দেন তখন হয় ব্রহ্মানন্দ।'

সবাই অবাক হয়ে এ সব শুনছে। শশধর পণ্ডিত বিদায় নিলেন। তারপর কীর্তন শুরু হল। শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরের বাইরে এসে কীর্তনে যোগ দিলেন।

একদিন দুপুরে শিবপুর ও ভবানীপুর থেকে কিছু ভক্ত এসেছে। শিবপুরের ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুর কথা বলছেন। তিনি বললেন, 'কামিনীকাঞ্চনে মন পড়ে থাকলে যোগ হয় না। সাধারণ লোকের মন লিঙ্গ গুহ্য ও নাভিতে নিবদ্ধ—তাই তারা ঈশ্বরকে পায় না।'

কথা বলতে বলতে গান হল। ঠাকুর গানে যোগ দিলেন। সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। একটু পরেই খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে মার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। 'মা, যার যা-আছে তাই হবে। এদের আমি কি বলব—বিবেক বৈরাগ্য ছাড়া কিছু হয় না। আবার একে-বারে বৈরাগ্য হয় না—সময় না হলে হয় না। জ্ঞানলাভের মতো মানুষ খুব বিরল। গীতায় বলেছে, বহু হাজার জনের মধ্যে একজন মাত্র ভগবানকে জানতে চায়। আবার যারা জানতে আগ্রহী—সেরকম হাজার হাজার লোকের মধ্যে এক জন জানতে পারে। প্রেম সবার হয় না। গৌরাঙ্গের হয়েছিল। পার্শী বইয়ে আছে, চামড়ার ভিতর মাংস, মাংসের ভিতর হাড়, হাড়ের ভিতর মজ্জা—তারপর আরো কত। সকলের ভিতরই প্রেম। প্রেমে সবাই কোমল নরম হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণ প্রেমেই ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন।'

নিজের ঘরে বসে আছেন ঠাকুর। নানাবিধি বিষয়ে হাজরার সঙ্গে কথা বলছেন। হাজরা ঠাকুরকে বললেন, 'নরেন্দ্র আবার মামলায় জড়িয়েছে।'

শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দেন, 'জড়াবেই তো। ও যে শক্তি মানে

না। দেহধারণ করলে শক্তি মানতে হয়।' মাস্টারের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমার সঙ্গে নরেন্দ্রর দেখা হয় নি?'

'ইদানিং হয় নি।' মাস্টার জানালেন।

'একবার দেখা করো—ওকে এখানে গাড়ি করে নিয়ে এস।' ঠাকুর আদেশ দিলেন। তারপরই মণির সঙ্গে কথা বলছেন। নিজের ব্যাপারে অনুসন্ধান। 'লোকে আমাকে কি ভাবে বলতে পার?'

'এক আধারে জ্ঞান বৈরাগ্য ভালবাসা তার ওপর অকপট সরলতা জলের মতো সহজ এসবে আকর্ষিত হয়। বুঝতে পারে না সবাই, তবু ঝুঁকে পড়ে।' রসের ভাণ্ডারের প্রতি লোভ। মণি উত্তর দেন।

শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্তব্য করলেন, 'ঘোষপাড়ার মতে ভগবানকে সহজ বলে। আরো বলে, সহজ না হলে সহজকে যায় না চেনা।'

একটু পরে তিনি মণিকে বললেন, 'তিনি অনন্ত, তাই পথও অনন্ত। ভগবান কৃপা না করলে মনের সন্দেহ যায় না।'

অধরের বাড়ি গিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অনেক ভক্ত এসেছে। নরেন্দ্র এসেছেন। তিনি গান গাইবেন। তিনি গান ধরলেন। গান শুনতে শুনতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন। নরেন্দ্রর গানের পর বৈষ্ণবচরণের গান শুরু হল। সেই গানের সঙ্গে তিনি তালে তালে নাচতে লাগলেন। মনমাতানো সে কি নাচ। ভক্তরা চুপ করে থাকতে পারল না। তারাও নাচে যোগ দিল।

কিছুক্ষণ বাদে নাচ গান থামল। ঘরে বসে এবার তিনি ভক্তদের সঙ্গে রসের কথা শুরু করলেন। বললেন, 'হ্যাঁরে হাজরা নেচেছিল? তাঁর মুখে চন্দ্রকিরণের ন্যায় হাসি।

নরেন্দ্র হেসে উত্তর দিলেন, 'একটু একটু। তার সঙ্গে ভুঁড়ি আর একটি জিনিস নেচেছিল।'

হেসেই বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ, সে 'আপনি হেলে-দোলে—না দোলাতে আপনি দোলে।'

এবার সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠল।

শশধর যে বাড়িতে থাকেন সেখানে ঠাকুরের নেমতন্ন হবার কথা। সেই শুনে নরেন্দ্র বললেন 'খাওয়াবে কে বাড়িওয়ালা?'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ওর স্বভাব ভাল না—লোচ্চা।'

সঙ্গে সঙ্গে নরেন্দ্র বললেন, 'এবার বুঝেছি, তাই আপনি শশধর পণ্ডিতের সঙ্গে প্রথম দেখা হবার দিন ওদের ছোঁয়া গেলাস থেকে জল খেলেন না। তা আপনি কি করে জানলেন যে লোকটার স্বভাব ভাল না?'

হেসে বললেন ঠাকুর, 'এমন আর একবার হয়েছিল, হাজরা জানে! সিহড়ে, হৃদের বাড়িতে!'

হাজরা বললেন, 'সে লোকটি ছিল বৈষ্ণব—আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। যেই সে গিয়ে বসল, উনি তার দিকে পেছন ফিরে বসলেন।'

সবাই অবাক! ইনি কি অন্তর্যামী। যা ঘটে সব টের পান!

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'মামির সঙ্গে নষ্ট ছিল—তারপর খবর পাওয়া গেল।'

অনেক ভক্ত এসেছে। বাউলদের বিষয়ের কথা হচ্ছে। বাউলরা সিদ্ধ হলে তাদের সাঁই বলে। ঠাকুর এক বাউলের কাহিনী বলছেন। 'একজন বাউল এসেছিল। তাকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তোমার রসের কাজ সব শেষ হয়ে গেছে—খোলা নেমেছে? যত রস জ্বাল দেবে তত রিফাইন হবে। প্রথম আকের রস—তারপর গুড়, এরপর দোলা, ক্রমে চিনি, মিছরি, ওলা এ সব। খোলা নামবে কখন? অর্থাৎ সাধন কবে শেষ হবে? যখন ইন্দ্রিয় জয় হবে যে রকম জোঁকের ওপর চুন দিলে জোঁক আপনি খুলে পড়ে তেমনি ইন্দ্রিয়ও শিথিল হয়ে যায়—রমণীর সঙ্গে থাকে না করে রমণ।'

বহু মত, বহু পথ। ভক্তদের নানা মতের নানা ভাবের কথা বলেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। 'এর মধ্যে একটাকে জোর করে ধরতে হয়—ছাদে গেলে পাকা সিঁড়িতে ওঠা যায়। আচ্ছা আমি কোন পথের?' ভক্তদের তিনি প্রশ্ন করলেন। 'একেকজন একেক রকম বলছে, তোমাদের কি ধারণা?' এই প্রশ্নের মর্মার্থ কি অদ্ভুত! ভক্তদের তিনি বলতে চান, সব পথই আমার জানা—সব ধর্মের মানুষই তাই আমার কাছে শান্তি পেতে পারে।'

পঞ্চবটীর দিকে যাচ্ছেন ভক্ত পরিবৃত হয়ে। গঙ্গায় বান আসবার সময় হয়েছে। বান দেখবার জন্য দাঁড়িয়েছেন। সবাইকে বলছেন, 'জোয়ার-ভাঁটা কি আশ্চর্য ব্যাপার!' একটু থেমে বললেন, 'একটা জিনিস দেখেছ, সমুদ্রের কাছে নদীর মধ্যে জোয়ার-ভাঁটা হয়—সমুদ্র থেকে অনেক দূর হলে একটানা হয়ে যায়! এর কি অর্থ! এখানে ঐ ভাবটি বসাও। যারা ঈশ্বরের খুব কাছে তাদের মধ্যেই ভক্তি ভাব, এসব ঘটে; আর দু-একজনের মহাভাব, প্রেম এসব হয়।'

বান এসে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বান দেখলেন তিনি। তারপর ঘরে ফিরলেন। ঘরে ফিরেই বললেন, 'তোমাদের কারোই ছাতা আনতে মনে নেই। ব্যস্তবাগীশ লোক কাছের জিনিস দেখতে পায় না। একজন হাতে লণ্ঠন নিয়ে আরেকজনের বাড়িতে টিকে ধরাতে গিয়েছিল।'

সবাই হেসে উঠল মজার কথায়। এমনি অহরহ মজা করেই ভক্তদের মাতিয়ে রাখতেন তিনি। গম্ভীর বিষয় লঘু হয়ে যেত তাঁর বলার গুণে।

সন্ধ্যের পর ভক্তদের নিয়ে ঠাকুর বসেছেন। একটু আগে কীর্তন নাচ গান হয়ে গেছে। এমন সময় অধর এসে বসেছেন। তাঁকে দেখে ঠাকুর বললেন, 'কি গো তুমি এতক্ষণে এলে! কত কীর্তন নাচ গান হয়ে গেল। শ্যামাদাসের কীর্তন! খুব বড় ওস্তাদ। কিন্তু আমার তত

ভাল লাগল না। উঠতে ইচ্ছে হল না। ও লোকটার কথা পরে শুনলাম, গোপীদাসের বদলী বলেছে, আমার মাথায় যত চুল তত উপপত্নী করেছে।'

সবাই হেসে উঠল সরস এই মন্তব্যে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'প্রবৃত্তি ভাল নয়; নিবৃত্তিই ভাল। মল্লিক আমার খেতে দেরী হয় দেখে রাঁধবার বামুনের ব্যবস্থা করেছিল। মাস গেলে এক টাকা দিয়েছিল। তখন লজ্জা হল। ডাকলেই খেতে হত। এই অবস্থা যেই হল হাব-ভাব দেখে মাকে বললাম, মা এই-খানেই মোড় ঘুরিয়ে দাও; সুধামুখীর রান্না, আর না আর না, খেয়ে পায় কান্না।'

আবার সবাই হেসে ফেলল রসেভরা এই কথায়। 'একটা গল্প বলি শোন—' ঠাকুর বলতে লাগলেন, 'একটি স্ত্রীলোক একজন মুসলমানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার সঙ্গে আলাপের জন্যে তাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। মুসলমানটি ছিল সাধু প্রকৃতির। সে বলল, আমি প্রস্রাব করব, আমার বদনা আনতে যাই। শুনে মেয়েমানুষটি বলল, তা এখানেই করো, আমি বদনা দিচ্ছি। মুসলমান বলল, না, তা হবে না। আমি যে বদনার কাছে একবার লজ্জা ত্যাগ করেছি, সেই বদনাই ব্যবহার করব, আবার অন্য বদনার কাছে নতুন করে নির্লজ্জ হব না। এই কথা বলে সে চলে গেল। তখন মাগীটার আক্কেল হল। সে বদনার মানে বুঝলে উপপতি।'

ত্যাগী আর সংসারীর কথা হচ্ছিল। তাই শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত আর সংসারীতে অনেক তফাৎ। ত্যাগীরা হল মৌমাছির মতো—তারা ফুল ছাড়া আর কোথাও বসে না। মধু ছাড়া আর কিছু পান করে না। সংসারী ভক্ত আর মাছি—সন্দেশেও বসছে পচা ঘায়েও বসছে। কখনো ঈশ্বরের ভাবে থাকে আবার কামিনীকাঞ্চন নিয়ে মত্ত।'

অধরকে বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'তাঁকে পেলে তিনিই সব জুটিয়ে

দেন, অভাব থাকে না। প্রাণের ভেতর তাঁর আগমন ঘটলে সেবা করবার লোকও জুটে যায়। এক অল্পবয়সী সন্ন্যাসী গেরস্ত বাড়ি ভিক্ষে করতে গিয়েছিল। আজন্ম সন্ন্যাসী, সংসারের কোনো কিছু জানে না। গেরস্তের একটি যুবতী মেয়ে তাকে ভিক্ষা দিলে। সন্ন্যাসী তার মাকে জিজ্ঞেস করলে মা এর বুকে কি ফোড়া হয়েছে? মেয়েটির মা তাই শুনে উত্তর দিলে, না বাবা! ওর পেটে ছেলে হবে বলে ভগবান দুটো স্তন করে দিয়েছেন—ওই স্তনের দুধ বাচ্চা খাবে। সন্ন্যাসী তখন তাই শুনে বললে, তাহলে আর ভাবনা কি। আমি আর কেন ভিক্ষে করব? যিনি আমায় সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমাকে খেতে দেবেন।'

রাত্রে খেতে বসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সামান্য আহার। কাছে মাস্টার লাটু রয়েছেন। ভক্তেরা সন্দেশ ও অন্য মিষ্টি এনেছিলেন। তাই দেওয়া হয়েছে। একটি সন্দেশ ছুঁয়েই তিনি লাটুকে বলছেন, 'এ কোন শালার সন্দেশ?' কথা বলেই সন্দেশ ফেলে দিলেন। 'ও আমি সব জানি। ওই আনন্দ চাটুয্যেব ছোকরা এনেছে—সে ঘোষপাড়ায় এক মাগীর কাছে যায়।'

দক্ষিণেশ্বরে নিজের ঘরে বসে ভক্তদের কাছে শ্রীবামকৃষ্ণ মহাপ্রভুর অবস্থা বর্ণনা কবছেন। তিনি বলছেন, চৈতন্যদেবেব তিনটি অবস্থান্তর ঘটত। বাহ্যদশা, অর্ধবাহ্যদশা ও অন্তর্দশা। বাহ্যদশায়, মন থাকত স্থূল আর সূক্ষ্ম বিষযে। অর্ধবাহ্যদশায়—কাবণানন্দে মন চলে যেত। অন্তর্দশা অর্থাৎ মন লয় হত মহাকারণে। বেদান্তের পঞ্চকোষের সঙ্গে এর মিল দেখতে পাবে। স্থূলশরীর মানে অন্নময় প্রাণময় কোষ; সূক্ষ্মশরীর অর্থাৎ মনোময় বিজ্ঞানময় কোষ; কারণশরীর মানে আনন্দময় কোষ—মহাকারণ পঞ্চকোষের অতীত। মহাকারণে মন মিশে যাওয়া মানেই সমাধি অবস্থা—নির্বিকল্প বা জড় সমাধি।'

ভক্তরা অবাক হয়ে এই কথা শুনছেন। তাঁরা ভাবছেন, এই পরমপুরুষ কি চৈতন্যদেবের অবস্থান্তর দ্বারা নিজের অবস্থার কথাও

বোঝাচ্ছেন!

নহবতের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ঠাকুর দেখতে পেলেন বারান্দার একপাশে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছেন মণি। তিনি ওঁর সামনে গেলেন। বললেন, 'কি ব্যাপার এখানে বসে? তোমার শিগগিরই হবে। এবার সময় হয়েছে। ওাখি ডিম ফুটোবার সময় না হলে ফুটায় না। সকলেরই বেশি তপস্যা করতে হয় তা নয়—আমার কিন্তু বড় কষ্ট করতে হয়েছিল।'

শ্রীরামকৃষ্ণ অতীত দিনে ফিরে গেলেন কথা বলতে বলতে। 'এই চোখে গৌরাঙ্গদের সাঙ্গোপাঙ্গোদের দেখেছিলাম—ভাবে নয়। তখন সাদা চোখে দর্শন হত। তাঁর মধ্যে যেন তোমায় আর বলরামকেও দেখেছিলাম।' পঞ্চবটির দিকে যেতে যেতে কথা হচ্ছিল। মাস্টারের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একদিন দেখি এক অদ্ভুত মূর্তি কালীঘর থেকে পঞ্চবটি পর্যন্ত—তুমি এ কথা বিশ্বাস করবে?'

ভক্তদের তিনি নিজের আত্মীয়র মতো দেখতেন। তাঁদের জন্য প্রাণভরা টান। কথায় কথায় বললেন, 'এত যে তোমরা আস এর মানে কি! সাধুকে লোকে একবার দেখে যায়—এতবার আসা কেন? তিনি নিজেই উত্তর দিচ্ছেন, 'অন্তরঙ্গ না হলে কি আর আস? আপনার লোক বলে ভাব—যেমন বাপ ছেলে ভাই বোন এইসব।'

নানা কথা নানা বার নানাভাবে বলেছেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণ চেয়েছিলেন তাঁর কথায় উপদেশের যেন কোনো সংশয় না থাকে। ভক্তরা যেন অতি সহজে সাধন জীবনের নিবিড়তায় ঢুকে যায়। প্রতিটি কথা বলেছেন রসের যোগান দিয়ে, রসিকতা করে। যাতে খুব ভারী তত্ত্বও হালকা মনে হয় ভক্তর সামনে। কর্ম সম্পর্কে এক জায়গায় বলছেন, 'বরাবরই কাজ করে যেতে হবে এমন নয়; ভগবানকে পেলে আর কাজ থাকে না। ফল হলে ফুল আপনিই ঝরে যায়।'

একজন ভক্ত বললেন, 'টাকাকড়ির জন্য তো সবাই চেষ্টা করছেন।

দেখুন না কেশব সেন কেমন রাজার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'কেশবের কথা আলাদা। যে ঠিক ভক্ত সে চেষ্টা না করলেও ঈশ্বর তাকে সব জুটিয়ে দেন। রাজার ছেলে মাসোহারা পায়। সে চায় না, তবু টাকা ঠিক আসে।'

অন্য ভক্ত প্রশ্ন করলেন, 'সংসারে থাকব কি ভাবে?'

'পাঁকাল মাছের মতো থাকবে।' পরমপুরুষ উত্তর দিলেন। 'পাঁক আছে, পাঁকের ভিতর থাকতে হয়, তবু গায়ে পাঁক লাগে না। মন থাকবে ঈশ্বরে, অনাসক্ত হয়ে সংসারে থাকবে। মায়াকে একবার চিনতে পারলে লজ্জায় সে আপনি পালাবে। একজন বাঘের ছাল পরে ভয় দেখাচ্ছিল। যাকে ভয় দেখাচ্ছিল সে বলে উঠল, আমি তোকে চিনেছি, তুই তো আমাদের হরে। তখন সে হেসে চলে গেল অন্যকে ভয় দেখাতে। মান করলেই ত্যাগ করা যায় না। একজন যোগী এক রাজাকে বলেছিলেন, তুমি আমার কাছে বসে ঈশ্বর চিন্তা করো। রাজা উত্তর দিলেন, ঠাকুর তা হয় না, আমি থাকতে পারি কিন্তু আমার এখনো ভোগ বাকী আছে—এই অরণ্যে থাকলে হয়তো এখানেই একটা রাজ্যপাট বসে যাবে।'

প্রতিমা পূজা নিয়ে এক শিক্ষকের সঙ্গে কথা হচ্ছে। শিক্ষকটি তাঁকে দেখতে এসেছেন। তিনি প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে বলছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'প্রতিমা পুজোতে দোষ কোথায়?' নিজেই উত্তর দিচ্ছেন, 'বেদান্তে আছে, যেখানে অস্তি ভাতি আর প্রিয় সেখানেই তাঁর প্রকাশ। তাই তাঁকে বাদ দিয়ে কোনো জিনিসই নেই।' উদাহরণ দিয়ে বোঝালেন, 'বিয়ে আর স্বামী সহবাসের আগে পর্যন্তই মেয়েরা পুতুল খেলে। বিয়ে হলে পেঁটরায় তুলে রাখে পুতুল —ঈশ্বরকে পেলে আর প্রতিমার দরকার কি!' অনুরাগ ছাড়া, ব্যাকুলতা ছাড়া ভগবানের সন্ধান পাওয়া যায় না। একটা গল্প বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ 'একজনের একটি মেয়ে ছিল। সে খুব কম বয়সে বিধবা হয়েছিল।

স্বামীর মুখ কোনোদিন দেখে নি। অন্য মেয়েদের স্বামী আসে তাই দেখে বাবাকে একদিন বলল, আমার স্বামী কই? বাবা বললেন, গোবিন্দ তোমার স্বামী—তাঁকে ডাকলে তিনি দেখা দেন। এই কথা শোনার পর মেয়েটি ঘরের দরজা বন্ধ করে কাঁদে আর গোবিন্দকে ডাকে। ছোট মেয়ের কান্না শুনে ঠাকুর আর থাকতে পারলেন না, এসে দেখা দিলেন।' আরো একটি গল্প বললেন, ব্যাকুলতার গল্প; বিশ্বাসের গল্প। 'একটি ব্রাহ্মণকে কাজের জন্য একদিন বাইরে যেতে হল। তাঁর বাড়িতে ঠাকুরের সেবা ছিল। তাই সে যাবার সময় ছোট ছেলেটাকে বলে গেল, তুই আজ ঠাকুরের ভোগ দিবি, ঠাকুরকে খাওয়াবি। ছেলেটি ঠাকুবের ভোগ দিল। ঠাকুর তো চুপচাপ। খায়ও না, কথাও কয় না। ছেলেটি অনেকক্ষণ অপেক্ষা কবে যখন দেখল ঠাকুর উঠছেন না তখন সে বলতে লাগল, ঠাকুর এসে তুমি খাও আমি তো আর বসতে পারছি না। তারপর জুড়ে দিল কান্না। ব্যাকুল হয়ে এভাবে খানিকক্ষণ কাঁদতেই ঠাকুর হাসতে হাসতে এসে খেতে শুরু করলেন। ঠাকুরের খাওয়ার পর যখন সে ঠাকুরঘর থেকে গেল তখন বাড়ির সবাই বলল, কই ঠাকুরের ভোগ নামিয়ে আন। এ কথা শুনে ছেলেটি তো হাঁ হযে গেছে, সে বলল, ঠাকুর সব খেয়ে গেছেন। সে কি রে! সবাই ঠাকুর ঘরে গিয়ে তো অবাক।'

নিজের ঘরে সন্ধ্যের সময় তিনি বসে আছেন। ঘরে রাখাল লাটু রামলাল ছাড়াও মণি আছেন। মণির সঙ্গে রামকৃষ্ণ কথা বলছেন। তিনি বললেন, 'আসল কথা হল তাঁকে ভালবাসা, ভক্তি করা।'

প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এসেছেন। জনাইয়ের মুখুয্যে পরিবারের লোক। শ্যামপুকুরে বাড়ি আছে। বেদান্ত চর্চা ভালবাসেন। মাঝে মাঝে ঠাকুরের কাছে আসেন। প্রাণকৃষ্ণকে তিনি বললেন,

'মানুষেই ঈশ্বরের প্রকাশ বেশি।'

প্রাণকৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন, 'পরলোক কেমন?'

'কেশব সেনও এ প্রশ্ন করেছিল।' শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন। 'ঈশ্বর না পাওয়া পর্যন্ত মানুষকে বারংবার জন্মাতে হবে। জ্ঞানলাভ হলে অর্থাৎ ভগবান দর্শনের পর আর এ সংসারে আসতে হয় না। কুমোরেরা রোদে হাঁড়ি শুকতে দেয় দেখেছ। নিশ্চয় দেখেছ তার ভেতরে কাঁচা পাকা দুরকম হাঁড়িই আছে। গরু-টরু যাওয়ার ফলে কতক হাঁড়ি ভেঙে গেলে কুমোর পাকা হাঁড়িগুলো ফেলে দেয় ওগুলো অকেজো—কাঁচা ভাঙলে তা আবার তাল পাকিয়ে নতুন তৈরি করে। সেই রকম যতক্ষণ ঈশ্বর দর্শন হয়নি ততক্ষণ ফিরে ফিরে কুমোরের হাতে যেতে হবে, তার মানে সংসারে ফিরে আসতে হবে। সিদ্ধ ধান পুঁতলে কখনো গাছ হয় না। মানুষ জ্ঞানের আগুনে সেদ্ধ হলে তার দ্বারা আর নতুন সৃষ্টি হয় না। সে মুক্তি পায়।'

প্রাণকৃষ্ণকে বোঝাচ্ছেন ঠাকুর। তাঁর বোধে আলো জ্বেলে দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, 'জ্ঞানীর কিন্তু লক্ষণ আছে। জ্ঞানী কারো ক্ষতি করে না। তার স্বভাব হয় বালকের মতো। জ্ঞানীর ভেতর কোনো অহংকার বা রাগ থাকে না। দূর থেকে পোড়া দড়ি দেখলে মনে হয় ঠিক একগাছা দড়ি পড়ে আছে। সামনে গিয়ে ফু দিলেই সব ছাই উড়ে যায়।'

প্রাণকৃষ্ণ জ্ঞান জ্ঞান বলে বেড়ান তাই অন্তর্যামী পরমপুরুষ তাঁকে জ্ঞানীর অবস্থা বোঝাচ্ছেন। যেন বা নির্দেশ করছেন নিজের জীবনের দিকেই। কখনো শ্রীরামকৃষ্ণর অহঙ্কার প্রকাশিত হয় নি। ছোট্ট সরল সহজ তাঁর বিচরণ। হাসি ঠাট্টা রসিকতা মজার মধ্য দিয়ে ভক্তদের ধরে রেখেছেন। শুধু মাঝে মাঝে নির্দেশ করেছেন ইঙ্গিতের মাধ্যমে—তোমরা বুঝে দেখ আমি কে, আমি কি!

'সংসারে থেকে ভগবান লাভের সবচেয়ে বিশেষ উপায় সত্যবাদিতা। ঈশ্বর সত্যবাদীকে ভালবাসেন। সত্যের মধ্য দিয়েই তাঁকে পেয়ে

থাকে মানুষ।' নিজের কথা বলছেন ঠাকুর, 'আগে আমার সত্যে ভারী আঁট ছিল। যা মুখে বলতাম তাই করতাম। একবার রামের বাড়ি গিয়েছি। সেখানে বলে ফেলেছি লুচি খাব না। কিন্তু যখন খেতে দিল তখন খিদে পেয়েছে। কি আর করি, শেষে মিষ্টি খেয়ে পেট ভরাই।' সবাই হো হো কবে হেসে উঠল এই কথায।

নববিধান আর কেশব সেনেব কথা হচ্ছিল। রাম তো সোজা শ্রীরামকৃষ্ণকে বলেই দিলেন, 'কেশব সেনের ভেতর কিছু নেই!'

শ্রীবামকৃষ্ণ তাই শুনে বললেন, 'ওটা ঠিক নয, কিছু আছে বৈকি, না হলে এত লোকে ওকে মানবে কেন? ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাডা এমন হয় না। তবে কি জান, সংসাব ত্যাগ না কবলে গুরুগিরি করা যায় না। লোকে মানে না।'

'কেশব সেন আপনার সম্বন্ধে কি বলেছেন জানেন?' রাম বলে উঠল, 'আপনি নাকি নববিধানী!' এই কথা শুনে সবারই সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন, 'কে জানে বাপু আমি তো নববিধানের মানেই জানি না!' ঠাকুরের কথা ও ভঙ্গিতে হাসি আরো প্রবল হল।

রাম আরো নানা কথা বলল।

ঠাকুর তাতে কান দিলেন না। তিনি নিন্দা প্রশংসার অতীত। তিনি অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। তিনি বলতে লাগলেন, 'এটা ভাল নয়, এই কথা বলা, আমি বা আমরা যা বুঝি তাই ঠিক, অন্যেরা যা বলে ভুল। বৈষ্ণব আর শাক্তরা তো এমনি রেষারেষি করে। বৈষ্ণবচরণকে আমি সেজোবাবুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম। সেজোবাবু ভগবতীর ভক্ত। সেখানে বৈষ্ণবচরণ বলে বসল কিনা মুক্তি দেবার একমাত্র কর্তা হল কেশব। শুনেই তো সেজোবাবুর মুখ লাল। বলেছিল, শালা আমার! শাক্ত কিনা, তাই বলছে।'

রামের সংসারের কথা হচ্ছে। তাঁর পিতা দ্বিতীয়বার বিয়ে

করেছেন। বাড়িতে তাই অশান্তি। সৎমা এলেই ঝঞ্ঝাট বাধে। তাই রাম বলছেন, 'তিনি বাপের বাড়ি গিয়ে থাকলেই পারেন।'

গিরিশ উত্তর দিলেন, 'তোমার বউকেও অমনি বাপের বাড়িতে রাখ না!' সবাই হাসল।

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসি মুখে বললেন, 'এ কি হাঁড়ি কলসী নাকি! হাঁড়ি এক জায়গায়, সরা এক জায়গায়। শিব একদিকে আর শক্তি একদিকে! আলাদা বাড়ি করে দিতে পার—তবে খরচটা দিতে হবে তোমাকেই। বাবা মা পরমগুরু।'

'বাবা মা যদি ভীষণ পাপ করে থাকেন—কোনো ভয়ানক অপরাধ?' গিরীন্দ্র প্রশ্ন করলেন তখন ঠাকুরকে।

'তা হোক!' শ্রীরামকৃষ্ণ জবাব দিলেন। 'মা দ্বিচারিণী হলেও তাকে ত্যাগ করবে না। এক বাবুদের গুরুপত্নীর চরিত্র নষ্ট হওয়ায় তারা ঠিক করল গুরুর ছেলেকে গুরু করবে। শুনে আমি বললাম, সে কি! তোমরা ওল ছেড়ে ওলের মুখী নিতে চলেছ—তাকে তোমরা ইষ্ট বলে জান, আর এখন'—ঠাকুর শ্লোক বললেন, "যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ী বাড়ি যায়। তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়॥"

একটু থেমে ঠাকুর আবার বললেন, 'মা বাপ প্রসন্ন না হলে কিছু হয় না—তাদের ঋণ শোধ না করতে পারলে কোনো কাজই হয় না। স্ত্রীরও ঋণ আছে। এই যে হরিশ স্ত্রীকে ফেলে এখানে এসে রয়েছে, যদি ওর স্ত্রীর খাবার ব্যবস্থা না থাকত তো বলতুম ঢ্যামনা শালা! তবে প্রেমোন্মাদ হলে কে মা কে বাপ কে স্ত্রী কিছুর ঠিক থাকে না। ঈশ্বরকে ভালবাসে সে মুক্ত; তার কর্তব্য থাকে না কোনো—ঋণের থেকেও রেহাই হয়ে যায়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে নিজের উপলব্ধ অতীত ঘটনা প্রায়ই বলে শোনাতেন ভক্তদের। তাদের মনকে তৈরি করবার জন্য বিশ্বাসকে দৃঢ় করবার জন্যই এমন করতেন। নিজের সাধন জীবনের

কথা বলতে বলতে একদিন বললেন, 'আমার তখন উন্মাদ অবস্থা।' কখন কি যে করি ঠিক নেই। একদিন কালিবাড়িতে কাঙালীরা খেয়ে গেল, আমি তাদের এঁটো পাতা মাথায় আর মুখে ঠেকালুম। হলধাবী তাই দেখে বললেন, কি করছিস তুই! কাঙালীদের এঁটো মুখে দিলি তোর ছেলেপুলেদের বিয়ে হবে? শুনে রেগে গেলাম। হলধারী আমার দাদা। তা হোক, তাকে বললাম, তবে রে শালা, তুমিনা গীতা বেদান্ত পড়? সবাইকে শেখাও ব্রহ্ম সত্য আর জগৎ মিথ্যা? আমার আবার ছেলেপুলে হবে মনে করেছ? তোর গীতা পড়ার মুখে আগুন!'

শ্রীরামকৃষ্ণ স্মৃতি মন্থন করছেন। 'সেসব কি দিন গিয়েছে। দেশে সমবয়সীদের বললাম তোদের পায়ে পড়ি একবার হরিবোল বল। সকলের পায়ে পড়তে যেতাম। তখন চিনে বলত, ওরে তোর এখন প্রথম অনুরাগ তাই সবাইকে সমান লাগছে। প্রথম ঝড়ে যখন ধুলো ওড়ে তখন সব গাছ এক হয়ে যায়। আম আর তেঁতুল আলাদা করে চেনা যায় না।'

কলকাতায় শ্রীরামকৃষ্ণ শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেছেন। কিন্তু তাঁর বাড়ি পৌঁছে দেখা গেল তিনি অনুপস্থিত। ভক্তরা ভাবছেন কি করা যায়। এমন সময় বিজয় গোস্বামী মহলানবীশ প্রমুখ ব্রাহ্মসমাজের মাথারা এসে পড়লেন। তাঁরা সমাদর করে ঠাকুরকে সমাজ মন্দিরে নিয়ে গেলেন। বেদীর নিচে কীর্তনের স্থানে আসন করে শ্রীরামকৃষ্ণকে বসান হল। বসেই তিনি হাসিমুখে বিজয়কে বললেন, 'শুনলাম এখানে নাকি সাইনবোর্ড আছে। অন্য-মতের মানুষদের এস্থানে আসার যো নেই। তাই নরেন্দ্র বললে, সমাজে গিয়ে কাজ নেই, শিবনাথের বাড়িতে যাবেন। তা আমি বলি, সবাই তাঁকে ডাকছে এর মধ্যে রেষারেষির কি আছে। কেউ বলছে তিনি সাকার, আবার কেউ বলছে তিনি নিরাকার। যার যা

ধারণা তাই ভাবুক না কেন—ভাবলে মতুয়ার বুদ্ধি অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক অন্যের ধর্ম ভাল নয় এটা অনুচিত। আমার মত কি জান? আমি মাছ খেতে ভালবাসি। আমার আবার মেয়েলিস্বভাব।' সকলে এই শুনে হেসে ফেলল। 'মাছ ভাজা, হলুদ মাছ, টকের মাছ, বাটি চচ্চড়ি, সব কিছুতেই আমি আছি। আবার মুড়ি ঘণ্টতেও আছি—কালিয়া পোলাওতেও আছি।' হাসি প্রলম্বিত হল দীর্ঘকাল।

বিজয় এসেছেন। ঠাকুব তাঁব সঙ্গে কথা বলছেন। বিজয় আজ কাল ব্রাহ্মধর্মে আর তেমন সাড়া পাচ্ছেন না। সাকারবাদীদের সঙ্গে মিশছেন। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর হেসে তাঁকে বললেন, 'সাকারবাদীদেব সঙ্গে মিশছ বলে সমাজে তোমার নাকি নিন্দা হয়েছে? যে ভগবানের ভক্ত তার কূটস্থ বুদ্ধি হওয়া চাই। যেমন কামারশালের নাই। অনবরত হাতুড়ির ঘা পড়ছে তবু নির্বিকার। অসৎলোকে তোমাকে কত কি বলবে, যদি তুমি আন্তরিক ঈশ্বর অভিলাষী হও তো সব সহ্য করবে। অসৎলোকের বাঘ ভাল্লুকের স্বভাব; তারা তেড়ে এসে অনিষ্ট করবে। এই কজনের কাছ থেকে সাবধান হবে। এক বড়-লোক, দুই কুকুর, তিন ষাঁড় এরপর মাতাল। এদের সবাইকে মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে ঠাণ্ডা করতে হয়। মাঝে মাঝে সৎসঙ্গ করলেই সদ-সৎ বিচার আসে।'

'অবসর পাই না, সমাজের কাজেই আবদ্ধ থাকি।' বিজয় উত্তর দিলেন।

শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ রসিকতা করে বললেন, 'তোমরা আচার্য—অন্যের ছুটি আছে; তোমাদের নেই। নায়েব একধার শাসন করলে জমিদার আবার তাঁকে অন্যধার শাসন করতে পাঠান। তাই তোমার ছুটি নেই।'

ঠাকুরের রসিকতার মজায় সবাই হেসে উঠল।

বিজয় বললেন, 'আপনি কিছু উপদেশ দিন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসছেন। তাঁকে রসে পেয়েছে। তিনি চারপাশ

তাকিয়ে বললেন, 'এ এক রকম ভালই। সারে মাতে। সারও আছে, মাতও আছে।' সবাই পুনরায় হাস্যধ্বনি করে উঠল। আমি বেশি কাটিয়ে জ্বলে গেছি'...হাসছে সবাই। ঠাকুর বলে চলেছেন, 'নক্স খেলা জান? সতের ফোঁটার বেশি হলে জ্বলে যায়। এক ধরনের তাস খেলা। যারা পাঁচে সাতে দশে তারাই শেয়ানা। আমি বোকার মতো জ্বলে গেছি।'

'একবার কেশবের বাড়িতে ওর লেকচার শুনেছি। কেশব বললে, হে ঈশ্বর তুমি আশীর্বাদ কর যেন আমরা ভক্তিনদীতে ডুবে যাই। অনেক লোক শ্রোতা। চিকের আড়ালে বাড়ির মেয়েরাও শুনছে। তখন আমি হেসে বললুম, ভক্ত নদীতে যদি একেবারে ডুবে যাবে তাহলে চিকের ওপাশে যারা রয়েছেন তাদের কি দশা হবে? তার চেয়ে এক কাজ করো, ডুব দেবে আর মাঝে মাঝে আড়ায় উঠবে। একেবারে তলিয়ে যেও না। শুনে কেশব আব অন্য সবাই হো হো করে হেসেছিল।

'সংসারে থেকেও আন্তরিক হলেও ভগবানকে পাওয়া যায়। মনে ত্যাগ করতে বলি আমি। সংসার ছাড়তে বলি না। অনাসক্ত হয়ে সংসারে থাকা।'

প্রসাঙ্গন্তরে গেলেন ঠাকুর, 'শিবনাথকে কেন চাই? যে অনেক-দিন ভগবানের ধ্যান করে তাঁর ভেতর সার আছে। ঈশ্বরের শক্তি আছে। যে ভাল গায় বাজায়, যে কোন একটা বিদ্যা ভাল জানে তার ভেতরও সার রয়েছে। গীতায় একথা বলেছে। চণ্ডীতে আছে যে সুরূপ তার ভেতরও ঈশ্বরের শক্তি রয়েছে।'

বিজয় কেদার দুজনকে এক সঙ্গে দেখে ঠাকুর বেজায় খুশি। হাসি মুখে তিনি বললেন, 'আজ বেশ মিলেছে। দুজনেই এক পথের পথিক। দেখ আমার মনে চারটে ইচ্ছে জেগেছে। বেগুন দিয়ে মাছের

ঝোল খাব, শিবনাথের সঙ্গে দেখা করব। ভক্তেরা হরিনামের মালা জপবে তাই দেখব! আর আট আনার কারণ তন্ত্রের সাধকরা পান করবে তাই দেখে প্রণাম করব।' কথা বলতে বলতে তাঁর সমাধি হল।

সমাধি ভাঙতে আপন মনে কথা বলতে লাগলেন। নানা কথা বলতে বলতে বললেন, 'অনেক রকম তুবড়ী আছে, একবার এক রকম ফুল কেটে গেল—তারপর খানিকক্ষণ অন্যরকম ফুল কাটল আবার আর এক রকম। তার নানা রকম ফুলকাটা ফুরোয় না। আর এক তুবড়ী আছে আগুন দিলেই ভুস করে একটু উঠে ভেঙে যায়। যদি সাধ্য সাধনা করে ওপরে যায় তো এসে আর খবর দিতে পারে না। জীবকোটির অবস্থা তাই; সাধ্য সাধনা করে সমাধি হয় —সমাধির পর নামতে পারে না। তোমাদের দুইই আছে যোগ ও ভোগ। জনকরাজার ছিল।' কথাগুলো বলতে বলতে তিনি প্রকৃতিস্থ হলেন।

'একজন কারণের বোতল এনেছিল।' শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বলছেন, আমি ছুঁতে পারলুম না। সহজানন্দ হলে অমনি নেশা হয়। মদের দরকার পরে না। মার চরণামৃত দেখে পাঁচ বোতল মদ খেলে যেমন নেশা হয় আমার তেমনি হয়। এ অবস্থায় সব সময় সব রকম খাওয়া চলে না।

'খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে যার যা ইচ্ছে তাই ভাল।' নরেন্দ্রনাথ বলে উঠলেন।

'জ্ঞানীর পক্ষে কিছুতেই দোষ নেই।' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ভক্তের পক্ষে তা নয়। আগে আমি সব পারতাম এখন পারি না। আবার খেয়েও ফেলি। কেশব সেনের ওখানে থিয়েটারে লুচি ছক্কা আনলে বেশ খেলাম। ধোবা কি নাপিত আনলে জানি না। সবাই হেসে উঠল। 'দেখ শুয়োরের মাংস খেয়ে যদি ঈশ্বরে টান থাকে সে মানুষ ধন্য! আবার হবিষ্য খেয়ে যদি কামিনী কাঞ্চনে মন থাকে তা হলে সে ধিক্। একবার কামার বাড়ির ডাল খেতে

ইচ্ছে গেল। ওরা বলে বামুনেরা কি রাঁধতে জানে! তাই খেলুম কিন্তু কেমন কামারে কামারে গন্ধ।' সবাই আবার হেসে উঠল।

সুরেন্দ্র প্রচুর মদ্যপান করতেন। তাই দেখে ঠাকুরের খুব চিন্তা ছিল। একেবারে অভ্যাস ত্যাগ করতে বলতে পারেন না। কায়দা করে বললেন, 'দেখ সুরেন যা খাবে ঠাকুরকে নিবেদন করে দেবে। আর যেন পা মাথা টলে না।'

এতক্ষণে রাম এসে পাশে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে ঠাকুর বললেন, 'রাম তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

'আজ্ঞে ওপরে ছিলাম।' রাম উত্তর দিলেন।

তাই শুনে রসিকপ্রিয় শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ওপরে থাকার চাইতে নিচে থাকা কি ভাল নয়? নীচু জমিতে জল জমে। উঁচু জমি থেকে জল গড়িয়ে চলে আসে।'

হাসতে হাসতে রাম বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।' সবাই সেই হাসিতে যোগ দিল মহানন্দে।

পঞ্চবটীতে এক সাধু এসে আছেন। ভয়ানক রাগী। যাকে তাকে গালমন্দ করেন, শাপ দেন। ভক্ত সঙ্গে বসে ঠাকুর। এমন সময় খড়ম পায়ে ওই সাধু এসে হাজির। বললেন, 'হিঁয়া আগ মিলে গা?'

সাধুকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ জোড়হাত করে নমস্কার করলেন। যতক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে ততক্ষণ ঠাকুর হাতজোড় করেই রইলেন। সাধু চলে যাওয়ার পর ভবনাথ বললেন হাসতে হাসতে, 'সাধুর ওপর তো আপনার খুব ভক্তি!'

হেসে উত্তর দিলেন ঠাকুর, 'বুঝলি নে, ও যে তমোমুখ নারায়ণ! যাদের তমোগুণ, তাদের এ রকম ভাবেই খুশি করতে হয়। এ যে সাধু!' এই কথা শেষ করে প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করতে লাগলেন। নানা রকম সাধনার কথা হচ্ছিল। ভক্তদের তিনি বললেন, 'ভগবানের কাছে যাবার অনেক পথ অনেক মত। যেমন কালীঘরে নানা পথ

দিয়ে পৌঁছনো যায়। তবে কোনো পথ শুদ্ধ কোনোটা নোংরা—সুতরাং পরিষ্কার পথে যাওয়াই ভাল। মত পথ অনেক দেখেছি। এসব আর ভাল লাগে না। সবাই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে। তোমরা আপন লোক, আজ তোমাদের বলছি, শেষ এই বুঝেছি, তিনি পূর্ণ আমি তাঁর অংশ, তিনি প্রভু আমি দাস মাত্র ; আবার এক এক সময় মনে হয় তিনিই আমি আমিই তিনি।'

ভক্তরা নিস্তব্ধ হয়ে এই কথা শুনলেন। অর্থাৎ উনি কি গভীর নির্দেশ করছেন এই কথায় !

'তাঁকে পেলে সব পাব—এই বলে কাঞ্চন ত্যাগ করলুম—'ঠাকুর বলছেন, 'গঙ্গার জলে টাকা ছুঁড়ে ভয় হল লক্ষ্মী যদি রেগে যান। যদি খ্যাঁট বন্ধ করে দেন তাঁর ঐশ্বর্য অবহেলা করায় ! তখন বললাম, মা তোমায় চাই আর কিছুই চাই না। তাঁকে পেলে তখন সব পাব।'

ভবনাথ শুনে হেসে বললেন, 'এ আপনার পাটোয়ারী বুদ্ধি !'

'হ্যাঁ ওইটুকু পাটোয়ারী বলতে পার—'ঠাকুরও হাসতে লাগলেন। বললেন, 'একজনকে ভগবান দেখা দিয়ে বললেন, তোমার তপস্যায় খুব খুশি হয়েছি এখন তুমি একটি বর নাও। সাধক তাই শুনে উত্তর দিলেন, হে ঠাকুর বর যদি দিতেই চাও তো এই বর দাও, যেন সোনার থালে নাতির সঙ্গে বসে খাই। বোঝ একবার। এক বরেতে অনেক হল। ঐশ্বর্য ছেলে নাতি !'

পাটোয়ারী বুদ্ধির উদাহরণ শুনে ভক্তরা তো হেসেই খুন।

হাজরার কথা বললেন। 'দেখ, হাজরা জপ ধ্যান করে বলে, তিনি টাকা দেবেন। কিছু টাকা সে চায়। বাড়িতে কষ্ট, দেনা।'

একজন ভক্ত জানতে চাইল, 'ঈশ্বর কি মনের ইচ্ছা মেটাতে পারেন না ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'সেটা তাঁর ইচ্ছা। তবে প্রেমোন্মাদ না হলে তিনি সব ভার নেন না। ছোট ছেলেকেই সবাই হাত ধরে খেতে

বসায়। বুড়োদের কে দেয়? তাঁর চিন্তা করে যারা নিজেদের ভার বহনে অক্ষম, তিনি তাদের ভারই নেন।'

অধরের বাড়ি গিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বহু লোক এসেছে। ভক্তরাও অনেকে উপস্থিত। কীর্তন হবে। কীর্তন শুরু হল। বৈষ্ণবচরণ গান ধরলেন। ঠাকুর বললেন, 'ইনি বেশ গান করেন।' ঠাকুর নিজেও গান ধরলেন। অনেক বাদে গান শেষ হল। সমাজে গোলমাল হতে পারে ভেবে কেদার না খেয়ে চলে যেতে চাইছিলেন। অথচ ঠাকুর সেখানে অন্ন গ্রহণ করলেন। কেদার তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। ঠাকুর যেখানে আহার করছেন সেখানে তিনি কোন ছার। তিনি তাই আহারান্তে বললেন, অনেক লোক খাওয়াতে আসে। কি করব প্রভু আপনি আদেশ দিন।'

জবাবে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ভক্ত হলে চণ্ডালের অন্নও শুদ্ধ। সাত বছর পাগল ভাবের পর ওদেশে গিয়েছি। তখন সে কি অবস্থা! খানকী পর্যন্ত খাইয়ে দিলে—এখন কিছু পারি না।'

সাকার নিরাকার নিয়ে কথা হচ্ছে। ঠাকুর বললেন, 'সব মানতে হয় গো! নিরাকার সাকার সব! ধ্যান করতে করতে কালীঘরে দেখলুম, রমণী খানকী! বললুম মাকে, তুই এইরূপেও আছিস! তাই বলছি সব মানতে হয়। তিনি কখন কি ভাবে দেখা দেবেন তা বলা যায় না।'

'বিষয়ী লোকদের এক দস্তুর—পাঁচটা লোক আসবে যাবে, সে ভাবে বাজারে খুব নাম হবে। যদুর বাড়িতে মল্লিক এসেছিল।' শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের বিষয়ী লোকের কথা বলছেন, 'খুব চালাক আর শঠ, চোখ দেখেই বুঝে নিলাম। চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'চতুর হওয়া ভাল নয়, কাক খুব শেয়ানা, ধূর্ত কিন্তু সে পরের গু খেয়ে মরে। যদুর মা অবাক! বললে, বাবা! তুমি কেমন করে জানলে ওর কিছু নেই। চেহারা দেখেই বুঝেছিলাম, লোকটা লক্ষ্মীছাড়াও।'

ভক্তদের আচরণের কথা বলছেন। 'হরিপদ ঘোষপাড়ায় এক মাগীর পাল্লায় পড়েছে। ছাড়ে না। কোলে করে খাওয়ায়। তার নাকি গোপাল-ভাব। আমি সাবধান করে দিয়েছি। বলেছি বাৎসল্য থেকেই তাচ্ছল্য হয়। আসল কথা কি জান? মেয়েমানুষ থেকে বহু দূরে থাকতে হয় ভগবান পেতে হলে। যাদের মতলব খারাপ, সেসব মেয়ে-মানুষের কাছে যাতায়াত করা, তাদের হাতে কিছু খাওয়া পাপ। তারা সত্ত্বা হরণ করে। মেয়েমানুষকে বিশ্বাস করবে না। অনেক মেয়েছেলে জোয়ান ছোকরা দেখলে নতুন মায়ার ফাঁদ পাতে। বাৎসল্য দেখায়। তাই গোপাল ভাব। জিতেন্দ্রিয় হতে হলে নিজের মধ্যে মেয়ে ভাব আরোপ করতে হয়। আমি অনেকদিন সখীভাবে ছিলুম। আট মাস পরিবারকে কাছে এনে রেখেছিলুম। দুজনেই মায়ের সখী। সাধক অবস্থায় খুব সাবধান হতে হয়। তখন মেয়েদের থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে হয়। ভক্তিমতী হলেও খুব কাছে যেতে নেই। ছাদে ওঠবার সময় হেলতে দুলতে নেই। তাতে পড়ে যাবার ভয় থাকে। যারা দুর্বল তাদের ধরে ধরে উঠতে হয়। একবার উঠতে পারলে অত ভয় নাই। সিদ্ধ অবস্থায় আলাদা কথা। উঠবার পর ছাদে নাচলেও কিছু হয় না। কিন্তু সিঁড়িতে নাচা যায় না। কথাটা হচ্ছে বুড়ী ছুঁয়ে তারপর যা ইচ্ছে কর।

ধ্যানের কথায় বললেন, 'চোখ চেয়েও ধ্যান হয়। কথা হচ্ছে তাও ধ্যান হয়। যেমন ধর একজনের দাঁতের রোগ আছে। দাঁত কনকন করে। তিনি যতই কাজ করুন মনটা ওই দরদের দিকে পড়ে আছে। তাই ধ্যান চোখ চেয়ে এমন কি কথা বলতে বলতেও করা যায়।'

একজন একদিন জিজ্ঞেস করলে, 'কই ঈশ্বরকে দেখতে পাইনা কেন?'

শ্রীরামকৃষ্ণ তার উত্তরে বললেন, 'তা তোমার বড় মাছ ধরবার মন,

হয়েছে তো তার আয়োজন কর। চারা কর। হাতসুতো ছিপ আন। গন্ধ পেয়ে গভীর জল থেকে মাছ ছুটে আসবে। জল নড়লে বুঝবে বড় মাছ আসছে। মাখন খেতে সাধ? বেশ তো দুধে মাখন আছে, ঘাটতে হবে তবে মাখন উঠবে। ঈশ্বর আছেন বলে চেঁচালেই কি তাঁকে দেখা যায়? সাধন চাই। সেই ব্যবস্থা করো।'

'কেন তীব্র বৈরাগ্য হয় না জানতে চাইছ?' ভক্তদের দিকে তাকালেন পরমপুরুষ। 'তার অর্থ আছে। মনের মধ্যে যে বাসনা প্রবৃত্তি সব রয়ে গেছে। হাজরাকে বলেছি, ও দেশে মাঠে জল নিয়ে আসে, চারদিকে আল, যাতে না জল বেরিয়ে যায়। কাদার আল, কিন্তু আলের মাঝে মাঝে ঘোগ। গর্ত। প্রাণপণে যত জল আনুক ওই ঘোগ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সাধন করছে—কিন্তু বাসনা রয়েছে পেছনে। সেই বাসনা ঘোগ দিয়ে সব বেরিয়ে যাচ্ছে।

'শটকা কল দিয়ে মাছ ধবে। বাঁশ সোজা থাকে তবু নোয়ানো কেন? মাছ ধরার জন্য। বাসনা মাছ, মন তাই সংসারে নুইয়ে রয়েছে। বাসনা না থাকলেই সহজে মন ঈশ্বরের দিকে সোজা হয়ে থাকে।'

ঈশানকে বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'খোসামোদে কখনো ভুলবে না। বিষয়ী লোকদের চারপাশে খোসামুদেরা জুটে যায়। যারা সংসারী তারা তিনজনের দাস। মেগের টাকার আর মনিবের। সংসারী সে যত জ্ঞানীই হোক তার পরামর্শে কাজ হয় না। ঈশ্বর প্রেমে পাগল হও।'

ঈশান শ্রীরামকৃষ্ণের পাদস্পর্শ করে উপদেশামৃত শুনছেন। কী গভীর কথা! কি সহজ সরল বাক্য! মনের সবটুকু স্বচ্ছ করে দেয়। আমোদে ক্লান্তি শুষে নেয়।

কালী মন্দিরের সামনে বসে কথা হচ্ছে। ভক্তরা চারদিক ঘিরে। এবার তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সমস্তদিন ভক্তসেবা করছেন। তাদের

অমৃতময় জগতের প্রবেশদ্বার দেখাচ্ছেন। ক্লান্তিহীন এই পরব্রত। নিজের সিদ্ধ নিয়ে একা একা অমৃত স্বাদ তাঁর কাঙ্ক্ষা নয়—সকলকেই সেই রস সেই মজা উপলব্ধি করাতে তিনি বদ্ধপরিকর। রসের হাঁড়ি নিয়ে তাই বসেছেন। যার খুশি এস নিয়ে যাও। গম্ভীর জ্ঞান সকলে বোঝে না, শাস্ত্রবাক্য ভীষণ কঠিন। কিন্তু সে রাস্তায় পাঠ পড়ান নি পরমপুরুষাবতার। তিনি রসের রাস্তায় গল্পের মধ্যে দিয়ে রসিকতায় মধুর তানে সকলকে তৃপ্তি দিয়েছেন।

'ধর্মাধর্ম কি জান ?' ঠাকুর ভক্তদের বোঝাচ্ছেন। 'এখানে ধর্ম মানে বৈধীধর্ম। তাতে দান শ্রাদ্ধ কাঙালীভোজন এসব করাতে হয়। একে কর্মকাণ্ড বলে। খুব কঠিন পথ। নিষ্কামকর্ম করা খুব কঠিন। তাই ভক্তিপথ আঁকড়ে থাকাই ভাল। একটা গল্প শোন তবে। একজনের বাড়িতে শ্রাদ্ধ। বহু নিমন্ত্রিত খাচ্ছে। এক কসাই একটি গরুকে কাটতে নিয়ে যাচ্ছে। গরু বাগ মানছে না—কসাই হাঁপিয়ে পড়েছে। এমন সময় সে ভাবলে শ্রাদ্ধ বাড়িতে খেয়ে গায়ে জোর করে নি তারপর গরু কাটব। সে তাই করল। যখনই ওই গরুকে কাটল, তখন যে শ্রাদ্ধ করছিল গো হত্যার পাপ তারও হল। তাই বলছি মনে ভক্তি নিয়ে চল। তাতেই হবে।'

এক কালীপুজোর রাতে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। দাঁড়ান অবস্থায় বাহ্যজ্ঞান লোপ। সকলে অবাক হয়ে দেখছেন এই মহাভাব। একটু পরেই জ্ঞান ফিরতে গালে হাত দিয়ে চিন্তা করছেন। তিনি যেন দৈববাণী করছেন। বলছেন আপন মনে, সব দেখলাম। কার কতটা হয়েছে। রাখাল মণি সুরেন্দ্র বাবুরাম আরো আরো অনেককে দেখলাম।'

হাজরা পাশে ছিলেন। বললেন,'এখানের খবর—বন্ধন কি বেশি?'

'না।' তিনি উত্তর দিলেন।

হাজরা আবার শুধোলেন, 'নরেন্দ্রকে দেখলেন ?'

'দেখি নি।' ঠাকুর বললেন, 'তবে এখনো বলতে পারি একটু জড়িয়ে পড়েছে, কিন্তু সবাইয়ের হয়ে যাবে দেখলুম। সব দেখতে পেলাম ঘাপটি মেরে বসে রয়েছে।' ভক্তরা এসব শুনে অবাক। তিনি বলে চলেছেন, 'নিত্যগোপালের মতো যদি কয়েকটা হয়।' আবার থেমে বলছেন, 'অধর সেন, যদি কর্মকাজ কমে—কিন্তু ভয় হয় সাহেব আবার বকবে। হয়তো বলে বসবে, এ কেয়া হ্যায়!' সবাই হেসে উঠলেন ঠাকুরের রসিকতায়। এই দৈববাণীর মতো কি গভীর বিষয—পরমুহূর্তেই তাব সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন সহজ হাসির উপকরণ। এমনিই তাঁর জীবনকাণ্ড জড়িয়ে আছে রস-সাগরে।

শ্রীরামকৃষ্ণর আগ্রহ ছিল সবদিকে। তিনি মহেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরাণী বইটি আনবার জন্য। সেদিন মাস্টার বইটি নিয়ে এসেছিলেন। পঞ্চবটীতে সমস্ত ভক্ত পরিবৃত হয়ে ঠাকুর মাস্টারকে বললেন, 'কই বইখানা এনেছ কি?'

মহেন্দ্রলাল বললেন, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'পড়ে আমায় একটু শোনাও দেখি।' শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে বললেন।

মাস্টার পড়ে পড়ে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। প্রফুল্লকে বলা ভবানী পাঠকের উক্তি, আমি দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করি শুনে তিনি বললেন, 'ও তো রাজার কাজ।' আবার পড়া চলল। যেখানে ভক্তি বিষযক কথা আছে মাস্টার সে জায়গা থেকে পড়লেন। যেখানে প্রফুল্লর সহচরী নিশি বলছে শ্রীকৃষ্ণ তার স্বামী। মাস্টার শ্রীকৃষ্ণর বর্ণনা পড়লেন। নিশি বলছে, শ্রীকৃষ্ণে সব মেয়েরই মন উঠতে পারে। তাঁর রূপ যৌবন ঐশ্বর্য গুণ সব কিছুই অনন্ত। প্রফুল্লের সাধনের কথা এবার শোনালেন মাস্টার।

ঠাকুর চুপ করে শুনছিলেন। প্রফুল্লর বিদ্যাশিক্ষার কাহিনী।

এবার তিনি বললেন, 'যে লিখেছে তাদের মত হল না পড়লে শুনলে জ্ঞান হয় না! এদের ধারণা আগে লেখাপড়া তারপর ঈশ্বর। ঈশ্বরকে জানতে হলে লেখাপড়া চাই। কিন্তু রাম আগে তবে রামের ঐশ্বর্য। তাই বাল্মিকী মরা মন্ত্র জপ করেছিলেন।'

সাধন শেষে প্রফুল্লর সঙ্গে ভবানী ঠাকুরের দেখা করতে আসার জায়গায় নিষ্কাম কর্মের উপদেশ শুনে ঠাকুর বললেন, 'এ জায়গাটা বেশ। গীতার কথা। কিন্তু দেখ শ্রীকৃষ্ণ ফল সমর্পণ বলেছে, ভক্তি বলে নি।' যেখানে ধন সমর্পণের সময় ভবানী ঠাকুর নিজেকে রক্ষার জন্য কিছু ধন রাখতে বলছেন সেই জায়গা শুনে বললেন, 'এই হল পাটোয়ারী—যে ভগবানকে চায় সে একেবারে ঝাঁপ দেয়—দেহ রক্ষার জন্য কিছু রইল এ হিসেব করে না। গীতার শ্লোক উদ্ধৃতি শুনে বললেন, 'এগুলো উত্তম ভক্তের লক্ষণ।' এক জায়গায় ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লকে বলছেন, কখনো কখনো কিছু দোকানদারী চাই। বিরক্ত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। বললেন, 'দোকানদারী চাই, যেমন আকর তেমনি কথাও বেরোয়। রাতদিন বিষয় চিন্তা লোকের সঙ্গে কপটতা করে করে কথাগুলোও অমন হয়ে পড়ে।'

পাঠ শেষ হলে শ্রীরামকৃষ্ণ হাসতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত পতিব্রতার ধর্ম। এক রকম মন্দ নয় পতিব্রতার ধর্ম। প্রতিমায় ঈশ্বর পুজো হয় তবে জ্যান্ত মানুষে কেন হবে না! তিনিই মানুষ হয়ে লীলা করছেন।'

নরেন্দ্র এসেছেন। গিরিশ ঘোষ তখন ঠাকুরের কাছে যাতায়াত করছেন। নরেন্দ্র গিরিশের বাড়িতে যান। গিরিশ যদিও ঠাকুরে অগাধ বিশ্বাসী, তবু সংসার করেন। ঠাকুর জানেন নরেন্দ্র সংসারে যাবেন না। তাই মনে ভয়। নরেন্দ্রর জন্য চিন্তা। ওকে দেখেই বললেন, 'তুই বলে প্রায়ই গিরিশের ওখানে যাস?'

'আজ্ঞে, যাই।' নরেন্দ্র উত্তর দিলেন। 'মাঝে মধ্যে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ তাই শুনে বললেন, 'তুই কি ওখানে খুব যাস ?' আপন মনে বললেন, 'ছোকরারা শুদ্ধ আধার। রসুনের বাটি যতই ধোও না কেন গন্ধ একটু থাকবেই। অনেক দিন ধরে কামিনী-কাঞ্চন ঘাঁটলে রসুনের গন্ধ হয়। যেমন কাকে ঠোকরানো আম। ঠাকুরকে দেওয়া যায় না। দৈ পাতা হাঁড়িতে দুধ রাখতে ভয় হয়—দুধ প্রায়ই নষ্ট হয়ে যায়। কি বলব, সংসারে সবাই দেখছি কলাই ডালের খদ্দের—কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে পারে না।'

অতএব কথা বলছেন ঠাকুর নরেন্দ্রকে সাবধান করবার জন্য। তিনি চান না ওর কোন ক্ষতি হোক। তাই বোঝাচ্ছেন গিরিশদের থাক আলাদা—তাদের যোগ ভোগ দুই-ই রয়েছে। কিন্তু নরেন্দ্র অন্য জাতের। ঈশ্বরের জন্য নির্দিষ্ট। তাই তো এমন করে বোঝানো।

নরেন্দ্র বললেন, 'গিরিশ এখন ভোগ ছেড়ে অন্য চিন্তাই করে।'

ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'খুব ভাল কথা। কিন্তু এত মুখ খারাপ করে কেন ? আমি তা পারি না। বাজ পড়লে ঘরের ভারী জিনিস তত নড়ে না। কিন্তু জানালা দরজা খটখট করে। সত্ত্বগুণের অবস্থায় গোলমাল অসহ্য—হৃদে তাই থাকল না—মা ওকে সরিয়ে দিলেন। শেষদিকে বাড়াবাড়ি করত। আমাকে গালাগালি দিত। যাক গিরিশ যা বলে তোর সঙ্গে মেলে ?'

'তিনি অবতার বলে ভাবেন, আমি কিছুই বলি নি।' নরেন্দ্র উত্তর দিলেন।

'খুব বিশ্বাস কিন্তু, লক্ষ্য করেছিস ?'

ঠাকুরের এই কথায় সব ভক্ত তাঁর দিকে তাকিয়ে। উনি প্রকারান্তকে কি বলতে চাইছেন। তার মানে উনি যে অবতার তাই কি বলছেন ! ঠাকুর গান ধরলেন। দরদ ভরা গান। নরেন্দ্রর চোখে জল এসে পড়ল। তাঁর পিতৃবিয়োগের পর অনেক ঝামেলা যাচ্ছে। তিনি তাই সামলাচ্ছেন। তাই ঠাট্টা করে ঠাকুর বললেন, 'তুই কি

চিকিৎসক হয়েছিস ?' সরল ঠাট্টায় সবাই হেসে উঠল। দুঃখ ভুলে নরেন্দ্রও হাসিতে যোগ দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণর গলার রোগ তখনো ধরা পরে নি। একদিন বলরামের বাড়িতে তিনি বালকের ন্যায় সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার মুখ কেমন শুকিয়ে আসছে। সবাইর কি শুকুচ্ছে ? তিনি খুব অগো-ছালো হয়ে বসে। ভক্তরা তার বিভ্রান্ত ভাব দেখে কেউ কেউ হাসছেন। ঠাকুর তাই দেখে ওদের বললেন, 'ঠিক যেন মাই দিতে বসেছি।' সবাই হাসল উপমা শুনে।

ঠাকুরের গলায় বিচি হয়েছে। খেতে কষ্ট হবে। তাই বিকেলে বলরাম তাঁর জন্য মোহনভোগের ব্যবস্থা করে থালায় করে পাঠালেন। বালকরূপী ঠাকুব তাই দেখে তাঁব স্বভাবজাত রহস্যপ্রিয়তায আনন্দে বলে উঠলেন, 'ওরে মাল এসেছে। খা খা ! মাল মাল !' সকলেই হো হো করে হেসে উঠল।

বিকেলে বোসপাড়ার গলিতে তিনি ঢুকেছেন। নিজেই হাসতে হাসতে মাস্টারকে বলছেন, 'শালাবা বলে কি ! পরমহংসের ফৌজ আসছে ?' ঠাট্টার হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে সবাই হাসতে লাগল।

ভক্তদের মনে উদ্দীপনা সৃষ্টির জন্য ঠাকুর মাঝে মাঝে তাদের লড়িয়ে দিতেন। গিরিশের বাড়িতে মহিমাচরণকে ঠাকুর বললেন, 'গিরিশকে বললুম তোমার নাম করে একজন লোক আছে—গভীর, তোমার এক হাঁটু জল। তা এখন যা বলেছি মিলিয়ে দাও দেখি। তোমরা দুজনে বিচার করো, কিন্তু রফা করবে না।' আবার এক ঝাঁক হাসি ঝরে পড়ল।

প্রেমের মানে বোঝাচ্ছেন ঠাকুর। গিরিশ প্রশ্ন করলেন, 'একাদশী প্রেম বলতে কি বোঝায় ?'

উত্তর দিলেন পরমজ্ঞানী পরমপুরুষ। 'একাদশীর অর্থ কি ? ভাল-বাসা এক তরফের। যেমন ধরো হাঁস জল চাচ্ছে অথচ জল তাকে

চায় না। তবু হাঁস জলকে ভালবাসে। আরো আছে সাধারণী, সমঞ্জসা, সমর্থা। সাধারণী প্রেম হল আপনার সুখ, অপর চাক না চাক—যেরকম চন্দ্রাবলীর ভালবাসা। আর সমঞ্জসা, আমারও সুখ হোক, তোমারও হোক। এ ভাব ভাল। কিন্তু সবচেয়ে উঁচু অবস্থা হচ্ছে রাধার—সমর্থা। কৃষ্ণ সুখে সুখী—তোমার সুখ হোক—আমার যা হয় হবে। গোপীদের এই ভাব খুবই উঁচু দরের।' অন্তরঙ্গ কি তার ব্যাখ্যায় বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ, 'যেমন নাটমন্দিরের ভিতরের নাম বাইরের নাম। যারা সর্বদা কাছে থাকে তারাই অন্তরঙ্গ।'

শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃত জ্ঞান বোঝাচ্ছেন মহিমাচরণকে। বললেন, 'কেউ কেউ জ্ঞানের চর্চা করে বলে ভাবে তারা কি হয়েছে। কিন্তু আসল জ্ঞান হলে অহঙ্কার থাকে না। কি রকম জ্ঞান? ঠিক দুপুর বেলা সূর্য মাথার ওপর থাকে। তখন মানুষ চারদিকে চেয়ে দেখে আর ছায়া নেই। তেমনি সমাধিস্থ হলে অহং রূপ ছায়া থাকে না। জ্ঞান ভক্তি দুটোই পথ—যে রাস্তা ধরেই যাও—তাঁকেই লাভ করবে। শুধু জ্ঞানী আর ভক্ত দুভাবে তাঁকে দেখে। জ্ঞানীর ভগবান তেজোময় আর ভক্তের ভগবান রসের সাগর।'

শ্রীরামকৃষ্ণের চিকিৎসক সব নেতি নেতি করেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁর অসাধারণ ভালবাসা। তবু তর্কের শেষ নেই। ওর ভাব দেখে ঠাকুর মজা পেতেন। ঠাকুর বললেন একদিন ভক্তদের, 'এখন ও বিচার করছে, পরে সব মানবে। কলাগাছের খোলা ছাড়িয়ে মাঝ পাওয়া যায়। খোলা ভিন্ন পদার্থ, মাঝ ভিন্ন। শেষে কিন্তু মানুষের এই বোধ হয় খোলারই মাঝ, আবার মাঝেরই খোল।' ডাক্তারের দিকে দেখিয়ে তিনি হেসে বললেন, 'দেখ সেদ্ধ হলে সব নরম হয়, এ খুব কঠিন ছিল এখন ভেতরে ভেতরে বেশ একটু নরম।'

শ্যাম বসু এসেছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন ঠাকুর। শ্যাম বসু

বললেন, 'সেদিন আপনি বড় সুন্দর বলেছিলেন।'

'কি কথা ?' শ্রীরামকৃষ্ণ জানতে চান।

হেসে শ্যাম বসু বললেন, 'সেই কাঁটার বিষয়ে।'

শ্রীরামকৃষ্ণও হাসলেন। 'হ্যাঁ, পায়ে কাঁটা ফুটলে যেমন আরেকটি কাঁটা নিয়ে তবে সেটি তুলে ছুটো কাঁটাই ফেলতে হয় তেমনি অজ্ঞান কাঁটা তুলতে জ্ঞানকাঁটার দরকার। অজ্ঞান দূর হলে জ্ঞান অজ্ঞান ছুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।' শ্যাম বসুকে বললেন তিনি, 'সংসারে কি আছে ? আমড়ার টক। আমড়া খেতে সাধ হয় কিন্তু কি থাকে তাতে আঁটি আর চামড়া। খেলেই অম্বল।' আরো বললেন, 'এই সংসারে চিনি আর বালি মেশানো। পিঁপড়ের মতো চিনিটুকুই নিতে হয়। আর দেখ, দাঁত যখন সব পড়ে গেছে তবে আর ছুর্গাপুজো কেন ?' সবাই হেসে উঠল। 'একজন বলেছিল, অন্য একজনকে ছুর্গাপুজো কর না কেন ? অন্যজন উত্তর দিয়েছিল, আর দাঁত নাই ভাই। পাঁঠা খাবার ক্ষমতা গেছে।' নিজের অসুস্থতা ভুলে তিনি অন্যকে শিক্ষা দিচ্ছেন। অন্যের মঙ্গল ভাবছেন। মনের মধ্যে বেদনাকে চাপা দিয়ে রসের কারবার করছেন। এ রসিক কেমন রসিক !

গিরিশ জিজ্ঞেস করছেন, 'আচ্ছা মনটা এই উঁচুতে আছে আবার নিচু হয় কেন ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'সংসারে থাকতে গেলেই অমন হবে। কখনো উঁচু কখনো নিচু। কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে থাকতে হয় বলেই। যেমন সাধারণ মাছি, কখনো সন্দেশে বসছে আবার কখনো ময়লায় বসছে। ত্যাগীদের কথা আলাদা। মৌমাছি যেমন শুধু ফুলে বসে মধু খাবে বলে। অন্য জিনিস তাদের প্রিয় নয়।'

গিরিশ ঠাকুরকে বলছেন, 'আপনার সব বেআইনী। আপনি ইচ্ছে করলে সবাইকে নির্লিপ্ত আর শুদ্ধ করে দিতে পারেন। কি সংসারী কি ত্যাগী সকলকেই ভাল করতে পারেন।'

'হ্যাঁ, তা হতে পারে,' শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন, 'ভক্তি নদী ওথলালে ডাঙায় এক বাঁশ জল !'

কাশীপুরের বাগানবাড়িতে ঠাকুর অসুস্থ। ভক্তরা সেবা করছেন। অসুস্থ অবস্থায়ও তিনি সকলকে উপদেশ বিতরণ করছেন। কথার নিবৃত্তি নেই। ঈশ্বরীয় আলোচনা। ভক্তির পথ নিয়ে অমৃত বাণী। ঠাকুর নিজের কথা বলছেন। কথা বলতে কষ্ট, তবু বলছেন। তোমাদের সবাইকে আত্মীয় বোধ হয়—কেউ পর নয়। সব দেখছি, একটা একটা খোল নিয়ে মাথা নাড়ছে। যখন দেখি তখন মনের যোগ হয়—কষ্ট পড়ে থাকে এক ধারে। এখন দেখছি একটা চামড়া ঢাকা অখণ্ড, আর এক পাশে গলার ঘা-টা পড়ে আছে।

গুজরাতী ভক্ত হীরানন্দ এসেছেন। তিনি ঠাকুরের সেবা করছেন। আজকাল শ্রীরামকৃষ্ণ দেহে কাপড় রাখতে পারেন না। প্রায় ছোট ছেলের মতো বসনহীন হয়েই থাকেন। হীরানন্দের সঙ্গে অন্য দুজন ব্রাহ্মণ ভক্ত এসেছে। তাই মাঝে মাঝে কাপড়খানা টেনে নিচ্ছেন। তিনি হীরানন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাপড় খুলে গেলে তোমরা কি অসভ্য বল ?'

'আপনার তা জেনে কি হবে—আপনি তো বাচ্চা।' হীরানন্দ জবাব দিলেন। একটু বাদে হীরানন্দ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বিশেষ করে বাংলা দেশে থাকতে বলেছিলেন। কিন্তু হীরানন্দ রাজী হন নি।

শ্রীরামকৃষ্ণ যা বোঝান তা প্রাঞ্জল করে দেন। ঈশানের সঙ্গে সেদিন কথা বলছেন। 'ভক্তিই শ্রেষ্ঠ পথ। দাস ভাব থেকে অন্য ভাব আসে। শান্ত সখ্য প্রভৃতি। মনিব তার চাকরকে ভালবেসে বলতে পারে আয় আমার কাছে বস। তুইও যা আমিও তা। কিন্তু চাকর প্রভুর কাছে যদি নিজে থেকে বসতে যায় তাহলে সে

রাগ করবে না ?'

ঈশান ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এসব মান্য করেন। ঠাকুর তাঁর এই দুর্বলতা জানেন। তাই কথায় কথায় তাঁকে বলছেন, তুমি ব্রাহ্মণ আর পণ্ডিত নিয়ে বেশি মাতামাতি করবে না। ওদের চিন্তা দু পয়সা রোজগারের—আমি দেখেছি, স্বস্ত্যয়ন করছে ব্রাহ্মণ, চণ্ডী বা অন্য কিছু পড়ছে। অর্ধেক পাতা উল্টে যাবে।' সবাই এই কথায় হাসির খোরাক পেল। পেশাদার পূজারীদের নিন্দে করছেন তিনি। নিজেকে মারবার জন্য একখানা নরুণই যথেষ্ট। কিন্তু অন্যকে মারতেই ঢাল তরোয়াল লাগে। আর একটা কথা, খুব বেশি আচারের বাড়াবাড়ি করবে না। এ প্রসঙ্গে একটা কাহিনী শোন। এক সাধুর খুব জলতেষ্টা পেয়েছে, এক ভিস্তিঅলা জল নিয়ে যাচ্ছিল। সে সাধুকে জল দিতে চাইল। তখন সাধু জানতে চাইলেন তার চামড়ার মোশকটি পরিষ্কার কিনা ? উত্তরে ভিস্তিঅলা বললে, 'আমার মোশক খুব পরিষ্কার কিন্তু তোমার মোশকের মধ্যে মলমূত্র নানারকম ময়লা রয়েছে। সুতরাং এই মোশক থেকে জল খাও, এতে দোষ লাগবে না।' তোমার মোশক অর্থে তোমার শরীর, পেট। সহজ স্বচ্ছ উপমা। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'তাঁর নামে বিশ্বাস করো—বিশ্বাসই সব—তখন তীর্থ পুণ্যের দরকার নেই।' কথা শেষ করে ঈশানের দিকে তিনি তাকালেন। প্রশান্ত বরাভয় দৃষ্টি। মুখে উদ্ভাসিত হাসি এনে রহস্য করে বললেন, 'আর কিছু খোচমোচ থাকলে জেনে নাও। সন্দেহ বিষ রাখতে নেই। সব বিষ মন থেকে নামিয়ে ফেল।'

ঈশান বললেন, 'তার মানে বিশ্বাসই সব—বিশ্বাস থাকলেই হবে।'

'হ্যাঁ, বিশ্বাস দিয়েই তাঁকে পাওয়া যায়—বিশ্বাসের ভেতর সমস্ত রয়ে গেছে। সব বিশ্বাস করতে হবে সন্দেহাতীত ভাবে গাই গরু যখন বাছ-বিচার করে খায় তখন দেখবে দুধ কম দেয় কিন্তু নির্বিচারে

সব খেলে হুড়হুড় করে দুধ দিতে থাকে।'

'আমি যে সংসারে পড়ে আছি।' ঈশান বললেন।

'এই সংসার মজার কুটি, আমি খাই-দাই আর মজা লুটি—একজন গান গেয়ে একথা বলেছিল।' ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'জনক রাজা দু দিক রেখেছিলেন তাই দুধের বাটি খেয়ে ছিলেন। দেখ গোপন সাধন-ভজন করে ভগবানকে লাভ করে গৃহে থাকলেই জনক রাজা হওয়া যায়। তা যদি না তো কি করে হবে?' শ্রীরামকৃষ্ণ গল্পের মধ্যে দিয়ে গৃহী ভক্তের মনের জোর বাড়াচ্ছেন। সমস্ত সংসার জুড়ে ভগবানের প্রেমরস ছড়ানো—সেই রসের সাগরে সকলকে তিনি অবগাহন করাচ্ছেন অনায়াসে। অসামান্য পরমপুরুষ তিনি সমস্ত কঠিন বিষয় তাঁর অধিগত বলেই তাকে সবচেয়ে সহজে রসে ভিজিয়ে শিষ্যদের হাতে তুলে দিতে পেরেছিলেন। ধর্ম কথার এমন সহজ প্রবক্তা ভগবান ছাড়া আর কে হতে পারে!

সমস্ত ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে নরেন্দ্রনাথকে আলাদা চোখে দেখতেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি জানতেন তাঁর উত্তরসূরী এই মহাতেজ তপস্বী। একদিন রহস্যচ্ছলে মাস্টার মহেন্দ্র গুপ্তকে বলছিলেন, 'নরেন্দ্র তোমাকেও পছন্দ করে না।' পছন্দর ইংরেজী শব্দ লাইক কথাটাই তিনি ব্যবহার করেছিলেন। মজা করবার জন্য গুরুতর বিষয়কে লঘু করে তোলবার জন্য এমন ইংরেজী শব্দ মাঝে মাঝেই তিনি প্রয়োগ করতেন। 'নরেন্দ্রর কত গুণ দেখ। গাইতে বাজাতে লেখাপড়ায় সবেতেই সে ওস্তাদ।' কথা বলতে বলতেই অন্য প্রসঙ্গে গেলেন, 'তবে শুধু পাণ্ডিত্যে কিছু হয় না। সাধন ভজনের প্রয়োজন। কিন্তু সবই ঈশ্বরমুখীন হওয়া চাই। কথায় কথায় একদিন রাম বললেন, আমরা খোল বাজান শিখছি।' তাই শুনে ঠাকুর কার কতটা বাজনা শেখা হয়েছে জিজ্ঞেস করলেন। সব শুনে বললেন, 'তাহলে আর অমন মুখ নিচু করে থাকবে না, একটা দিকে মন দিলে মনটা ভগবানের দিকে

ততটা থাকে না।

ঠাকুরকে ঘিরে সবাই মজার মজার গল্প বলছে। হাসির ঘটনা। অনাবিল আনন্দে সবাই ভাসছে। ঠাকুর বিনা মন্তব্যে তাদের সঙ্গে হাসছেন। তিনি নিজেই শুধু রসের কথা বলতেন তা নয়। অন্যরা বললে শুনতেন। রস অনুভব করতেন। ভক্তসঙ্গে রসে থাকেন। তা না হলে একা হলেই আজকাল সমাধির ঘোরে ডুব দেন। তিনি যেন অন্তর্মুখীন হয়ে যাচ্ছেন ক্রমশ! বাইরে থেকে মনকে তুলে নিচ্ছেন। বাহ্যাবস্থা ফিরলে দেখা গেল তিনি কথা বলছেন তাঁর জননী ভবতারিণীর সঙ্গে। এখানেও শাস্ত্রের কথা না। মন্ত্র-তন্ত্র না—সেই রসের আলাপ। যে রসে তিনি আপামর সকলকে ডুবিয়ে দিতে চেয়েছেন। আপন মনে বলছেন, 'মা আমার পুজো জপ সব গেল. দেখো মা যেন আমায় জড় করে ফেল না—কথা বলার ক্ষমতাটুকু রাখিস, সেবা করতে পারি যেন ; সেবকভাবে আমাকে দেখ। নিজে নিজে যেন চলতে পারি মা, তোমার গান গাইতে পারি।' ছোট ছেলের আব্দার! সামান্য জিনিসের দখলদারি। ওতেই খুশি সে।

ভাবের ঘোরে একবার কথা শুরু হলে আর থামতে চায় না। নিজের কথা, ভক্তদের কথা। জগৎ সংসারের কল্যাণের কাজ। কখনো চুপিসারে—অন্যে না শুনে ফেলে। কখনো জোরে, সবাইকে শুনিয়ে। যেমন ভক্ত সঙ্গে, তেমনি মাতৃপদে। শ্রীরামকৃষ্ণর লীলার কোনো তুলনা নেই তাই।

ভক্তসঙ্গে বসে আছেন। হঠাৎ তিনি তাঁদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'দেখ ভগবান বিষয়ে কোনো হিসেব করবার যো নেই। তিনি অনন্ত। তাঁর ঐশ্বর্য অফুরাণ। মানুষের সাধ্য কি মুখে সেই অঙ্ক মেলায়। তাঁকে কি বোঝা যায়! তাই তো আমি বিড়ালের ছানার ভাবে আছি মা যেমন যেখানে রাখে। ছোট ছেলে জানে না তার মার টাকা পয়সার কথা। সে শুধু মার নির্ভর হয়। ভক্তদের বলেন, ঈশ্বর

নিরাকার আবার সাকার। ভক্তের জন্যই তাঁর রূপগ্রহণ। তোমাদের যার যা বিশ্বাস তাই শক্ত করে ধরে থাকবে। শুধু এটুকু মনে রাখবে তিনি সব হতে পারেন। সাকার নিরাকার। আরও কত কি তিনি হতে পারেন।' হঠাৎ মহেন্দ্রকে কথায় কথায় তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি আমাকে স্বপ্নে দেখতে পাও?'

'হ্যাঁ, অনেকবার দেখি।'

'কি রকম দেখ? কোনো উপদেশ দিচ্ছি?' শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর চোখে তাকিয়ে প্রশ্ন করেন।

মহেন্দ্র গুপ্ত কথার উত্তর দিলেন না। তাঁর সামনে অবস্থিত লাবণ্যপুঞ্জের দিকে অবাক হয়ে চেয়ে আছেন। মনের মধ্যে প্রশ্ন ইনি কে!

ঠাকুবই তাঁর মনের জিজ্ঞাসার উত্তর দিলেন। তিনি অন্তর্যামী— ভগবানেব বসঘন রূপ। 'যদি দেখ আমি শিক্ষা দিচ্ছি তবে জানবে সেই হল সচ্চিদানন্দ।'

বলরামবাবুর বাবা পুরনো বৈষ্ণব। তিনি বৃন্দাবনে শ্যামসুন্দরের কুঞ্জে সেবা করে কাটান। অনেক বৈষ্ণব ভক্তই অন্যান্য মতাবলম্বীদের দেখতে পারে না। বরং কেউ কেউ ঘৃণা করে।

শ্রীবামকৃষ্ণ এই বিদ্বেষ নিন্দা সহ্য করতে পারেন না। তাঁর মতে আকুলতা থাকলে সব পথ ও মত দিয়ে ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। সেই বলরামবাবুর বাবা এসেছেন ঠাকুর সন্নিধানে। শ্রীরামকৃষ্ণ কথাচ্ছলে তাঁকে উপদেশ দিচ্ছেন। তাঁর মন থেকে বিদ্বেষ সরাতে চাইছেন। তিনি বলছেন, 'কেন একঘেয়ে হয়ে থাকব। বৃন্দাবনে আমিও ভেক নিয়েছিলাম, তিনদিন ওই ভাব। দক্ষিণেশ্বরে রাম মন্ত্র নিয়েছিলাম। লম্বা ফোঁটা, গলায় হীরে! কদিন পরই সব দূর করে দিলাম। যেমন ছিলাম তেমনি হয়ে গেলাম।' নিজের বিশেষ অবস্থার কথা বলে এবার গল্প শুরু করলেন। সেই রসময় ভঙ্গি। 'তাহলে একটা গল্প

শোন,··· গামলার রঙ ছোপানোর গল্প—তারপরই সেই বহুরূপীর গল্প। যার রঙ বদলের ব্যাপার নিয়ে জনে জনে ঝগড়া।' বলরামবাবুর পিতার দিকে এবার সোজাসুজি বললেন,'বই আর পড়ো না, হ্যাঁ তবে ভক্তিশাস্ত্র পড়তে পার—যেমন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। আসল কথা কি জান, তাঁকে ভালবাসা। তাঁর মধুর স্বাদ গ্রহণ। তিনি রস, ভক্ত রসিক, সেই রস পান করে। তিনি পদ্ম, ভক্তরা মৌমাছি। মৌমাছি যেমন পদ্মের মধু খায় ভক্তও তেমনি তাঁর রস পান করে।'

একটু থামলেন পরমপুরুষ। বিষয়টা আরো বিশদ করলেন। 'উভয় উভয়কে ছাড়া থাকতে পারে না। ভগবানেরও ভক্তকে প্রয়োজন। তাই মাঝে মাঝে তিনিও রসিক হয়ে পড়েন। ভক্ত হন রস। তিনি স্ব মধু পান করাবার জন্যই তো দুটি হয়েছেন, তাই তো রাধাকৃষ্ণ লীলা।'

আপন মনে ঠাকুর বলে যাচ্ছেন। সার কথা বোঝাতে চাইছেন। 'তীর্থ গলায় মালা আচার এসব প্রথম প্রথম দরকার হয়। কাম্য জিনিস পাওয়া গেলে ঈশ্বরের দেখা পাওয়া গেলে বাইরের জাঁকজমক ক্রমে ঝিমিয়ে পড়ে। তখন শুধু তাঁর নাম নিয়ে পড়ে থাকা, তাঁকে স্মরণ-মনন করা।' উদাহরণ দিলেন সহজে, 'ষোল টাকায় এক কাঁড়ি পয়সা, কিন্তু এক সঙ্গে ষোল টাকাকে অমন দেখায় না। আবার তা থেকে যখন একখানা মোহর করা যায় তখন কত কম হয়ে গেল। মোহরকে বদলে হীরে করলে তো লোকে টেরই পাবে না।' শ্রীরামকৃষ্ণ জলের মতো বুঝিয়ে দিচ্ছেন। উপমা দিয়ে,প্রতীকী দিয়ে। কর্তাভজারা প্রবর্তক, সাধক, সিদ্ধ, সিদ্ধের সিদ্ধ বলে থাকে। যারা প্রবর্তক তারা গলায় মালা পড়ে, ফোঁটা কাটে। সাধকের বাইরের আড়ম্বর কম—যেমন বাউলরা। সিদ্ধ তিনি যিনি স্থির প্রত্যয়ী ভগবানে রয়েছেন। সিদ্ধের সিদ্ধ হলেন শ্রীচৈতন্যদেব। এঁকেই ওরা সাঁই বলেন—সাঁইয়ের ওপরে আর কিছু নেই।' রহস্য করে রস পরিবেশন করলেন পরম-

পুরুষ। 'রাজসিক সাধক বাইরের গমক ছাড়তে পারে না। গলায় জপের মালা, অঙ্গে গরদের কাপড়—জপের মালাতে সোনার দানা দেওয়া—যেমন সাইনবোর্ড মেরে বসা।'

শ্রীরামকৃষ্ণর এই কথায় সকলেই কৌতুক বোধ করলেন। কি সুন্দর করে বর্ণনা। কি গভীর অনুভবের দৃষ্টি। তিনি আরো বললেন, 'সকলেই এক ঈশ্বরকে ডাকছে। যে যাই বলুক, সেই এক সচ্চিদানন্দ। তাঁকে পাওয়ার জন্য এত পথ ও মত। এক বই তো দুই নেই, আন্তরিক ডাক তাঁর কাছে পৌঁছবেই, ব্যাকুলতা চাই—একাগ্রতা চাই।'

বলরামের বাবা নামের মালা জপ করছেন চুপচাপ। মুখে কথা নেই। ঠাকুর তাঁকে ছাড়ছেন না। ঠাট্টার চাবুক মারবার জন্য মাস্টারের দিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আচ্ছা বলতে পার, এত তীর্থ করে এত নাম জপ করেও এরা এমন কেন? যেন আঠার মাসে বছর! হরিশকে তাই বলেছিলুম কি হবে কাশী গিয়ে—যদি ভেতরে আকুলতা না থাকে। অন্তরে আগ্রহ থাকলে এখানটাই তো কাশী। এত তীর্থ এত জপে হয় না তার কারণ একটাই—আকুলতা নেই। আকুল হতে পারলে তিনি দেখা দেবেনই।'

অন্যদিনও একই বিষয়ে কথা হচ্ছে।

বলরামের পিতা এসেছেন। তিনি গোঁড়া বৈষ্ণবদের মতো এক-ঘরে নন। ঠাকুর তাঁর ভেতর আরো পরিষ্কার করে তুলছেন। তিনি বলছেন, 'যারা উদার, তারা সব দেবতাকেই মানে। কৃষ্ণ-কালী শিব-রাম এই সব।'

'হ্যাঁ তা ঠিক। যেমন স্বামী এক—তার বিভিন্ন পোশাক।'

'তিনি সেই এক থেকে অনেক হয়েছেন। নিত্য থেকেই তাঁর লীলা।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'এক অবস্থায় অনেক দূর হয়; আবার একও লোপ পায় কারণ এক থাকলেই দুই। তিনি হলেন উপমারহিত। উপমা দিয়ে তাঁকে বোঝা যায় না। যতক্ষণ তুঁহু তুঁহু করবে ততক্ষণ

মুক্তি নেই। আবার জন্মাতে হবেই। আমি আর আমার এই বোধ সত্যকে ঢেকে রাখে—জানতে দেয় না। অদ্বৈতজ্ঞান না হলে চৈতন্য-দর্শন হয় না। চৈতন্যদর্শন হলে তবেই নিত্যানন্দ। পরমহংস অবস্থায় এই নিত্যানন্দ। বেদান্ত মতে অবতার নেই। চৈতন্যদর্শন কি জান? এক একবার দেশলাই জ্বাললে অন্ধকার ঘর যেমন আলোয় দৃশ্যমান হয়।' শ্রীরামকৃষ্ণ মুখে মুখে শাস্ত্র বলে যাচ্ছেন। যা বলছেন তাই অমৃত। অমৃতময় বাণী দিযে ভক্তদের অন্ধকার দূব করছেন। সংশয় সরিয়ে দিচ্ছেন।

সকলেই শ্রোতা। তাঁর শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী অমৃত রসের মতো পরিবেশিত হচ্ছে। ঠাকুর বলছেন, 'আমার অবস্থা দেখে কর্তাভজা মেয়ে বলল, বাবা, অন্তরে তোমার বস্তুলাভ হয়েছে, অত নেচো না—তুলোর ওপর যত্ন করে আঙুর রাখতে হয়—পেটে ছেলে এলে বউকে শাশুড়ী আস্তে আস্তে খাটুনি কমিয়েদেয়—ঈশ্বর দর্শনের লক্ষণ ধীবে ধীরে কর্ম থেকে সরে আসা—এই শরীরের মধ্যেই মানুষ রত্ন আছে।' সবাইকে দেখছেন মনযোগ দিয়ে; সকলেই রসময় কিনা—আবাব বলছেন, 'অর্জুনকে কৃষ্ণ বলছেন, ভাই আট সিদ্ধির একটিও থাকলে আমাকে পাবে না। তবে একটু ক্ষমতা হবে—ওষুধ দেওয়া ব্রহ্মচারী, লোকের হয়তো উপকার হবে, এই যা। তাই সিদ্ধাই চাই নি মার কাছে আমি, শুদ্ধা ভক্তি চেয়েছি।'

একটু সমাধিস্থ হলেন। মন আত্মস্থ। তাকে ধাতস্থ করে নিয়ে আবার বললেন, মানুষ ভগবানের নাম করে পবিত্র হয়। সেজন্য নাম করা অভ্যেস করতে হয়। যদু মল্লিকের মাকে তাই তো বলেছিলাম, শেষ সময়ে সংসার চিন্তাই ঘেরাও করবে। বউ ছেলে মেয়ে সম্পত্তি—ঈশ্বরের ভাবনা ঠাঁই পাবে না। অভ্যাস থাকলে মৃত্যু সময় ভগবানের কথাই মনে পড়বে। পাখিকে বেড়াল ধরলে সে তখন ক্যাঁ ক্যাঁ করেই চেঁচাবে, রাম রাম বা হরে কৃষ্ণ বলবে না। মৃত্যুর জন্য তৈরি থাকাই

উচিত। স্নানের পর হাতি আস্তাবলে গেলে ধুলোকাদা মাখার সুযোগ পাবে না। শেষ বয়সে তাই নিরিবিলিতে বসে ভগবানের নাম করতে হয়।' শ্রোতাদের মধ্যে বলরামের বাবা মণি মল্লিক বেণী পাল রয়েছেন। এঁদের ইঙ্গিত করেই ঠাকুর ওই কথা বলছেন হয়তো।

বলরামের বাবা বললেন, 'সংসার থেকে নিজেকে নিরিবিলিতে সরানো বড় কঠিন।'

সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, 'এ সংসার সাধনের সময় ধোকার টাটি কিন্তু যেই জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল, তাঁর দর্শন পাওয়া গেল তখন মজার কুটি।' বিশ্বাসে মিলায়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর। ঠাকুর কথাটায় জোর দেবার জন্য বললেন, 'লক্ষ্মণকে রামচন্দ্র বলেছিলেন, 'ভাই যেখানে উর্জিতা ভক্তি দেখবে সেখানেই আমি আছি জানবে।'

বেণী পাল মণি মল্লিক বলরামের বাবা উঠলেন। প্রায় রাত্রের দিকে সকলেই যখন চলে গেছে পরমপুরুষ নিজেই মাস্টারকে প্রশ্ন করলেন কথায় কথায়, 'আমাকে তোমার কেমন মনে হয়?'

জবাবে মাস্টার বললেন, 'আপনি সরল অকপট আবার আপনি গভীর—আপনাকে হৃদয়ঙ্গম করা খুবই শক্ত।'

ঠাকুর একথার জবাব না দিয়ে শুধু হাসতে লাগলেন।

ভক্ত সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর ছেড়ে ঠাকুর বেরিয়েছেন। রাখালের জন্য সিদ্ধেশ্বরীর কাছে ডাব-চিনি মানত করেছেন। ঠনঠনের সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে তাই আগে গেলেন। মন্দিরে পৌঁছে সবাই দেখতে পেলেন পূজারী তার ইয়ার দোস্ত নিয়ে মায়ের সামনে তাস খেলছে। তাই দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'এখানে বসে তাস খেলা! এ জায়গা হল ঈশ্বর চিন্তা করার।' ওখান থেকে সবাই চললেন যদু মল্লিকের বাড়ি যদু মল্লিক বহু বাবু পরিবৃত হয়ে বসে আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখেই তিনি সাদর সম্ভাষণ করলেন, 'এস এস।'

কুশলাদি প্রশ্নের পর ঠাকুর হাসি মাখিয়ে বলে উঠলেন, 'তুমি এত ভাঁড়, মোসাহেব রাখ কেন ? কি ব্যাপার ?'

'তুমি উদ্ধার করবে বলে রাখি।' যদু মল্লিক উত্তর দিলেন সহজ আন্তরিকতায়। তাঁর কথায় সবাই হেসে উঠল।

'তাহলে একটা গল্প শোন।' শ্রীরামকৃষ্ণ আসন পরিগ্রহ করে লঘু কথায় ভক্তদের নিয়ে গেলেন। 'মোসাহেবরা ভাবে তাদের বাবু অঢেল টাকা ঢেলে দেবে। কিন্তু বাবুর কাছ থেকে টাকা আদায় করা বেশ শক্ত। এক শেয়াল একটা বলদকে দেখে তো আর ওর সঙ্গ ছাড়ে না। বলদটা চরে বেড়ায় শেয়ালও ঘুরছে তার সাথে সাথে। শেয়াল ভাবছে মনে মনে বলদের যে অণ্ডের কোষ ঝুলছে তা কোনো না কোনো এক সময় খসে পড়বে—ব্যাস অমনি তা খাব। এমনি করে বেশ কিছুদিন কাটল। বলদটা যখন ঘুমিয়ে পড়ে—শেয়ালও তার কাছে ঘুমোয়। সে উঠে চরে বেড়ালে শেয়ালও তার কাছে কাছেই থাকে। বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হল কিন্তু কোষটা পড়ে গেল না। তখন সে নিরাশ হয়ে একদিন চলে গেল। মোসাহেবদের ঠিক এই অবস্থাই হয়।' শ্রীরামকৃষ্ণ গল্প শেষ করতে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। কি অনাবিল রসের আধার। কি সুন্দব উপমা দিয়ে গল্প ! গল্পের সারটুকু সকলের মনে মুহূর্তে গেঁথে বসল।

কথা বলছেন একদিন মণির সঙ্গে। মণি প্রশ্ন করলেন শ্রীরাম-কৃষ্ণকে, 'আচ্ছা জ্ঞান ভক্তি দুই কি হয় না ?'

'হবে না কেন ? তবে খুব উঁচু ঘরের। ঈশ্বরকোটি যাঁরা—যেমন শ্রীচৈতন্যদেব। জীবকোটিদের ব্যাপার ভিন্ন।' শ্রীরামকৃষ্ণ জবাব দিলেন, 'দেখ পাঁচ রকমের আলো আছে। দীপের আলো, আগুনের আলো, চাঁদের, সূর্যের, আবার চাঁদ ও সূর্যের একাধারে। ভক্তি হল চাঁদ আর সূর্য হল জ্ঞান। অনেক সময় দেখবে আকাশে সূর্য অস্ত যাবার আগেই চাঁদ প্রকাশিত। অবতারদের মধ্যে ভক্তির চাঁদ ও

জ্ঞানের সূর্য একই আকাশে দৃশ্যমান। মনে করলেই কি সবার জ্ঞান ভক্তি একাধারে হয়? আধার বিশেষে তা প্রতীয়মান। সব আধারে ভগবানরূপ জিনিস ধরে না। একসের ঘটিতে যেমন দুসের দুধ ধরতে পারে না।

'তা কেন হবে—' মণি উত্তর দিলেন, 'তাঁর কৃপায় তো সূচের ভেতর দিয়ে উট যেতে পারে।'

'ওরে কৃপা কি অমনি হয়—' শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'যদি কেউ পয়সা ভিক্ষে চায় তো তা দেওয়া যায়—কিন্তু যদি একবারেই রেলভাড়া চেয়ে বসে!'

মণি আর কথা বলছেন না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ঠাকুরও চুপ হয়ে রইলেন খানিক। তারপর আবার আপন মনেই বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ তা কারো কারো পাত্রে তাঁর কৃপা হলেও হতে পারে; তখন দুইই হয়। সেদিনই মণি বেলতলার দিকে চলে যান। সেখান থেকে তাঁর ফিরতে বেশ দেরী হয়। ফিরবার সময় পথে ঠাকুরের সঙ্গে দেখা। ঠাকুর বললেন, 'আমি তোমায় খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। এত বেলা দেখে মনে হল পাঁচিল ডিঙিয়ে পালিয়েছ। তখন তোমার চোখ দেখে আমার মনে হয়েছিল তুমিও বুঝি নারান শাস্ত্রীর মতো পালালে তারপর মনে হল, পালাবার লোক তুমি নও—তুমি অনেক ভেবে চিন্তে কাজ করো।' ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে চরিত্রের বিশ্লেষণ। চোখ দেখে মনের গভীরতা অনুমান। এসবই তাঁর দ্বারা সম্ভব যিনি অতিমানব।

রাত্রে দুজনে কথা হচ্ছে। ধর্ম আলোচনা। কথায় কথায় মণি বললেন, 'আপনি বলেছেন দু জিনিস ছাড়া আর কিছুই নেই। এক ব্রহ্ম দুই শক্তি। জ্ঞান লাভ হলে এই দুইকে এক বোঝা যায়—এই এক এমন যার কিনা দ্বিতীয় নেই।

'তা *ঠিক*,' ঠাকুর বলছেন সহজ করে, 'তোমার জিনিস আনবার দরকার—তা সে কাঁটাবন দিয়ে গিয়েই হোক বা অন্য পথে হোক।

নানা মত রয়েছে। ন্যাংটা তাই বলেছিল বিভিন্ন মতের জন্য সাধুসেবাই হল না। সে খুব মজার কাণ্ড। এক জায়গায় ভাণ্ডারা হচ্ছিল। বহু সাধু সম্প্রদায় হাজির। হৈচৈ লেগে গেল। সবাই বলল আমাদের সেবা আগে। কোনো মীমাংসা হল না। শেষে সেবা না করেই সব সাধুর দল পালিয়ে গেল। তখন বেশ্যাদের ডেকে এনে খাওয়ানো হল।'

একজন নানকপন্থী সাধু এসেছেন। তিনি নিরাকারবাদী। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সাকারের চিন্তা করতে বলছেন অবলীলায়। সাধু বিহ্বল, দ্বিধাজড়িত। এ কেমন উপদেশ। নিরাকারবাদীকে সাকার চিন্তার কথা বলা। ঠাকুরের কোনো মানসিক বিচার নেই। তিনি সহজ সরল, অকপট। সাধুকে বলছেন, 'তিনি নিরাকার আবার সাকারও। ডুব দিতে হবে—সাগরের গভীরে। ওপরে ভেসে বেড়ালে রত্ন পাওয়া যায় না। সাকার চিন্তায় ভক্তি তাড়াতাড়ি এসে পড়ে। এরপর নিরাকার ভাব।' কি বিচিত্র সূক্ষ্ম উদাহরণ।

'মানুষ যেমন চিঠি পরে চিঠিখানা ফেলে দেয়—তারপর চিঠির বিষয় অনুসারে কাজ করে।'

সাধু বুঝতে পারে উপদেশের রস। এই না হলে পরমহংস।

কথায় কথায় এক ভক্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা ভক্তি কেমন করে হয় ?'

'আমি চানকে দ্বারিকবাবুকে বলেছিলাম—' ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'বড় পুকুরে বড় বড় মাছরা গভীর জলে থাকে। চার ফেল, তবে তার গন্ধে বড় মাছরা আসবে। এক একবার ঘাই দেবে। প্রেম ভক্তিরূপ চার।'

পরমপুরুষ কথা বলে যাচ্ছেন। অমৃতময় বাণী। মুগ্ধ হয়ে শুনছে রসপিপাসু ভক্তজন। তিনি বলতে থাকেন ভক্তিময় কথা। যা প্রেম প্রস্রবণের মতো ছড়িয়ে পড়ে চারপাশে। 'কেশব সেনকে আমি

বলেছিলাম মানুষের মধ্যে তাঁর প্রকাশ সবচেয়ে বেশি। যেমন ধরো তোমরা মাছ-কাঁকড়া খুঁজতে চাও—মাঠের আলের জায়গায় জায়গায় ছোট ছোট গর্ত থাকে যার নাম ঘুটী—ওখানে মাছ-কাঁকড়ার বাস, তা খুঁজতে হলে ওই গর্ত খুঁজতে হবে। তেমনি ভগবানকে খুঁজতে চাও তো অবতারের মধ্যে খোঁজ।' একটু থেমে গান গেয়ে পুনরায় তিনি বলছেন, 'কিন্তু এর ভেতর কথা আছে। ভগবানকে পেতে হলে অবতার চিনতে হলে সাধনার দরকার। দীঘির বড় মাছ ধরতে গেলে চার ফেলতে হয়। দুধের মাখন তুলতে হলে তাকে মন্থনের প্রয়োজন—সরষের ভেতর থেকে তেল বার করতে হলে পেষাই করতে হবে। মেহেদী দিয়ে হাত ছুপতে হলে মেহেদী পাতা বাটতে হবে। মেহনতের দরকার। তবেই অভীষ্ট সিদ্ধ হবে। একটার পর একটা উপমা। চিত্রকল্পর ওপরে চিত্রকল্প। প্রতীক দিয়ে সংশয়কে সরিয়ে দেওয়া। ভাবরসের সৃষ্টির জন্য ভক্তর মনে মননের চাষ। এমন গুরু লক্ষতে কোটিতে কোথায়! পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ সেই লক্ষ কোটিরই একজন।

ভক্তের প্রশ্ন ছেলেমানুষের প্রশ্ন। সন্দেহ বিস্ময় কৌতূহল জোড়া। এক ভক্ত প্রশ্ন করে বসলেন, 'বলুন তো তিনি সাকার না নিরাকার?'

'দাঁড়াও—অত তাড়া কিসের?' ঠাকুরের উদ্ভাসিত মুখে বিকিরিত প্রজ্ঞা। 'আগে কলকাতায় যাও—তারপর তো তুমি জানতে পারবে কোথায় গড়ের মাঠ, কোথায় এশিয়াটিক সোসাইটি আর কোনোখানেই বা বাঙাল ব্যাঙ্ক! খড়দার বামুনপাড়ায় যেতে হলে আগে তো খড়দায় যাও।'

ভক্ত চুপ। এমন উত্তরের পর কি আর কথা থাকতে পারে!

পরমপুরুষ বলছেন. 'অবতারের মধ্যে তিনি বিশেষ ভাবে প্রকাশিত। একবার তাঁকে চিনলেই ঈশ্বর চেনা হয়ে যায়। তবে

সবাই অবতার চিনতে পারে না। কারণ মানুষের সঙ্গে তার তফাৎ খুব কম। দেহ ধারণের জন্য সুখ দুঃখ খিদে তেষ্টা সবই অবতারের মধ্যে থাকে। পুরাণে নাকি উক্ত আছে হিরণ্যাক্ষ্য বধের পর বরাহরূপী ভগবান সংসারের মায়ায় অবতাব হয়েও ছানা পোনা নিয়ে ছিলেন—তাদের মাই খাওয়াচ্ছিলেন। অবশেষে শিব ত্রিশূল দিয়ে শরীর নাশ করলে হাসতে হাসতে স্বর্গে যান।'

শ্রীরামকৃষ্ণ রামচন্দ্রের বাগান দেখতে এসেছেন। তাঁকে রাম স্বয়ং অবতাররূপে পুজো করেন। তিনি প্রায়ই পরমপুরুষকে দেখতে দক্ষিণেশ্বরেব কালীবাড়ি আসেন। সুরেনের বাগানের কাছেই তার নতুন বাগান হয়েছে। সঙ্গে কয়েকজন ভক্ত আছেন। গাড়িতে কথা হচ্ছে যেতে যেতে। মণিলাল মল্লিক ব্রাহ্ম। তাঁরা অবতার মানেন না। ঠাকুর তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলছেন, 'ঈশ্বরের ধ্যান করতে হলে প্রথমে তাঁকে উপাধিশূন্য হয়েই করা উচিত—ভগবান নিরুপাধি, 'তিনি বাক্য মনের বাইরে! কিন্তু এই ধ্যান খুবই কঠোর। তাই তিনি মানুষে যখন অবতীর্ণ হন তখন ধ্যান করা খুব সহজ। মানুষের মধ্যে নারায়ণ। দেহটি আবরণ বা ঘেরাটোপ মাত্র—যেন লণ্ঠনের ভেতর জ্বেলে দেওয়া আলো। যেম ধরে কাঁচের শার্সির ভেতর দিয়ে মূল্যবান জিনিস দেখছি।

রামের বাগান দেখে সুরেনের বাগানে চলেছেন পায়ে হেঁটে। পাশের এক গাছতলায় বসে থাকা এক সাধুকে দেখতে পেলেন তিনি। তাড়াতাড়ী কাছে গিয়ে আনন্দে তার সঙ্গে হিন্দিতে আলাপ জুড়ে দিলেন। সাধুর শ্রেণী পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে সাধু বললেন, 'তিনি পরমহংস।'

'বাঃ বেশ।' শ্রীরামকৃষ্ণ সাধুকে বলতে লাগলেন, শিবোঽহং বেশ। তবে একটা কথা আছে। এই সৃষ্টি স্থিতি ধ্বংস দিনরাত যাবতীয় কিছু ঘটছে তার শক্তিতে। ব্রহ্ম আর এই আদ্যাশক্তিতে

কোন ভেদ নেই। ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তি হয় না। যেমন জল বাদে ঢেউ দেখা যায় না—যন্ত্র বাদে বাজনা শোনা যায় না। যতক্ষণ লীলার ভেতর রেখেছেন তিনি ততক্ষণই দুটো বলে অনুভব—শক্তি বললেই ব্রহ্ম, যেমন রাত ভাবলেই দিন, তেমনি জ্ঞান বোধ থাকলেই অজ্ঞান বোধ আছে। আর এক অবস্থায় তিনি দেখান যে ব্রহ্ম, জ্ঞান-অজ্ঞানের সীমারেখাহীন—মুখে তার কিছুই প্রকাশ করা যায় না। যো হ্যায় সো হ্যায়।'

জয়গোপাল সেদিন প্রশ্ন করলেন, 'সব পথই সত্য তা কি করে বুঝব ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'একটা রাস্তা ধরে ঠিক যেতে পারলে তাঁর কাছে পৌঁছানো যায়। তখন সব পথের খবর মেলে। যেমন একবার কোনক্রমে ছাদে উঠতে পারলে কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামা যায়। পাকা সিঁড়ি দিয়েও নামা যায়, একটা বাঁশ দিয়েও নেমে আসা যায় আবার একটা দড়ি বেয়েও নেমে পড়তে পার।'

ঠাকুর প্রাঞ্জল করে দিচ্ছেন দর্শনের কঠিন ব্যাখ্যা। তাঁর দয়া একবাব হলে ভক্ত সব জানতে পারে। একবার তাঁকে পেলে আর কিছুই অজনা থাকে না। একবার যো-সো কবে বড়বাবুর সঙ্গে দেখা করতে হয়। তারপর বাবুই বলে দেবে তার কটা বাগান কটা পুকুর কত কোম্পানীর কাগজ।'

জয়গোপাল পুনরায় জানতে চাইলেন, 'তাঁর কৃপা কি করে হয় ?'

ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'সব সময়ে তাঁর নাম গুণ কীর্তন করতে হয়—যতদূর সম্ভব বিষয়চিন্তা ছাড়তে হয়। চাষের জন্য তুমি বহু কষ্ট করে জমিতে জল আনছ কিন্তু ঘোগ (আলের গর্ত) দিয়ে সব জল বেরিয়ে যাচ্ছে। তাহলে জল আনা পণ্ডশ্রম হল। চিত্তশুদ্ধি হলে বিষয়ের প্রতি স্পৃহা সরে গেল ব্যাকুলতার জন্ম হবে—তখন তোমার ডাক ভগবানের কাছে পৌঁছবে। টেলিগ্রাফের তারের ভেতর ফুটো থাকলে

'যেমন খবর পৌঁছয় না। আমি ব্যাকুল হয়ে একলা বসে কোথায় নারায়ণ এই বলে কাঁদতাম ; কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতাম— মহাবায়ুতে লীন ! যোগ কিসে হয় ? ওই টেলিগ্রাফের তারে ফুটো না থাকলেই হয় একেবারে বিষয়াসক্তি ত্যাগ। কথাটা হল তাঁকে ভালবাসা। ভালবাসা গভীর হলেই দেখা পাওয়া যায়। যেরকম সতী ভালবাসে তার পতিকে, মার টান দেখা যায় সন্তানের ওপর— বিষয়ী যেমন বিষয়কে আঁকড়ে ধরে। এই তিন টান এক করলে তবে ভগবানকে দেখা যায়।' জয়গোপাল বিষয় নিয়ে আছেন ; তাই তাঁর উপযোগী উপদেশ শোনাচ্ছেন ঠাকুর।

১৮৮৩-৮৪ সালে এশিয়াটিক মিউজিয়ামের কাছে একটা রাজ-রাজড়াদের মূল্যবান জিনিসপত্রের প্রদর্শনী হয়েছিল। দক্ষিণেশ্বরে একদিন তাই নিয়ে কথা বলছিলেন ভবনাথ ও মণিলাল। ঠাকুর শুনছিলেন ওদের কথা। শুনতে শুনতে হাসিমুখে ভক্তদের কাছে বললে, হ্যাঁ দেখতে গেলে বেশ লাভ হয়। রাজ-রাজড়ার জিনিস সেটা দেখাও একটা লাভ। প্রথম যখন কলকাতায় আসতাম, হৃদে আমাকে লাটসাহেবের বাড়ি দেখাত, বিরাট বিরাট থাম। মা আমাকে দেখিয়ে দিলেন কতকগুলি মাটির ইট উঁচু করে সাজানো। ভগবান আর ঐশ্বর্য। ঐশ্বর্য তো দুদিনের—ঈশ্বর সত্য, শাশ্বত। যেমন ধরো বাজীকর আর তার বাজী। বাজী দেখে অবাক সবাই, কিন্তু তার সবটুকু মিথ্যে—বাজীকর কিন্তু সত্যকার। সেই যে সৃষ্টিকর্তা আবার লয়কর্তা।' ভক্তদের দেখে নিয়ে তিনি জানালেন, 'আমি একবার মিউজিয়ামে গিয়েছিলুম—তা সেখানে ইট জানোয়ার পাথর হয়ে গেছে এসব দেখলুম। দেখলে সঙ্গগুণ, সব পাথর হয়েছে। তেমনি সাধুসঙ্গ করলে যে করে সে তাই হয়ে যায়।'

হেসে বললেন মণি মল্লিক, 'আপনি একবার প্রদর্শনীতে গেলে ১০।১৫ বছর আমরা উপদেশ শুনতে পেতাম।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব হাসলেন, 'কেন, উপমার জন্য?' একটু থেমে আবার বললেন, 'আমার বড় ইচ্ছে যদি দুখানা ছবি পাই। একটা ছবিতে একজন যোগী ধুনি জ্বেলে বসে আছে, অন্য ছবিতে যোগী গাঁজার কলকে মুখে দিয়ে টানছে আর সেটা জ্বলে উঠছে। এ সব ছবিতে অনুপ্রেরণা জন্মে। তবে কামিনী-কাঞ্চন যোগের বাধা। মনকে পবিত্র করতে পারলে যোগ হয়। কপালে মনের বাস কিন্তু লক্ষ্য থাকে লিঙ্গে গুহ্যে আর নাভিতে—তার মানে কামিনী-কাঞ্চনে। সাধন করলে দৃষ্টি উপরে উঠে যায়। কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে হয়। ত্যাগ এমনিতে হয় না। এর জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হয় পুরুষাকারের। ঋষিরা পুরুষাকার দিয়ে ইন্দ্রিয় জয় করেছিলেন। কচ্ছপ একবার যদি তার হাত-পা গলা ভেতরে ঢুকিয়ে নেয় তো তাকে টুকরো টুকরো করে কাটলেও বার করবে না।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের সামনে রসের ভাঁড় নিয়ে বসেছেন। প্রতি কথায় আনন্দ রস আনন্দ অনুভব। তিনি যে যেমন চায় তাকে তেমন রসিকতায় মাতিয়ে তোলেন। সংসারী লোক সম্পর্কে বলছেন, 'সংসারীদের ভগবৎ প্রেম ক্ষণিকমাত্র—যেমন তপ্ত খোলায় জল পড়েছে; ছ্যাঁক করে উঠল একবার—তারপরই শুকিয়ে গেল। অনুতাপ করলে প্রায়শ্চিত্ত করলে সংসার ভাবনা থাকে না যেমন ধরো তুমি কোথাও যাচ্ছ বাঁকা নদীর নিশানা ধরে—জলপথে গন্তব্যে পৌঁছতে দেরী হবে। কিন্তু যদি বন্যা হয় সামান্য সময়েই পৌঁছে যাবে —তখন ডাঙাতেই এক বাঁশ জল।'

'প্রথম অবস্থায় অনেক ঘুরতে হয়—কষ্ট করতে হয়। রাগভক্তি এলে খুব সোজা। যেরকম মাঠে ধান কাটা হয়ে গেলে যেদিক দিয়ে খুশি যাও কিছু খড় থাকলে জুতো পায়ে দিয়ে গেলে কোনো অসুবিধে হবে না। বিবেক বৈরাগ্য গুরুর বাক্যে আস্থা থাকলে আর কষ্ট হয় না।

ঠাকুর একদিন ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করছেন। সহজে বোঝাতে

হবে। যাতে একবারেই ভক্ত হৃদয়ঙ্গম করতে পারে তাঁর কথায়। তিনি বললেন, 'ধরে নাও সূর্য আর জলভরা দশটা ঘট রয়েছে। প্রতিটি ঘটের জলে সূর্যের প্রতিবিম্ব প্রতীয়মান। এবার নটা ঘট ভেঙে ফেলা হল। তখন রইল একটি সূর্য ও একটি তার প্রতিবিম্ব। এক একটি ঘট এক একটি জীব। এই প্রতিবিম্ব সূর্যে চোখ রেখে সত্য সূর্যের কাছে যাওয়া যায়। পৌঁছান যায় জীবাত্মা থেকে পরমাত্মায়। সাধন ভজন করলে জীব পরমাত্মাকে দেখতে পারে। এবার শেষের ঘটটি ভেঙে ফেললে কি আছে তা মুখে বলা যায় না।

'জীব প্রথমে থাকে অজ্ঞান অবস্থায়। জ্ঞান হলে সে বুঝতে পারে সর্বভূতে ভগবান বিরাজিত। যে দুধের কথা কেবল শুনেছে সে অজ্ঞান, দেখেছে যে তার জ্ঞানলাভ হয়েছে। আর দুধ খেয়ে যে স্বাস্থ্য করেছে তার বিজ্ঞান হয়েছে।

'বিজ্ঞানী ঈশ্বর দর্শন করছে সর্বদা। তাই তার স্বভাব আলাদা। সে কখনো জড়, কখনো পিশাচ, কখনো বালক ও কখনো বা পাগল-প্রায়। ঈশ্বর দর্শনের পর এই অবস্থা। ব্যাপারটা কি রকম জান, চুম্বক পাহাড়ের পাশ দিয়ে জাহাজ চলেছে। জাহাজের স্ক্রু পেরেক আলগা হয়ে খুলে যায়। ঈশ্বর দর্শনের পর কাম ক্রোধ এসব আর থাকে না। যিনি ভগবানকে দেখেছেন তিনি আর পুত্রকন্যার জন্ম দিয়ে সৃষ্টির কাজ করতে পারবেন না। ধান পুঁতলে তা থেকে হয় গাছ কিন্তু একবার সিদ্ধ করা হয়ে গেলে সেই ধানে গাছ হয় না।'

নিজের অবস্থার কথা, পর্যায়ের কথা ওভাবেই ব্যক্ত করতেন ঠাকুর সব সময়ে ভক্তদের গল্প দিয়ে রসিকতা দিয়ে সবকিছু বললেও তাদের সামনে নিজেকে, নিজের সাধনাকে তুলে ধরতেন উদাহরণস্বরূপ। তাঁর চেয়ে জীবন্ত বড় উদাহরণ আর কি আছে। যেন বলতেন, এই আমি, আমাকে বুঝে দেখ, বাজিয়ে দেখ, তারপর ইচ্ছে হয় তো আমার অনুগামী হও। শুধু কথায় ভুলিয়ে তোমাদের আমি টানতে চাই না।

আমার কর্মপদ্ধতিই আমার জীবন। আমার বিশ্বাস ভালবাসা আর আকুলতা।

ঠাকুর বলে যাচ্ছেন অক্লান্ত—'যিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন তাঁর 'আমিটা' নামমাত্র থাকে, সে আমি সাংসারিক আর কোনো কাজে আসে না—কারণ কোনো অন্যায়ই সেই আমি করতে পারে না। যেমন নারকেলের বেল্লোর দাগ—বেল্লো খসে গেছে এখন শুধু তার দাগটাই রয়েছে।'

যাত্রাদলের একটি ছেলের অভিনয় একবার শ্রীরামকৃষ্ণের ভাল লাগে। তিনি ছেলেটিকে কাছে ডেকে আলাপ করলেন। কথায় কথায় প্রশ্ন করলেন, 'তোমার কি বিয়ে হয়েছে? ছেলেপুলে?'

ছেলেটি উত্তর দিল, 'একটি কন্যা গত হয়েছে—আরো একটি সন্তান রয়েছে।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাট্টার সুরে বললেন, 'এর মধ্যে হল গেল! তোমার এই কম বয়স! কথায় বলে, সাঁঝ-সকালে ভাতার মলো কাঁদব কত রাত।' তাঁর এই কথায় সবাই হো হো করে হেসে উঠল। এবার তিনি বললেন, 'সংসারের মুখ তো দেখছ! যেন আমড়ার মতো। কেবল আঁটি আর চামড়া সার। খেয়ে হয় অম্লশূল।

'কামিনী-কাঞ্চনে মনের বাজে খরচ হয়।' রসিকতা দিয়ে যে বিষয়টি তুলেছেন এবার তার গভীরে নিয়ে যাচ্ছেন সকলকে। তিনি বলছেন ভোগ থাকলেই যোগ করে যায়। একটা গল্প শোন। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে, অবধূত চব্বিশ গুরুর মধ্যেও চিলকে এক গুরু করেছিল। চিলের মুখে ছিল এক টুকরো মাছ, সে তাই হাজার কাকের দ্বারা ঘেরাও হল। চিল মাছ নিয়ে যেদিকে যায় কাকরাও চলে সেই দিকে। এইভাবে যখন ঘুরতে ঘুরতে চিলের মুখ থেকে মাছ খসে পড়ল তখন কাকরা মাছের দিকে গেল চিলের দিকে গেল না।'

গল্পকে ভেঙে বোঝাতে লাগলেন পরমপুরুষ। 'মাছ অর্থাৎ ভোগের জিনিস কাকগুলোর চিন্তা-ভাবনা। ভোগ যেখানে চিন্তা ভাবনাও সেখানে। যেই ভোগ ত্যাগ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে শান্তি।' অন্যভাবে বললেন সংসারের জীবের অবস্থা। 'আবার দেখ, অর্থ থেকেও যত অনর্থ। তোমরা ভাই ভাই হয়তো বেশ আছ। আবার ভাগ নিয়েই ভায়ে ভায়ে গণ্ডগোল। দুটো কুকুরের মধ্যে দেখবে হয়তো খুব ভাব। দুজনে দুজনের গা চাটাচাটি করছে। কিন্তু গৃহস্থ যেই দুটো ভাত ফেলে দেবে সামনে অমনি কামড়া-কামড়ি শুরু হয়ে যাবে। ভাইদের সঙ্গে তাই মিলেমিশে থাকবে। মিল থাকলে দেখায়ও ভাল। যাত্রাতে দেখ নি ? চারজন একই সুরে গান গাইছে কিন্তু সবাই যদি আলাদা সুরে গান গায় তাহলে তো যাত্রা ভেঙে যাবে। সংসার করবে অথচ মায়ার কলসীটা *ঠিক* রাখবে—তার মানে মনটা যেন ঈশ্বরের দিকে থাকে। ও দেশে মেয়েরা যেমন ঢেঁকী দিয়ে চিঁড়ে কাড়ে। একজন পা দিয়ে ঢেঁকী টেপে আর একজন নেড়ে-চেড়ে দেয়। সে সব সময় খেয়াল রাখে যাতে না ঢেঁকীর মুশলটা হাতের ওপর পড়ে। অথচ এর মধ্যেই সে ছেলেকে মাই দেয় আর অন্য হাতে ভিজে ধান খোলায় ভেজে নেয়। আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথাও বলে। তোমার কাছে এত পাওনা আছে। দিয়ে যেও। অভ্যাস চাই আর হুঁশিয়ার হওয়া দরকার—তবেই দুদিক রেখে কাজ করা যায়।'

শ্রীরামকৃষ্ণের উপমা বিচিত্র। সমস্ত জাগতিক তত্ত্ব তিনি অধিগত করেছিলেন। একদিন ভক্তদের বললেন, 'সাধু সঙ্গে শান্তি হয়। কুমীর অনেকক্ষণ জলের মধ্যে ডুবে থাকে। একবার জলে ভেসে ওঠে নিশ্বাস নেবার জন্য ; তখন সে হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।'

একদিন কেশব সেন এসে রাত দশটা পর্যন্ত কাটিয়ে গিয়েছিল। তাঁদের ভেতর প্রতাপ ও অন্য কেউ কেউ বললে, সারা রাতটাই

কাটিয়ে যাবেন। কেশব সেন বললেন ; 'না কাজ আছে যেতে হবে।' ঠাকুর পুরনো কথা বলছেন, তখন আমি বললাম, আঁশ চুপড়ির গন্ধ না হলে কি ঘুম হবে না? গল্পটা জান না? শোন। একদিন এক মেছুনী এক মালির বাড়িতে অতিথি হয়েছে। চুপড়ি হাতে মাছ বিক্রী করে ফিরছে। সেই মেছুনীকে রাতে ফুলের ঘরে শুতে দেওয়া হল। ফুলের গন্ধে মেছুনীর তো আর ঘুম হয় না। বাড়ির কর্ত্রী তাই দেখে জিজ্ঞেস করলে, কি গো তুমি হাঁসফাঁস করছ কেন? সে উত্তর দিল, কি জানি বাপু, এই ফুলের গন্ধে বোধহয় ঘুম আসছে না—আমার আঁশ চুপড়িটা এনে দিতে পার—তাহলে হয়তো ঘুম হবে। শেষে তাই হল, আঁশ চুপড়িতে জলের ছিটে দিয়ে নাকের কাছে রেখে ভোঁস ভোঁস করে নাক ডেকে ঘুমতে লাগল।'

কেশব সেনের অনুগামীদের কাছে অতীত কথা বলছিলেন ঠাকুর। তারা তো গল্পটা শুনে হো হো করে হাসতে লাগল। 'আর একদিন কেশবকে বলেছিলাম ঈশ্বরের দুইরূপ—এক রূপে তিনি ভাগবত আবার অন্য রূপে ভক্ত। ভক্তের হৃদয়ই হল ভগবানের বৈঠকখানা ; বৈঠকখানায় গেলে যেমন বাবুকে সহজেই দেখা যায় তেমনি ভক্তের সেবা করলে ভগবানের পুজো করা হয়।'

হরি মাস্টার আর বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও অনেক ভক্তকে নিয়ে বারান্দায় বসে গল্প করছেন। বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসারে খুব কষ্ট—ঠাকুর তা জানতেন। ঠাকুর তাই স্নেহর সুরে বলতে লাগলেন, 'দেখ যত কষ্ট ওই এক কৌপিনের জন্য। বিয়ে করেছে ছেলেপুলে হয়েছে, তাই চাকরির প্রয়োজন। সাধু ব্যস্ত তাঁর কৌপিন নিয়ে, সংসারী ব্যস্ত তার স্ত্রীকে নিয়ে। ভাইদের সঙ্গে ঝগড়া, বনে না ফলে আলাদা বাসা করতে হয়েছে। এই জন্যই চৈতন্যদেব বলেছিলেন, ভাই নিত্যানন্দ শুনে রাখ—সংসারী লোকের কোনো গতি নেই।' হঠাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ

মাস্টারকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি তো আলাদা বাসা করে আছেন। তুমি কে, না আমি বিদেশিনী ; আর তুমি কে, না আমি বিরহিণী। তুজনের বেশ মিল হবে।'

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রাণখোলা ঠাট্টায় সবাই হেসে উঠল। হাসির প্রলেপ দিয়ে তুঃখ ভোলাতে চাইলেন তিনি। হরি প্রশ্ন করলেন, 'সংসারে এত তুঃখ কেন ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'এ সংসার তার লীলা-খেলার ন্যায়। তুঃখ পাপ এ সব গেলে লীলা চলে না। চোর চোর খেলায় বুড়ীকে ছুঁতে হয়। খেলার শুরুতেই বুড়ী ছুঁলে বুড়ী খুশি হয় না। ভগবান রূপ বুড়ীর ইচ্ছে খেলাটা খানিকক্ষণ চলুক।'

ঠাকুরের জন্মদিন। সব ভক্তরা জড় হয়েছেন। যেন একটা আনন্দ সাগর উথলে উঠেছে। সবাইকে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণর খুশি বাঁধভাঙা। গিরিশ ঘোষ তাঁকে অবতার মনে করেন। তাই কথায় কথায় বললেন, 'আপনার সব কাজই শ্রীকৃষ্ণের মতো। শ্রীকৃষ্ণ যেমন যশোদার কাছে ন্যাকামো করতেন

শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর দিলেন, 'তিনি অবতার···নরলীলায় অমন হয়। একদিকে গিরি গোবর্ধন ধারণ করছেন অন্যদিকে নন্দের কাছে দেখাচ্ছেন পিড়ি বয়ে নিয়ে যেতে তার কষ্ট হয়।'

গিরিশ ঘোষ বলে উঠলেন, 'বুঝেছি, আপনাকে এখন বুঝেছি।'

শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশ ঘোষকে বলছেন, 'আমি নরেন্দ্রকে আমার স্বরূপ বলে ভাবি। আমি ওর অনুগত।'

'আপনি কারই বা অনুগত নন ?' গিরিশ উত্তর দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসলেন। হেসে বললেন, 'ওর মদ্দার ভাব আর আমার মাদী ভাব। নরনের অখণ্ডের ঘর উঁচু ঘর।'

গিরিশ ঘোষ একটু বাইরে গিয়েছিলেন। পুনরায় ঘরে ফিরে এলে ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁগা তোমরা আমার কথা

কি বলছিলে—আমি খাই-দাই থাকি।'

'আপনার কথা কি আর বলব ?' গিরিশ জবাব দিলেন, 'আপনি কি সাধু ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'সাধু-টাধু নয়। সত্যি তো আমার সাধুবোধ নেই।'

'ফচকেমিতেও আপনার সঙ্গে পারলুম না।' গিরিশ ঘোষ ঠাকুরের কথা শুনে বললেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বসে আছেন নরেন্দ্রনাথের কাছে। ২৩ বছরের যুবক তখন নরেন্দ্রনাথ। পিতা মারা গেছেন। সংসারের অভাবের চিন্তায় আচ্ছন্ন। ঠাকুর এক নজরে তাকে দেখছেন। দেখতে দেখতে হাসিতে মুখ উদ্ভাসিত করে বললেন, 'তুই তো খ—তবে যদি ট্যাকসো না থাকত।' সবাই কথাটায় হাসতে ঠাকুর গল্পটা ভেঙে বললেন, 'কৃষ্ণকিশোর বলত সে খ। একদিন তার বাড়ি যেতে দেখি কম কথা বলছে, চিন্তিত। কি হয়েছে,…এমন করে বসে কেন ? জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, টেকসোওয়ালা এসেছিল ; সে বলে গেছে টাকা না দিলে ঘটি বাটি সব নিলাম করে নিয়ে যাবে, তাই ভাবছি। ওর কথা শুনে হাসতে হাসতে বললাম, সে কি গো ! তুমি তো খ— আকাশের মতো। যাক যা শালার ঘটি বাটি নিয়ে তাতে তোমার কি ?' একটু থেমে বললেন, 'তাই তোকে বলছি তুই তো খ, এত ভাবছিস কেন ?'

সুরেন্দ্রকে স্নেহ করেন ঠাকুর। তাঁকে বলছেন কথাচ্ছলে, 'তুমি অফিসে মিথ্যে কথা বলো তবু তোমার জিনিস খাই কেন ? তোমার যে দান-ধ্যান আছে—যা আয় করো তার চেয়ে দান বেশি—বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচি। কৃপণের জিনিস খাই না। তাদের ধন এ ভাবে উড়ে যায়—মামলা মোকদ্দমায়, চোর-ডাকাতে, ডাক্তার খরচে তা ছাড়া বদ ছেলেরা সব উড়িয়ে দেয়। তুমি দান কর এটা খুব ভাল

বড়লোকদের দান করা দরকার। কৃপণের ধন উড়ে যায়। দাতার ধন সৎকাজে ব্যয় হয়; রক্ষা পায়। যে দান করে সে অনেক ফল লাভ করে—একেবারে চতুর্বর্গ ফল।' সহজ কথায় দানের মহিমা বুঝিয়ে দেন ঠাকুর।

উর্জিতা ভক্তির কথা বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এমন সময় গিরিশ আবার ঘরে ঢুকলেন। তিনি বলে উঠলেন, 'আপনার কৃপা থাকলে সবই হয়। আমি কি ছিলাম আর আজ কি হয়েছি।'

'ওগো তোমার সংস্কার ছিল তাই হয়েছে।' শ্রীরামকৃষ্ণ আত্ম-প্রসংশায় বাধা দিলেন, 'সময় না হলে হয় না। সবই ভগবানের ইচ্ছায় হচ্ছে। এখানে আমাকে মনে করবে উপলক্ষ্য মাত্র। চাঁদ মামা সবারই মামা।'

হেসে উঠলেন গিরিশ ঘোষ। তিনি বললেন, 'ঈশ্বরের ইচ্ছায় তো। আমি তো তাই বলছি।' এবার সবাই হাসিতে যোগ দিল।

গিরিশ ঘোষের বাড়িতে গিয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ভক্তজনদের অমৃত-কথন শোনাচ্ছেন। তিনি বললেন, 'জাগ্রত স্বপ্নাচ্ছন্ন সুষুপ্তি জীবের এই তিন অবস্থা। সমস্তই মায়া, যে রকম আয়নাতে প্রতিবিম্ব পড়ে। প্রতিবিম্ব কোনো জিনিস নয়—ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু। ব্রহ্ম-জ্ঞানীরা তাই বলেন, যদি দেহাত্ম বুদ্ধি থাকে তাহলেই দুটো দেখায় তখন প্রতিবিম্বও সত্য অনুভূত হয়। ঐ বুদ্ধি ছেড়ে গেলে আমিই সেই ব্রহ্ম বোধ জন্মায়।

'আমিত্ব সহজে যায় না। তাই ভক্ত জাগ্রত স্বপ্ন এসব অবস্থাকে নস্যাৎ করে না। ভক্ত দেখে তিনিই সব হয়ে রয়েছেন আবার চিন্ময় রূপে তিনিই দেখা দিচ্ছেন। সহজে আমি যায় না বলে ভক্ত তাকে দাস করে রাখে। ভক্তেরও একাকার জ্ঞান হয়—ভগবান ছাড়া আর কিছুই নেই এই সে দেখে। পাকা ভক্তি থেকে এমন বোধ হয়। অনেক পিত্ত জমলে ন্যাবা লাগে। তখন ন্যাবারোগী সব হলদে দেখে।

পারার হ্রদে অনেকদিন সীসে রেখে দিলে সেটাও পারা হয়ে যায়। ফের অনুভব করে তিনিই আমি। আমিই তিনি। কুমুড়ে পোকা ভেবে ভেবে চলৎশক্তিহীন হয় আরশোলা। নড়তে পারে না। অবশেষে কুমুড়ে পোকাতেই বদলে যায়। যখন বদলায় তখন সব শেষ হয়। সেই তার মুক্তি।' শ্রীরামকৃষ্ণ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করছেন প্রাঞ্জল করে। গভীর তত্ত্ব। আজকের মনোবিজ্ঞানের তত্ত্বও তিনি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সহজে। যৌনতার ওপর সহজ সরল কথা। তিনি বলতে লাগলেন, 'মাতৃভাব অতি শুদ্ধ। কোনো ভোগের গন্ধ নেই। যেন জলস্পর্শ না করে একাদশী। সবকিছুতেই মাতৃ অনুভব। আমি যোড়শী পুজো করেছিলাম। তখন দেখেছিলাম স্তন, মাতৃস্তন, যোনি, মাতৃযোনি। সাধনের শেষ উপলব্ধি এই মাতৃভাব। তুমি মা, আমি তোমার সন্তান।

'সন্ন্যাসীর একাদশী সব সময় জলহীন। ভোগ থাকলেই ভয়—টাকা মেয়েমানুষ ভোগ। সন্ন্যাসীর তাই ভক্ত স্ত্রীলোকের সঙ্গেও আলাপ করা অনুচিত। এতে নিজের ক্ষতি তো বটেই অন্যেরও ক্ষতির সম্ভাবনা। লোকশিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সন্ন্যাসী দেহ ধরে শুধু লোকশিক্ষার প্রয়োজনে।

'মেয়েদের সঙ্গে বসা, আলাপ করা তাকেও রমণ বলা হয়। রমণ আট রকম। মেয়েদের কথা শুনে মনে মনে খুশি হওয়া এক রকম, মেয়েদের কথা বলা, নির্জনে মেয়েদের সঙ্গে চুপি চুপি আলাপ করা, তাদের কোনো ব্যবহার্য জিনিস কাছে রাখা, ছোঁয়া এসবই প্রকারান্তরে রমণ; এই জন্য গুরুপত্নী যুবতী হলে তাঁর পা ছুঁতে নেই, সন্ন্যাসীদের জন্য এটা নিয়ম।'

এতক্ষণ শোনার পর গিরিশ জিজ্ঞেস করলেন, 'তাহলে আমাদের কি উপায়?'

শ্রীরামকৃষ্ণ জানালেন, 'ভক্তিই সার।'

একদিন ভক্তসঙ্গে বসে গান শুনতে শুনতে সমাধিস্থ ঠাকুর। ভাবের ঘোরে মার সঙ্গে কথা বলছেন। একটু একটু তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। ভক্তদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'জান, আগে কই মাছ জীইয়ে রাখা দেখে অবাক হয়ে যেতুম। ভাবতুম, এরা কি কঠিন প্রাণ শেষকালে মাছগুলোকে হত্যা করবে। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তনে দেখলুম শরীর শুধু মাত্র খোল। থাকল কি গেল তাতে কিছুই এসে যায় না।'

'তাহলে মানুষকে মেরে ফেলা যায়?' ভবনাথ প্রশ্ন করলে।

'হ্যাঁ, এ অবস্থায় হতে পারে।' শ্রীরামকৃষ্ণ জবাব দিলেন। 'সবার সেই অবস্থা হয় না। একে বলে ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মজ্ঞান হলে বোঝা যায় তিনিই সবকিছু। তখন কারো ওপর রাগ থাকে না। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে লীলা আস্বাদন করে বেড়াও। শোন তবে—শহরে এসে এক সাধু রং দেখে বেড়াচ্ছে। এমন সময় তার সঙ্গে আগের আলাপী অন্য এক সাধুর দেখা। সে বলল, তোমার পোঁটলা-পুঁটলি কই? খুব যে ঘুরে ঘুরে আমোদ করে বেড়াচ্ছ, সেগুলো চোরে নিয়ে যায় নি তো? প্রথম সাধু বললে, না মহারাজ, আগে বাসা ঠিক করে তাতে তল্পিতল্পা রেখে ঘরে তালা দিয়ে শহরের রং দেখতে বেরিয়েছি।'

গল্প শুনে সবাই খুব হেসে উঠল।

'ব্রহ্মজ্ঞান সহজে হয় না। মনের নাশ না হলে হয় না। গুরু তাই শিষ্যকে বলেছিলেন, আমাকে তুমি মন দাও—আমি তোমাকে জ্ঞান দিচ্ছি। তোমরা, অন্তরঙ্গ ছাড়া এখানে বাইরের কেউ নেই; তাই তোমাদের বলছি, মন থেকে যে ভগবানকে জানতে চাইবে তারই হবে। হবেই হবে। ভগবানের দিকে মন যায় না কেন? ঈশ্বরের চেয়ে যে মহামায়ার জোর বেশি। জজের চেয়ে তার পেয়াদার ক্ষমতা বেশি।' সবাই নতুন করে হেসে উঠলেন।

'জীবরা কামিনী কাঞ্চনে বাঁধা—' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'তাদের ঘরের জানালা দরজা বন্ধ। ইসকুরুপ দিয়ে আঁটা···বেরবার পথ নেই।'

'জীব যদি এমন আবদ্ধ তাহলে তার উপায় ?' গিরিশ জানতে চাইলেন।

'উপায় গুরুরূপে ভগবান নিজে যদি মায়ার দড়ি কাটেন।' শ্রীরামকৃষ্ণ সহজ প্রত্যয়ে কথাটা ছুঁড়ে দিলেন। এ যেন তিনি আভাস দিচ্ছেন, জীবকে মুক্তি দিতে তিনি গুরুরূপে আবির্ভূত। আমি এসেছি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করো।

কীর্তন হচ্ছে। ভক্তসঙ্গে ঠাকুর কীর্তন শুনছেন। কীর্তনের শুরুতেই শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধির কোলে ঢলে পড়লেন। কিছুক্ষণ বাদে প্রকৃতিস্থ হলেন। তিনি বাক্যালাপ শুরু করলেন। ভক্তরা চুপ করে শুনছেন। হাসতে হাসতে মহিমাচরণকে বলছেন, 'আপনার কি ভাল লাগে ?'

হেসে মহিমাচরণ উত্তর দিলেন, 'আম।'

শ্রীরামকৃষ্ণ তখনো হাসছেন, 'একলা একলা না সবাইকে দিয়ে থুয়ে ?'

'আমার এত দেবার ইচ্ছে নেই।' মহিমাচরণ সাফ জানালেন।

তত্ত্বকথায় চলে গেলেন ঠাকুর মুহূর্তে। সরস রসিকতা গভীরতায় বদলে গেল। 'আমার কি ভাব জান ? তাকিয়ে দেখলেই কি তিনি আর নেই ? নিত্য লীলা দুইই আমি। তাঁকে লাভ করলে বোঝা যায়। তিনি স্বরাট তিনিই বিরাট। তিনি একাধারে অখণ্ড সচ্চিদানন্দ আবার জীব জগৎরূপে বিস্তীর্ণ।' শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পূর্ণ জ্ঞানে ফিরেছেন। ভাবগম্ভীর জলদ স্বর তাঁর। 'সাধনা চাই···শুধু শাস্তর পড়লে হয় না।'

'সাধনার অবকাশ কোথায় ?' মহিমাচরণ প্রশ্ন করলেন। 'এই সংসারে কত কাজ।'

'সেকি !' ঠাকুর অবাক হলেন যেন। 'তুমি না বলো সবই স্বপ্নের মতো।'

মাঝখানে একজন ভক্ত বলে উঠলেন, 'আমাদের মতো সংসারীদের কি করণীয় ?'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'উপায় হল সাধুসঙ্গ করা। ভগবানের কথা শোনা। সংসারীরা মাতালের মতো। মেতে আছে অর্থ আর মেয়েমানুষে। মাতালকে জানো তো একটু একটু করে চালুনির জল খাওয়ালে ধীরে ধীরে হুঁশ আসে। এও ঠিক তাই। সৎগুরু করা দরকার। শুধু পণ্ডিত হলে হয় না। যে সংসারকে অনিত্য ভাবে না তাঁর উপদেশে লাভ নেই। বিবেক বৈরাগ্যঅলা পণ্ডিতই উপদেশ দিতে পারেন। সামাধ্যায়ী একবার বলেছিল, ভগবান নীরস...যিনি রসস্বরূপ তাঁকে রসহীন আখ্যা দিয়েছিল। যেমন একজন বলেছিল তার মামাবাড়িতে নাকি এক গোয়াল ঘোড়া আছে!' সবাই হেসে উঠলেন ঠাকুরের রসকথায়। গাম্ভীর্য আবার তরল হয়ে গেছে।

ভক্তসঙ্গে পরমানন্দে আলাপ করছেন। মুখ দিয়ে কথার জোয়ার বইছে। কথায় কথায় তিনি বলে উঠলেন, 'যার জ্ঞান রয়েছে তার ভেতরই অজ্ঞান আছে। তাই বশিষ্ঠদেবেরও পুত্রশোক হয়েছিল। যেমন কারো পায়ে একটা কাঁটা ফুটলে সে তা তোলবার জন্য আরেকটা কাঁটা নেয়। তারপর কাঁটা তোলা হলে দুটো কাঁটাই ফেলে দেয়। অজ্ঞান কাঁটা তোলার জন্য জোগাড় করতে হয় জ্ঞান কাঁটা। ওই দুটো কাঁটা ফেলে দিলেই বিজ্ঞানে উপলব্ধি। ভগবান রয়েছেন এই বোধকে বুঝে তাঁকে বিশেষভাবে জানতে হয়—আলাপ করতে হয় আলাদা স্তরে—একেই বিজ্ঞান বলে। তাই তো শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে ত্রিগুণাতীত হতে বলেছিলেন।'

এইসব কথার মধ্যে অন্য দুজন সঙ্গী সহ শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্তও সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁদের মধ্যে পরিচয় ঘটল।

কিছুক্ষণের জন্য ঠাকুরের ভাবের ঘোর হয়েছে। সামনে গিরিশ

প্রমুখ ভক্ত। কাছেই জলের গ্লাস। তিনি জল খেলেন। তখনো সন্ধ্যে হয় নি। গিরিশের ভাই অতুলের সঙ্গে কথা বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। 'আপনারা দুই করবেন—সংসারও করবেন আবার যাতে ভক্তি হয় তাও।' তাঁর দয়া হলে সব হয়। তীব্র বৈরাগ্য চাই—যেন মনে হবে খাপখোলা তরোয়াল। এমন বৈরাগ্য যাতে আত্মীয়কে কালসাপ মনে হবে। ঘরকে মনে হবে পাতকুয়ো। অন্তরের আকুলতা দিয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। ডাক আন্তরিক হলে তিনি শুনবেনই।'

'কিন্তু মন থাকে কোথায় ?' অতুল মৃদু স্বরে বললেন।

'থাকবে থাকবে।' শ্রীরামকৃষ্ণ সহজে বললেন। সবই অভ্যাস মাত্র। প্রতিদিন তাঁকে ডাকার অভ্যেস করতে হয়। ব্যাকুলতা একদিনে আসে না। রোজ ডাকলে আসবে।'

তেজচন্দ্র কাছে এসে বসলেন। তিনি ফিসফিস করে মাস্টারকে যাবার কথা বললেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতে চাইলেন, 'কি ব্যাপার ?' মহেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, 'তেজচন্দ্র বাড়ি যাবে বলছে।' তাই শুনে ঠাকুর বললেন, 'ওদের আমি এত কেন টানি জান ? ওরা পরিষ্কার পাত্র—বিষয়-বুদ্ধি ঢোকে নি। বিষয়-বুদ্ধি হলে উপদেশ গ্রহণ করা যায় না। নতুন হাঁড়িতে দুধ রাখা যায় কিন্তু দই পাতা হাঁড়িতে রাখলে দুধ নষ্ট হয়। যে বাটিতে রসুন গোলা হয়েছে যতই ধোও না কেন তার গন্ধ যায় না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বর ফিরবেন। গিরিশ কাছে এলেন। তাঁর মনের মধ্যে অভিমান। তিনি শুনেছেন ঠাকুর একবার কোনো ভক্তের কাছে তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, 'রসুনের বাটি হাজার ধুলেও সেই গন্ধ কি একেবারে যায় ?' তাই অভিমানাহত স্বরে গিরিশ বলছেন, 'রসুনের গন্ধ কি যাবে ?'

নির্লিপ্ত ঠাকুর সহজ উত্তর দিলেন, 'যাবে।'

'যাবে !' গিরিশ ঘোষ অবাক হলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসলেন। সেই রহস্যপ্রিয়তা। রসঘন উত্তর, 'অত আগুন জ্বললে সব গন্ধ উধাও হয়। রসুনের বাটি পোড়ালে আর গন্ধ থাকে না। যে হবে না হবে না করে তার হয় না। কিন্তু যে জোর করে আমি মুক্ত হয়েছি বলে সে মুক্ত হয়। রাতদিন বদ্ধ বদ্ধ করলে তাকে শেষ পর্যন্ত বদ্ধই হতে হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণের অসুখের কথা তাঁর ভক্তরা জানতে পারলেন। ঠাকুরের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি তেমনি সদানন্দময় পরমপুরুষ। সবাই তাঁকে ঘিরে রয়েছেন। ঠাকুর ভক্তদের বলছেন, 'মাকে রোগের কথা বলতে পারি না। লজ্জা করে।'

গিরিশ বললেন, 'আমার নারায়ণ ভাল করবেন।'

রাম বলে উঠলেন, 'ভাল হয়ে যাবে।'

হেসে উঠলেন ঠাকুর, 'হ্যাঁ এই আশীর্বাদই কর।' কথার ঢঙে সবাই হেসে উঠল। শশধরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি আদ্যা-শক্তির বিষয়ে কিছু বল।'

শশধর বললেন, 'আমি কি জানি?'

হাসলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলতে লাগলেন। 'একজনকে একটি লোক খুব ভক্তি করে। লোকটি সেই ভক্তকে একদিন তামাক সাজবার জন্য আগুন আনতে বলায় ভক্ত উত্তর দিল, আমি কি আপনার আগুন আনবার উপযুক্ত? এই বলে সে আগুন আনলই না।' সবাই হেসে উঠল লঘু তরলতায়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরিহাস শেষ করে বলতে লাগলেন, 'দেখ যিনি পুরুষ তিনিই প্রকৃতি, আবার যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি—জল স্থির থাকলেও জল, নড়লেও জল—এঁকে-বেঁকে চলুক কিংবা কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকুক সাপ সাপই।'

কথা বলতে বলতে শ্রীরামকৃষ্ণ তলিয়ে গেলেন সমাধির মধ্যে। অল্প সময়েই বাহ্যাবস্থা ফিরে এলে বলতে লাগলেন, 'যতক্ষণ ভোগের সামান্য বাকি থাকে ততক্ষণ সমাধি হয় না। কাজ শেষ হয়ে গেলেই

আর নয়। গিন্নী বাড়ির কাজ-কর্ম শেষ করে নাইতে গেলে শত ডাকাডাকিতেও ফিরবে না।'

জ্ঞানবাবু এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে। সরকারী চাকরী করেন। তাঁকে দেখেই শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন, 'কি ব্যাপার, হঠাৎ যে জ্ঞানোদয়!'

জ্ঞানবাবু হাসলেন। কি নির্মল সুন্দর জিজ্ঞাসা। উত্তরে তিনি বললেন, 'আজ্ঞে অনেক কপাল করলে জ্ঞানের উদয় হয়।'

কথাটি ঠাকুর নিলেন। তিনি অমৃতবাণীময়। কথার খেলায় তাঁকে হারায় সাধ্য কার। তিনি বললেন, 'তা তুমি জ্ঞান হয়ে অজ্ঞান কেন?' মুখে হাসির প্রশান্তি। নিজেই সমাধান করলেন, 'ও বুঝেছি, যেখানে জ্ঞান সেখানেই তো অজ্ঞান। তা তুমি জ্ঞান অজ্ঞানের পার হও। যে ব্যক্তি নিত্যতে পৌঁছে লীলা নিয়ে থাকে আবার লীলা থেকে নিত্যে ফিরতে পারে তারই পাকা জ্ঞান হয়েছে। ভক্তি পেকেছে। এর নাম বিজ্ঞান।'

এক জায়গায় বসে কয়েকজন ভক্ত গল্প করছেন। ছোট গোপাল হাজরা ভবনাথ মুখুয্যে ভাইরা। এমন সময় ঝাউতলায় যাবার পথে ঠাকুর ওখানে একবার বসলেন। হাজরা তাঁকে দেখে ছোট গোপালকে বলল, 'এঁকে একটু তামাক খাওয়াও!' তাই শুনে পরমপুরুষ হাসলেন। অনাবিল হাসি। হাসতে হাসতেই বললেন, 'তুমি খাবে তাই বল,' মুখুয্যে হাজরাকে বলে উঠলেন, 'আপনি ওঁর কাছে প্রচুর শিক্ষা পেয়েছেন।' আবার হাসলেন ঠাকুর। বললেন, 'না, এঁর ছোটবেলা থেকেই এই অবস্থা।'

ঘরের ভেতর কথা হচ্ছে। কোন্নগর থেকে নতুন এক ভক্ত এসেছেন। তার সঙ্গে কথা হচ্ছে। তিনি ঠাকুরকে প্রশ্ন করে বসলেন, 'আমাদের উপায় কি?'

'গুরু বাক্যে বিশ্বাস।' নিশ্চিত উত্তর। কোনো দ্বিধা নেই।

গুরুর বাক্য ধরে গেলে ভগবানকে পাওয়া যায়। কোনো স্থুতোর খি ধরে গেলে বস্তুলাভ নিশ্চিত।'

'তাঁকে কি দেখা যায়?' সাধকের ফের প্রশ্ন।

'তিনি বিষয় বুদ্ধির বাইরে। কামিনী-কাঞ্চনে সামান্য আসক্তি থাকলে তাঁকে লাভ করা যায় না।'

সাধক তর্কে প্রবৃত্ত হলেন। ভগবান মুখনিঃসৃত বিশুদ্ধ বাক্যে বিশ্বাস কই! শাস্ত্র বাক্য আওড়ালেন।

শুনেই বাধা দিলেন পবমপুরুষ। বলে উঠলেন, 'ওসব থাক। সাধনা না করলে শাস্ত্রবাক্য বোধগম্য হয় না। ফড়ফড় কবে পণ্ডিতেরা শ্লোক ঝাড়ে—তাতে কি হয? সিদ্ধি সিদ্ধি বলে কি লাভ? সিদ্ধি গায়ে মাখলে নেশা হয না—খেতে হয়। দুধে মাখন আছে বলে ফল নেই। তাকে মন্থন কবলে তবে মাখন পাওযা যায়। পাঁজিতে লেখা আছে বিশ আড়া জল। এমনিতে তো এক ফোঁটা পড়ে না।' রসিযে বসিয়ে ঠাকুর সাধকের অহঙ্কাবেব অভিমানে আঘাত করলেন। সোজা রসযুক্ত কথা দিয়ে প্রাঞ্জল করলেন দ্বিধাকে, সন্দেহকে। সাধক চুপ করে গেলেন।

শ্রীমহেন্দ্র মুখোপাধ্যায় তীর্থ করতে যাবেন শ্রীরামকৃষ্ণকে তাই জানালেন। তাই শুনে পরমপুরুষ হেসে উঠলেন। বললেন, 'সে কি ব্যাপার অঙ্কুব না হতেই চললে? অঙ্কুর হবে, তারপর তার থেকে গাছ, তারপর সেই গাছে ফল ধরবে।' রসিকতা করে তিনি ভক্তর মানসিক স্তর বুঝিয়ে দিলেন।

প্রিয় মুখুয্যে একদিন হেসে হেসে মহেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বললেন, 'ইনি এখন থেকে আমাদের ওপর মাস্টারী করবেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ তাই শুনে হালকা চালে বললেন, 'গাঁজাখোরের স্বভাব অন্য গাঁজাখোর দেখলেই খুশি হয়। আমীর তার কাছে এলে কথা বলে না। কিন্তু যদি একজন লক্ষ্মীছাড়া গেঁজেল আসে

তাহলে হয়তো তার সঙ্গে কোলাকুলি করে।'

কথায় কথায় ঠাকুর একদিন বললেন, 'আপনারা যে আসছেন তাতে কি কিছু ভাল হচ্ছে—ভাল শুনলে মনটা খুশি হয়। তেমন লেখাপড়া জানি না—'

উত্তরে মাস্টার বললেন, 'ভগবান নিজেই সব হয়েছেন কিনা, তাই এত টান। ভগবান বস্তু থাকলেই মনকে আকর্ষণ করে।'

'গোপীদের ভালবাসা। পরকীয়া রতি।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে লাগলেন, 'কৃষ্ণের জন্য গোপিনীরা প্রেমে আত্মহারা হয়েছিল। নিজের স্বামীর জন্য এত হয় না। কেউ হয়তো বললে, ওরে তোর সোয়ামী এয়েছে রে! শুনে সে বলে, তা আসুক না। ঐ খাবে এখন। কিন্তু যদি পরপুরুষের কথা শোনে, রসিক সুন্দর রস পণ্ডিত, ছুটবে দেখতে—আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখবে। যদি খোঁচ ধর যে তাকে দেখি নি তাহলে কেমন করে তার ওপর গোপিনীদের মতো আকর্ষণ জন্মাবে? তা শুনলেও সেই আকর্ষণ জন্মায়। না জেনে শুধু নাম শুনে কানে তা লিপ্ত হল।' শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রতি ভক্তদের আকর্ষণের ব্যাখ্যা করছেন। জলের মতো সহজ তাঁর বর্ণনা, তুলনা।

একজন ভক্ত প্রশ্ন করলেন, 'বস্ত্রহরণ কি?'

পরমপুরুষ উত্তর দিচ্ছেন, 'অষ্ট পাশ। গোপিনীদের সব গিয়েও লজ্জা বাকী ছিল। তাই তিনি তাদের ওইটুকুও ঘুচিয়ে দিলেন। ভগবানকে পেলে সব পাশ শেষ হয়ে যায়।' শ্রীরামকৃষ্ণ এবার রহস্য করে ভক্তদের বলে উঠলেন, 'কামনা থাকতে, ভোগের প্রতি ইচ্ছা থাকতে মুক্তি নেই। তাই খাওয়া-পড়া রমন-ফমন সব করে নাও।' হেসে মহেন্দ্রনাথ গুপ্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কি বলো তুমি? নিজের স্ত্রীতে না পরস্ত্রীতে?' কথা শুনে সবাই হেসে উঠলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পুরনো কথা বলছেন। নিজের সাধ-আহ্লাদের কথা। এই কথার মধ্যে দিয়ে তিনি ভক্তদের আসক্তিকে সরিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বলতে লাগলেন, 'ভোগ লালসা থাকা খারাপ। তাই আমার যা যা মনে আসত করে নিতাম। এই যেমন ধবো, বড়বাজারের রং করা সন্দেশ দেখে খেতে সাধ হল। এরা আনিয়ে দিলে খুব সে খেয়ে নিলাম। তাবপর অসুখ হল। নাথের বাগানে ছোট বেলায় স্নানের সময় একটা ছেলের কোমড়ে সোনার গোট দেখেছিলাম। এই অবস্থার পর সেই গোট পড়তে ইচ্ছে হল। পরলাম। তা বেশিক্ষণ পরবার উপায় নেই। গা শির শির করছে। বায়ু ওপর দিকে চড়াও হচ্ছে। সোনা গায়ে ঠেকছে তাই এমন। একটু বাদেই খুলে ফেলতে হল। খোলা না গেলে ছিঁড়ে ফেলতে হত। শম্ভুর চণ্ডী গান শোনবার সাধ হয়েছিল। তারপর ইচ্ছে হল রাজনারায়ণের গান। তুইই শুনলাম। এরপর একবার জরীর সাজ পড়তে বাসনা গেল। জরীর সাজ পরব রুপোর গুড়গুড়িতে তামাক খাব। সেজবাবু নতুন সাজ গুড়গুড়ি পাঠিয়ে দিলেন। সাজ পবলাম। নানা ভাবে গুড়গুড়ি টানতে লাগলাম। একবার এপাশ থেকে ওপাশ—আবার উঁচু থেকে, নিচু থেকে। তখন বললাম, এব নাম রুপোর গুড়গুড়ি খাওয়া। এই বলে গুড়গুড়ি ত্যাগ হল। সাজগুলো একটু বাদেই খুলে ফেললুম। মাড়াতে লাগলাম পা দিয়ে—তার ওপর থুতু দিলাম। বললাম, এর নাম সাজ! সাজ থেকে রজোগুণ হয়!'

নিজের কথা বলছেন ভক্তদের। অভিজ্ঞতার কথা। সত্য উপলব্ধির বিষয়। ভক্ত রাখালের কথা বলছেন। তাঁর কথায় বউ ছেড়ে রাখাল বাড়ি থেকে চলে এসেছে। 'রাখালের ভোগের সামান্য বাকি ছিল।' পরমপুরুষ বলতে লাগলেন, 'তাই ওকে জোর করে পাঠিয়ে দিতাম পরিবারের কাছে। এখন বৃন্দাবনে বলরামের সঙ্গে আছে। বৃন্দাবন থেকে চিঠি দিয়েছে, খুব ভাল জায়গা। ময়ূর ময়ূরী নাকি নেচে

বেড়াচ্ছে—এখন ময়ূর ময়ূরী—খুব বিপদে ফেলেছে।' শ্রীরামকৃষ্ণ রহস্য করলেন। 'ছোকরাদের আমি ভালবাসি—তার কারণ আর কিছু না—ওদের দেখতে পাই নিত্য সিদ্ধরূপে—ওদের মধ্যে টাকা মেয়েমানুষ ঢোকে নি। যখন নরেন্দ্র প্রথম এসেছিল, ময়লা চাদর গায়ে। কিন্তু চোখ মুখ দেখেই মনে হয়েছিল ওর ভেতর কিছু রয়েছে। ও এলে ওর দিকে তাকিয়েই কথা বলতাম। তাই দেখে সে বলত, এঁদের সঙ্গে কথা বলুন। ওর জন্য পাগলের মতো কেঁদেছি যদু মল্লিকের বাগানে। ভোলানাথ তাই দেখে আমাকে বলে কিনা, একটা কায়েতের ছেলের জন্য আমার অমন করা উচিত হয়নি। মোটা বামনা একদিন হাতজোড় করে বললে, ওর পড়াশোনা কম, তাই তার জন্য অধীর কেন হন ?

'মেয়েদের সঙ্গে ছোকরাদের মিশতে নিষেধ করি। তার কারণ আছে। মেয়েরা মায়া জানে। হরিপদ ঘোষপাড়ার এক মাগীর পাল্লায় পড়েছে। সে বলে বাৎসল্য ভাব দেখায়। বয়স কম হরিপদ বুঝতে পারে না। ছোকরা দেখলে ওরা অমন করে, হরিপদ বলে তার কোলে শোয়। ওকে বারণ করব। বাৎসল্য থেকে আসে তাচ্ছিল্য। ওদের এখনকার সাধন হল মানুষ নিয়ে। মানুষকে শ্রীকৃষ্ণ ভাবে। বলে রাগকৃষ্ণ। গুরু প্রশ্ন করে রাগকৃষ্ণ পেয়েছিস ? উত্তরে সে জানায় হ্যাঁ। যাকগে মাগীটা সেদিন এসেছিল। চাহনি দেখে মনে হল খুব ভাল নয় তাই তারই ভাবে বললাম, হরিদাসকে নিয়ে যা করছ করো—কিন্তু এর মধ্যে অন্যায় যেন না থাকে। ছোকরাদের সাধনার সময়। এখন শুধু ত্যাগ। তাই বলি সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের ছবি পর্যন্ত দেখবে না। ভক্ত মেয়েমানুষ হলেও দাঁড়িয়ে সামান্য কথা বলবে। নিজের সাবধানতার জন্য সিদ্ধ হলেও এমন করতে হয়। তাছাড়া লোকশিক্ষার জন্যও এঁর দারকার। মেয়েরা এলে আমিও একটু পরে বলি, তোমরা এবার ঠাকুর দেখ। যদি এই কথায় না ওঠে তো নিজেই উঠে যাই। আমাকে দেখে তবে

সবাই শিখবে। আচ্ছা এই যে তোমরা আসছ, ছেলেরা আসছে- এর মানে কি? আমার তাহলে কি এমন কিছু আছে যাতে টান হয়। আকর্ষণ জন্ম নেয়। হৃদের বাড়ি এমন হয়েছিল। যেখানে যাই মানুষ। খোল করতাল কীর্তন। হৃদে বাধ্য হয়ে বললে, আমরা কি তার আগে কীর্তন শুনি নি? একজন বলে ফেললে, ব্রহ্মজ্ঞানী। অন্যজন বললে, তাহলে এর মালা-তিলক কোথায়? অপর আর একজন বললে, নারকোলের বেল্লো আপনা আপনি খসে গেছে। কথাটা এখানেই শিখলাম। জ্ঞান হলে আপনিই উপাধির বিলুপ্তি ঘটে।'

রাধিকা গোস্বামী এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দেখতে। তিনি প্রণাম করলেন। ত্রিশ বছর বয়স। ঠাকুর প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা কি অদ্বৈতবংশ?'

গোস্বামী উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ।'

তাই শুনে ঠাকুর হাতজোড় করলেন। মুখে বললেন, 'অদ্বৈত গোস্বামীর বংশ, আকরের গুণ রয়েছেই। নেকো আমের গাছে নেকো আমই হয়।' অন্য ভক্তরা এই কথায় হেসে উঠলেন। 'খারাপ আম ফলে না। মাটির জন্য হয়তো একটু ছোট বড় হয় এই যা। আপনি কি বলেন?'

গোস্বামী বললেন, 'আমি কি বলব, কি জানি আমি।'

'যাই বলো তুমি, অন্য লোকে ছাড়বে না—ব্রাহ্মণ হাজার দোষ থাকুক—তবু শাণ্ডিল্য ভরদ্বাজ গোত্র বলে তারা সবাই পূজ্য। বংশে মহাপুরুষ জন্মালে তিনিই টেনে তুলবেন···যত অপরাধ থাকুক··· আপনারা বেশ কত জপ-তপ করেন। বৈষ্ণব যে সাধনা করে তা প্রকাশে দোষ নেই। তান্ত্রিকের কিন্তু সব গোপন। তাকে তাই বোঝা দায়।'

বিনীত ভাবে গোস্বামী বললেন, 'আমরা আর কি করছি। আমি নিতান্ত অধম।'

ঠাকুর হেসে ফেললেন, 'দীনতা, বিনয়···হ্যাঁ তা আছে বই কি। আবার আরো আছে, আমি হরিনাম করছি, আমার কিসের পাপ! রাতদিন যে নিজেকে পাপী পাপী বা অধম অধম বলে বেড়ায় সে তাই হয়ে যায়। ভগবান বলে, কি এত অবিশ্বাস! নাম করে আবার বলছে, পাপ পাপ!'

গোস্বামী অবাক হয়ে বিশ্লেষণ শুনছেন। আয়নার মতো কি স্বচ্ছ। যুক্তির কি অপূর্ব দৃঢ়তা। কত সহজ রস-বিচারের ক্ষমতা। শ্রীরামকৃষ্ণ বলে যাচ্ছেন, 'আমি সব করেছি। সব পথ মানি। এখানে তাই সকলেই আসে। সবাই আমাকে তাদের লোক মনে করে। কেন একঘেয়ে হব? অমুক মতের লোক আসবে না এ ভয় আমার নয়। কে এল না এল তাতে আমার বয়ে গেছে। লোককে হাতে রাখার মতো মনে আবার কিছু নেই।' সাম্প্রদায়িকতার ক্ষুদ্রতার বিরুদ্ধে এসব কথা শুনে গোস্বামী চুপ করে রয়েছেন।

'বিজয় কিন্তু বেশ হয়েছে।' বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কথা বলছেন। 'হরিনাম বলেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। রাত চারটা পর্যন্ত ধ্যান কীর্তন নিয়ে কাটায়। গেরুয়া পরে। ঠাকুর বিগ্রহ দেখলে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি-পাত করে। আমার সঙ্গে গদাধরের পাঠবাড়িতে গিয়েছিল। এখানে ধ্যান করতেন বলায় সেখানে প্রণাম করলে। চৈতন্যদেবের ছবি দেখে প্রণাম করলে।'

গোস্বামী জানতে চাইলেন, 'রাধাকৃষ্ণর মূর্তির সামনে কি করলেন?'

'প্রণাম করলে। লোকে তাকে কে কি বলল তাই নিয়ে ভাবে না। আমায় মান্য করে। খুব ব্যস্ত লোক। আজ সে এখানে কাল ওখানে। তাঁকে নিয়ে তাদের সমাজে হৈচৈ পড়ে গেছে। তারা বলছে, তুমি পৌত্তলিক, সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশ। সে খুব উদার সরল। সরল না হলে ভগবানের কৃপা লাভ হয় না।'

মুখুজ্যে দুই ভাইরাও এসেছিল। এবার তাদের সঙ্গে কথা শুরু

করলেন। বড় ভাই ব্যবসায়ী। ছোট প্রিয়নাথ ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। কেদেটিতে থাকেন। বাগবাজারেও বসতবাড়ি রয়েছে। মুখে হাসি বিস্তৃত করে তিনি বললেন, 'একটু উদ্দীপন হচ্ছে বলে থেম না। এগোও। চন্দন কাঠের পর আরও আছে, রুপোর খনি সোনার খনি।'

উত্তর দিলেন প্রিয়নাথ, 'পায়ে যে বাঁধা আছে, এগোতে দেয় না। মন আমার বশ নয়।'

'উহুঁ। মনেই যত বন্ধন আবার মনেই মুক্তি।' ঠাকুর সহজ করে দিচ্ছেন জটিল প্রসঙ্গ। সব অভ্যাস যোগ! অভ্যাস করো, দেখবে মনকে যেদিকে বলবে সেদিকে যাবে।' কথা বলতে বলতে গোস্বামীকে বললেন, 'এখানে সব ভাবই আছে·· সব রকম লোক আসবে তাই। তাঁর ইচ্ছাতেই নানা ধর্ম নানা মতের উৎপত্তি। যার যা ভাল লাগে সে সেই ভাবটি নিয়ে থাকে। বারোয়ারীতে বিভিন্ন মূর্তি হয়···নানা মতের লোক দেখতে যায়। রাধাকৃষ্ণ হরপার্বতী সীতারাম। একেক জায়গায় একেক মূর্তি; সর্বত্রই লোকের ভিড়। বৈষ্ণবরা রাধাকৃষ্ণের কাছে, শাক্তরা হরপার্বতীর সামনে। রামভক্তদের ভিড় সীতারামের নিকট, যাদের কোনো মতেই মন নেই তাদের কথা আলাদা। বারোয়ারীতে বেশ্যা উপপতিকে ঝাঁটা মারছে এমন মূর্তিও থাকে···তারা হাঁ করে তাই দেখে আর দলের লোককে ডাকে।'

এই কথা শুনে সকলেই হাসতে লাগলেন। বিমল হাসির আব-হাওয়ায় একটা পবিত্রতার সৃষ্টি হল। গোস্বামী বিদায় নিলেন প্রণামান্তে। ভক্তদের বিকেলে বললেন ঠাকুর, 'একঘেয়ে হব কি জন্য? ওরা গোঁড়া আর বৈষ্ণব, মনে ভাবে তারাই ঠিক, আর সবাই ভুল করছে। যা বলেছি খুব লেগেছে।' নিজেই হাসছেন। বললেন, 'জানিস হাতির মাথায় অঙ্কুশ মারতে হয় ওদের মাথায় বলে কোষ আছে।' এবার সবাই হেসে উঠল। ফস্টিনস্টিতে মেতে উঠলেন তিনি—ভক্তদের বললেন, 'ছোকরাদের আমি শুধু নিরামিষই দি না—

মাঝে মধ্যে এক আধটু আঁষ ধোয়া জলও দি—স্বাদ না পেলে আসবে কেন ?' মুখুজ্যেরা উঠে বাগানে বেড়াতে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মাস্টারকে বলছেন, 'আমি যখন জপ করতাম সমাধি হয়ে যেত। এই ভাব কেমন ?'

'খুব ভাল ভাব।' মাস্টার বললেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ—'সাধু সাধু' বলে হেসে উঠলেন। তারপরই বলে উঠলেন, 'কিন্তু ওই মুখুয্যেরা কি ভাববে ?'

মহেন্দ্রনাথ বলে ফেললেন, 'কাপ্তেন তো বলেছিলেন, আপনার বালকের অবস্থা। ভগবানের দেখা পেলে বালকের অবস্থা হয়।'

শ্রীরামকৃষ্ণ তিন অবস্থার কথা বলতে লাগলেন,'বাল্য, পৌগণ্ড ও যুবক। পৌগণ্ড অবস্থায় ফচকেমি করে, মুখ দিয়ে হয়তো খিস্তি-খেউর বেরয়। কিন্তু যুবা অবস্থায় সিংহ বিক্রম—লোকশিক্ষা দেয়। তুমি না হয় ওদের সমঝে দিও।'

'আমাকে বোঝাতে হবে না। ওরা এ সব কি আর জানে না ?'

আবার সন্ধ্যেতে ভক্তসঙ্গে বসেছেন। সবাই উন্মুখ কিছু শুনবার জন্য। তিনি ধীরে ধীরে বলতে লাগলেন, 'তাঁকে পেতে হলে সংস্কার দরকার। তপস্যা চাই—তা এ জন্মেই হোক বা পূর্ব জন্মের। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ করছে। তিনি আকুল হয়ে কাঁদতে শ্রীকৃষ্ণ দেখা দিলেন। তাকে বললেন, কাউকে যদি তুমি কখনো বস্ত্রদান করে থাক তো তা এখনি মনে কর তাহলেই লজ্জা নিবারণ হবে। দ্রৌপদী বললেন, হ্যাঁ মনে পড়েছে। একদিন একজন ঋষি স্নান করছিলেন তখন তাঁর কপনী ভেসে গিয়েছিল। নিজের কাপড় আধখানা তাঁকে ছিঁড়ে দিয়েছিলাম। শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আর ভয় নেই।' কি চমৎকার উপমা। সংস্কারের অপূর্ব দৃষ্টান্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া এমন সহজে এ কথা আর কে বলবে এমন রসস্নিগ্ধ গল্প বা কাহিনী। যাতে সংশয় মুহূর্তে পালিয়ে যায়।

হাজরা শ্রীরামকৃষ্ণর দেশের লোক। তিনি মাঝে মাঝে ঠাকুরকে ভাবেন মহাপুরুষ আবার কখনো তাঁকে গণ্যই করেন না। ঠাকুরের অনেক কিছুই তাঁর পছন্দ হয়' না। বহু সময় ঠাকুর তাঁকে ক্ষমা করেন। ঠাট্টা করেন। একদিন হঠাৎ তাঁকে বললেন, 'তুমি যা করছ তা সবই ঠিক তবু ঠিক ঠিক বসছে না। দেখ কারো নিন্দে করবে না। পোকার পর্যন্ত নয়। নিজেই তো লোমশ মুনির উদাহরণ দাও—যেমন ভক্তি চাইবে তেমনি বলবে, কারো যেন নিন্দে না করি।'

'তিনি কি প্রার্থনা শুনবেন?' হাজরা প্রশ্ন করলেন।

'শুনবেন না মানে—একশোবার শুনবেন। হ্যাঁ, তবে প্রার্থনা আন্তরিক হওয়া চাই। বিষয়ী মানুষ যেমন মাগ ছেলের জন্য কাঁদে ভগবানের জন্য কি কাঁদে তেমন করে? শোন তবে, আমাদের ওখানে একজনের বউর খুব অসুখ করেছিল। স্ত্রীর অসুখ সারবে না মনে করে লোকটা একদিন থরথর করে কাঁপতে লাগল। জ্ঞান হারাবার পূর্বাবস্থা। ভগবানের জন্য কার এমন হয়?' হাজরা পরমপুরুষের পায়ের ধুলো নিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একটু গুটিয়ে গিয়ে বললেন, 'এগুলো আবার কি?'

'যার কাছে আছি তাঁর পায়ের ধুলো নেব না?'

হাজরার উত্তর শুনে তিনি বললেন, 'তাঁকে খুশি করলেই সবাই খুশি হবে। শ্রীকৃষ্ণ দ্রৌপদীর থালার শাক খেয়ে যখন বললেন, আমি তৃপ্ত তখন জগতের সব জীব তৃপ্ত—সবাই ঢেকুর তুলছেন। কিন্তু মুনিরা খেলে কি জগৎ তুষ্ট হয়েছিল? লোকশিক্ষার জন্য কিছু কাজ করতে হয়।' হাজরাকে বোঝাচ্ছেন পরমপুরুষ। 'আমি কালীঘরে যাই আবার দেখ এ ঘরের ছবিকেও নমস্কার করি। আমাকে দেখে সবাই করে। যেই অভ্যাস হয়ে যাবে না করলে মনের মধ্যে উসখুস ভাব হবেই।

'বটতলায় এক সন্ন্যাসীকে দেখেছিলাম। একই আসনে সে গুরু-

পাদুকা আর শালগ্রাম শিলা রেখে পুজো করছে। তাই দেখে জিজ্ঞেস করলাম, এ কেমন? যদি এত জ্ঞানই হয়ে থাকে তাহলে পুজো করছ কেন? সে জবাব দিলে, সবই করছি, এও করলাম···কখনো ফুল এ পায়ে দিচ্ছি আবার ও পায়ে দিচ্ছি। তাই বলছিলাম শরীর যতক্ষণ আছে কর্ম ত্যাগ করবার উপায় নেই···পাঁক থাকলে ভুরভুরি কাটবেই। যদি তোমার ভেতর এক জ্ঞান থাকে তো অনেক জ্ঞানও রয়েছে। শুধু শাস্ত্র পড়ে কি হয়? ওতে চিনি আর বালি মেশানো···চিনিটুকু খালি নেওয়া খুব শক্ত। তাই শাস্ত্রসার সাধুমুখে শুনে নিতে হয়। শাস্ত্র-পাঠের আর দরকারই পড়ে না।

'সব সন্ধান জেনে নিয়ে তারপর ডুব দাও। পুকুরের যেখানে ঘটিটা পড়েছে সে জায়গা আন্দাজ করে তবে ডুব দিতে হয়। ডুব দিলে তবে ঠিক ঠিক সাধন হয়। বসে বসে বিচারে ফল পাওয়া যায় না। শালারা সব যাবার পথের কথা নিয়েই মরছে। মর শালারা, ডুব দেয় না।'

নিজের সাধনকালের কঠোরতার কথা, আন্তরিকতার কথা তিনি বার বার ভক্তদের বলতেন। সর্বং বিষ্ণুময় জগৎ। এই বোধের কথা বুঝিয়েছেন নিজেকে দিয়ে। বললেন, 'কুকুরের ওপর চড়ে বসে তাকে লুচি খাইয়ে সেই লুচি নিজে খেতাম। অবিদ্যাকে না বশ করলে চলবে না। নিজে তাই বাঘ হয়ে যেতাম···হয়ে অবিদ্যাকে খেয়ে ফেলতাম। মাটিতে জমা জল দিয়ে আচমন করতাম। বেদমতে সাধনের সময় সন্ন্যাস নিয়েছিলাম। হৃদেকে বলেছিলাম, আমি সন্ন্যাসী, চাঁদনীতে বসে ভাত খাব।'

শ্রীরামকৃষ্ণ কথক। ভক্তরা শ্রোতা। এ সাধারণ কথকতা নয়। কথাচ্ছলে মন থেকে অজ্ঞানতা দূর করা। সম্মোহিতের মতো ভক্ত-মণ্ডলী সেই বাণী শুনতেন। আর রসের সাগরে হাবুডুবু খেতেন। ঈশ্বরলাভের পরের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে ঠাকুর বলছেন, 'তাঁকে যখন

পাওয়া যায় বেদ পুরাণ তন্ত্র বেদান্ত সমস্ত নিচে পড়ে থাকে। তখন ওঁ উচ্চারণ করার ক্ষমতা লুপ্ত হয়। এটা কেন হয়? সমাধি থেকে অনেক নেমে না এলে ওঁ বলতে পারি না।' সে সব দিনের কথা মনে করে বললেন, 'উঃ সে কি দিন কেটেছে! এক অবস্থা নিয়ে আরেক অবস্থা মনে উদয় হয়। এ যেন ঢেঁকির পাট—এক দিক নিচু তো সঙ্গে সঙ্গে অন্য দিক উঁচু। যখন ভেতর তাকাই সমাধিস্থ, তখনও তিনিই আবার বাইরের জগতে নিবিষ্ট, সেখানেও তিনি বিদ্যমান। আরশির সামনে তাকলেও তাঁকে দেখি আবার পেছনেও রয়েছে তাঁরই প্রতিচ্ছবি।' ভক্তরা এই অনুভবের কথা শুনে অবাক। ইনি কি মানুষ! গুরু না গুরুর বেশে স্বয়ং ঈশ্বর।

'টাকার জন্য যেমন ঘাম ঝরাচ্ছ তেমনি হরিনামের জন্য নেচে গেযে ঘাম ঝরাতে হয়।' দক্ষিণেশ্বরের উঠানে ঠাকুরবাড়ির নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণরা মিলিতভাবে কীর্তন করছিল। ঠাকুর বিষ্ণুঘরে যাতায়াতের পথে তাই দেখে তাদের উৎসাহ দিলেন। ফিরে আসবার সময় সঙ্গী ভক্তদের বললেন, 'দেখ এদের অনেকেই বেশ্যাবাড়ি যায় আবার বাসন মাজে। তবু কীর্তন করে ঘাম ঝরাচ্ছে। 'আমি মনে করলাম তোদের সঙ্গে নাচব—' ঘরে এসে বসবার পর যারা কীর্তন করছিল তারা এসে প্রণাম করল। 'তা আর হল না, গিয়ে দেখলাম ফোড়ন-টোড়ন সবই পড়েছে মায় মেথি পর্যন্ত, আমি আর কি দিয়ে সম্বরা দেব!' সবাই হেসে উঠল ঠাকুরের ঠাট্টায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ দিচ্ছেন। প্রথমেই বললেন, 'মনে মনে নমস্কারই ভাল—পায়ে হাত দেবার দরকার কি। মনে মনে নমস্কার করলে কেউই লজ্জা পাবে না। আমার ধর্ম *ঠিক* অন্যের *ঠিক* নয় এ-ভাব খারাপ। বহুলোক ভাবেন, আমাদের মতবাদ খাঁটি, অন্যদেরটা ভুল। আমরাই জয়ী, অন্যরা পরাজিত। যে এগিয়ে সে হয়তো একটুর জন্য আটকে গেল। এগিয়ে গেল পেছনের জন। গোলকধাম

খেলায় যেমন অনেকে এগিয়ে যায়, কিন্তু পোয়া আর নড়ে না।'

'হার জিৎ তাঁর হাতে। তাঁর কাজ বোধের বাইরে। দেখিস না, ডাব কত উঁচুতে রোদে পুড়ছে। তবু তা ঠাণ্ডা। অথচ পানিফল থাকে জলের নিচে কিন্তু তা গরম। মানুষের শরীরের মূল হল মাথা অথচ মাথাটাই উপরে স্থান পেল।'

'আমাদের কি করা উচিত ?' মণিলাল জিজ্ঞেস করলেন।

'যে কোনো ভাবে তাঁর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে রাখা। এর দুটো পথ আছে—কর্মযোগ ও মনোযোগ। যাঁরা আশ্রমবাসী, তাদের যোগ কর্মের দ্বারা। সন্ন্যাসীর কাম্য কর্ম ছেড়ে দেবে কিন্তু নিত্যকর্ম কামনা-শূন্য হয়ে করে যাবে। যে কোনো কাজ যদি কামনা ছাড়া করা যায় তো তাঁর সঙ্গে যোগ হবে। দ্বিতীয় পথ মনোযোগ। এই যোগীদের বাইরে চিহ্ন থাকে না, অন্তরে যোগ। এদের শরীরে চুল দাড়ি যেমন থাকার তেমনি থাকে। পরমহংস অবস্থায় কাজ থাকে না। শুধু স্মরণ ও মনন। কর্ম যেটুকু তা শুধু লোককে শিক্ষা দেবার জন্য। ভক্তিযোগে সব মেলে। ব্যাকুল হয়ে মার কাছে কাঁদলে তিনিই সব দেখিয়ে দেন-জানিয়ে দেন। মা আমায় সব জানিয়ে দিয়েছেন। তোমাদের কর্তব্য তোমরা মন থেকে কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করবে। সংসারীদের উচিত চৈতন্যদেবের কথামতো দিনযাপন—জীবে দয়া, বৈষ্ণবসেবা ও নাম সংকীর্তন।

'যারা লোকশিক্ষা দেবেন তাদের সংসার ত্যাগের প্রয়োজন রয়েছে। যিনি গুরু তিনি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগী হওয়া দরকার—তা না হলে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না। শুধু ভেতরের ত্যাগে কাজ হয় হয় না। বাইরেও ত্যাগ চাই। তবেই লোকশিক্ষা হয়। না হলে লোকে ভাবে উনি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতে বলেছেন বটে কিন্তু নিজে তো ওই নিয়েই আছেন। আমি সমাজের আচার্যকে দেখলাম। শুনলাম দুই না তিন বিয়ে—বয়সী সব ছেলে। এসব আচার্য যদি বলে ঈশ্বর

সত্য আর সব মিথ্যে তা কে বিশ্বাস করবে! এদের শিষ্যরা কি হবে তা বুঝতেই পারছ। হেগোগুরু তার পেদোশিষ্য।'

শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে অমৃতবাণীর মধ্যে সমাজ বিশ্লেষণের সমস্ত কিছু থাকত। তিনি নিম্ন ভাষায় সমাজকে শ্লেষ করতে ছাড়তেন না। লোকদেখানো লোকলজ্জা তাঁর ছিল না। যা কিছু বলতেন সোজা ও সহজ ভাষায়। যে ভাষা সকলে বোঝে, সবাই জানে। তিনি ছিলেন কামজয়ী পরিপূর্ণ সন্ন্যাসী। তা বলে কামরস মেশানো কথা বলতে পিছপা নন। রগড় করবার জন্য খেউরের ভাষাও ব্যবহার করতেন। তার মধ্যে দিয়েই উপমাটুকু তুলে শিক্ষা দিতেন।

একদিন বললেন ভক্তদের, 'সিঁথির মহেন্দ্র কবিরাজ পাঁচটা টাকা আমাকে না জানিয়ে রামলালের কাছে দিয়ে গিয়েছিল। রামলাল পরে যখন আমাকে জানাল, বললাম, টাকাটা কাকে দিয়েছে? সে উত্তর দিলে এখানকার জন্যেই দিয়েছে। প্রথমে ঠিক করলাম দুধের দেনাটা শোধ করব। ওমা! কিছুটা রাত কাটতেই ধড়ফড় করে উঠলাম। বুকে যেন বেড়াল আঁচড় কাটছে। তখনই রামলালকে গিয়ে ফের প্রশ্ন করলাম, তোর খুড়ীকে কি টাকাটা দিয়েছে?' রামলাল জানালে, না। তৎক্ষণাৎ বললাম, এখুনিই টাকাটা ফেরৎ দিয়ে আয়। রামলাল টাকা ফিরিয়ে দিল। সন্ন্যাসীর কাছে টাকা নেওয়া বা লোভে পড়া কি রকম জান? যেমন ব্রাহ্মণের বিধবা অনেক নিরিমিষ খেয়ে ব্রহ্মচর্য পালনের পর বাগ্দী উপপতি করেছিল।' সবাই এ কথা শুনে হতবাক হয়ে গেল।

শ্রীরামকৃষ্ণ অনর্গল বলে যাচ্ছেন। বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। উদ্দেশ্য এক ভক্তদের চোখ খোলা। মহেন্দ্র গুপ্তকে লক্ষ্য করে বলছেন, 'জ্ঞান লাভ করলেও, সবসময় অনুশীলন করতে হয়। ন্যাংটা বলত, ঘটি একদিন মাজলে কি হবে? ফেলে রাখলেই আবার দাগ ধরবে। বিষয় বুদ্ধি না শেষ হলে মানুষ উদার সরল হয় না। পাট করা মাটি

ছাড়া হাঁড়ি তৈরি করা যায় না। তাই কুমোর প্রথমেই মাটি পাট করে। আয়নায় ময়লা থাকলে যেমন মুখ দেখা যায় না তেমনি চিত্তশুদ্ধি না হলে ভগবানকে দেখা যায় না। বেদান্তে আছে শুদ্ধবুদ্ধি না থাকলে ভগবানকে জানতে ইচ্ছে যায় না। শেষ জন্ম বা বহু তপস্যা ছাড়া মানুষ উদার সরল হয় না।

নিজের বালক অবস্থা বোঝাতে বলছেন, 'ঘাসবনে একদিন কি কামড়ালে। লোকের মুখে শুনেছি সাপ যদি আবার কামড়ায় তো বিষ তুলে নেয়। তাই গর্তে হাত দিয়ে বসে রইলাম। একজন জিজ্ঞেস করলে তাই দেখে, ওকি করছেন? সাপ যদি সেই জায়গায় আবার কামড়ায় তবেই হয়। শরতের হিম বলে ভাল তাই কলকাতা থেকে গাড়ি করে আসবার সময় মাথা বার করে হিম লাগালাম।' সবাই হেসে উঠল উচ্চস্বরে।'

এক মাড়োয়ারী ভক্তর সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁকে বলছেন ঠাকুর, 'ত্যাগীর নিয়ম খুব কঠোর। সে কামিনী-কাঞ্চনের লেশমাত্র সংস্রবে থাকবে না। নিজে হাতে টাকা তো নেবেই না, কাছেও রাখতে দেবে না। লক্ষ্মীনারায়ণ মারোয়াড়ী ছিল বেদান্তবাদী, প্রায়ই এখানে আসত। একদিন আমার বিছানা ময়লা দেখে বললে, দশ হাজার টাকা লিখে দিচ্ছি, তার সুদ থেকে তোমার সেবা হবে। ওই কথা শোনা মাত্র কেউ যেন আমাকে লাঠি মারল। অজ্ঞান হয়ে গেলাম। জ্ঞান ফিরে পেয়েই তাকে বললাম, ওরকম কথা যদি আর মুখে বলো তো এখানে আর এস না। টাকা আমার ছোঁবার উপায় নেই, কাছে রাখবারও উপায় নেই। তার বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ। উত্তর দিল, তাহলে এখনো আপনার ত্যাজ্য গ্রাহ্য আছে। তবে আপনার জ্ঞান হয় নি। উত্তর দিলাম, না বাপু আমার অত দূর জ্ঞান হয় নি।' সবাই হেসে উঠল ঠাকুরের কথার হালকা রসে। 'সে তবু নাছোড়বান্দা। তখন হৃদের কাছে দিতে চাইলে। আবার বললাম, তাহলে আমার

বলতে হবে একে দে, ওকে দে—না দিলে রাগ হবে। টাকা কাছে থাকাই খারাপ ও সব হবে না। আয়নার কাছে কিছু রাখলে তার ছায়া পড়বে না ?

'মাড়োয়ারী ভক্ত জানতে চাইলে, দেহত্যাগ গঙ্গায় করলে কি মুক্তি মিলবে ?'

'জ্ঞান হলেই মুক্তি।' ঠাকুর তাকে বললেন, 'তবে অজ্ঞানের পক্ষে প্রশস্ত গঙ্গাতীর।'

একবার একজন শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিল, 'সংসারে মায়া যায় না কেন ?'

সুন্দর উত্তর দিলেন ঠাকুর। উত্তরটি শুধু সুন্দর নয়—যুক্তিগ্রাহ্য। তিনি বললেন, 'দেখ সংস্কারের দোষে মায়া যায় না। বহু জন্ম তাই এই মায়াময় সংসারে থাকলে মায়াকে সত্যরূপে বোঝা যায়। সংস্কারের প্রভূত শক্তি। তাহলে একটা গল্প বলি শোন। একজন রাজপুত্র আগের জন্মে ধোপার ঘরে জন্ম লাভ করেছিল। সে রাজপুত্র হয়ে সঙ্গীদের নিয়ে একদিন খেলছে। নানা রকম খেলার আয়োজন। হঠাৎ সে সঙ্গীদের বলছে, ওসব খেলা থাক—আমি উপুড় হয়ে শুই। আর তোরা সবাই মিলে আমার পিঠে হুসহুস করে কাপড় কাচ। তার ধোপা জীবনের সংস্কার যায় নি।

'সব কাজ ফেলে সন্ধ্যের সময় তোমরা তাঁকে ডাকবে।' ভক্তদের উপদেশ দিচ্ছেন। 'অন্ধকারে ভগবানকে বেশি করে মনে পড়ে। সব এখুনি দৃশ্যমান ছিল। কে এমন করলে ! মুসলমানরা দেখবে সব কাজ ফেলে ঠিক সন্ধ্যের নামাজটি পড়ে।'

মুখুজ্যে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'জপ করা কি ভাল ?'

'হ্যাঁ। জপের মধ্যে দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায়। গোপনে নিভৃতে তাঁর নাম করতে থাকলে তাঁর করুণা লাভ হয়। তারপর তিনি দৃশ্য-মান হন। সবসময় জানবে পুজোর চেয়ে জপ বড়। জপের চেয়ে বড়

ধ্যান। আবার ধ্যানের চেয়েও ভাব বড়—ভাবের চেয়ে বড় মহাভাব। এই মহাভাবের নাম প্রেম।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার হওয়ার বিষয় ভক্তদের বোঝাচ্ছেন. তিনি বলছেন, 'মনুষ্যলীলা কেন হয় তা জান? এর ভেতর দিয়েই তাঁর কথা শুনতে পাওয়া যায়। এর মধ্যে তার বিলাস—এর মধ্যে দিয়ে তিনি রস চেখে থাকেন। আর সব ভক্তদের মধ্যেই তাঁরই সামান্য প্রকাশ। যেমন কোনো জিনিস অনেক চুসলে পরে একটু রস পাওয়া যায়; ফুল অনেকটা চুসলে তবে একটু মধু।'

ভক্তদের সঙ্গে কথা বলছেন ঠাকুর। উত্তর দিকের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এক বিধবা ব্রাহ্মণী। তার একমাত্র মেয়ের খুব বড় ঘরে বিয়ে হয়েছিল। কদিন আগে মেয়েটি মারা গেছে। শোকে পাগল মা বাগবাজার থেকে রোজ দক্ষিণেশ্বরে ছুটে আসছে, যদি শ্রীরামকৃষ্ণ তার শোক কিছুটা কমিয়ে দিতে পারেন। ঠাকুর কথা বলছেন। ভক্তদের তিনি বলতে লাগলেন, 'এখানে একদিন একজন এসেছিল। খানিকক্ষণ বসে বলে কিনা যাই একবার ছেলের চাঁদমুখখানা দেখে আসি। তাই শুনে আমি আর সামলাতে পারলাম না। বলে উঠলাম, তবে রে শালা, ওঠ এখান থেকে! ভগবানের চাঁদমুখের কাছে ছেলের চাঁদমুখ? মাস্টারকে বলতে লাগলেন, 'কথাটা কি জান, ভগবানই সত্য আর সব অনিত্য। এই সংসার যা কিছু দেখছ সবই বাজীকরের ভেলকি। বাজী সব মিথ্যে—বাজীকর সত্য। জলই সত্য, জলের বুদবুদ নয়; এই আছে, এই নেই। যে জলে তার জন্ম সেখানেই লয়। ঈশ্বর তেমনি মহাসমুদ্র—জীবজগৎ বুদবুদ। সুতরাং ঈশ্বরই শেষ কথা। তার ওপর কি ভাবে ভক্তি আসে—কি ভাবে তাঁকে পাওয়া যায় এখন এই চেষ্টাই উচিত। বৃথা শোক করে কি হবে?'

সান্ত্বনার বাণী ও কর্তব্য শুনে শোকাতুরা ব্রাহ্মণী নিজেকে সংহত

করে চলে গেল।

কাপ্তেন এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁর ভক্তির প্রশংসায় লজ্জিত তিনি।

'যে আমি মাগ টাকা পয়সা নিয়ে মেতে আছে সে আমিতেই দোষ।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন তাঁকে। 'আমি তাঁর সেবক। এ আমিতে দোষ নেই। কোনো গুণের বশ নয় ছোটরা। সুতরাং তাদের আমিও ত্রুটিমুক্ত। এ আমি আমির মধ্যে পড়ে না। যেমন মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়। অন্য মিষ্টিতে রোগ হয় কিন্তু মিছরিতে অম্বল কমে।'

কাপ্তেন ভাগবতের কথা বলছেন। ঠাকুর শুনছেন আগ্রহ নিয়ে। শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের কথা হচ্ছে। একজন ভক্ত বললেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণ চরিত্র লিখেছেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ স্বীকার করেন শ্রীমতীকে মানেন না।'

'উনি তাহলে লীলা মানেন না?' অবাক হয়ে কাপ্তেন প্রশ্ন রাখেন।

'আরো বলে—' শ্রীরামকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা করছেন, কামাদি এসব বলে প্রয়োজন।'

'কামাদি দরকার অথচ লীলাকে স্বীকার করেন না?' কাপ্তেন আরো বিস্মিত হলেন।

'খবরের কাগজে যা লেখেনি তা কি করে মানবেন?' হাসতে হাসতে বললেন ঠাকুর, 'একজন তার বন্ধুকে এসে জানান, আরে ভাই ওপাড়া দিয়ে যাচ্ছি এমন সময় হুড়মুড় করে বাড়িটা ভেঙে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু বলল, দাঁড়াও তো একবার, খবরের কাগজটা নিয়ে আসি। খবরের কাগজ দেখা হল। সেখানে বাড়িভাঙার কথা লেখা নেই। তাই দেখে সে বন্ধুকে বললে, কই খবরের কাগজে তো কিছু লেখে নি।

'বন্ধু তবু বোঝাতে চেষ্টা করল। আমি যে নিজের চোখে দেখে এলাম। তা বললে কি হবে? খবরের কাগজে যখন লেখেনি—তখন ওকথা আমি বিশ্বাস করি না। ইংরেজী লেখাপড়ার ভিতর ভগবান মানুষ রূপে লীলা করেন এসব কথা সে কি করে বিশ্বাস করবে। একথা যে ওদের ইংরেজী বইয়ে কোথাও লেখা নেই। তিনি ব্যাপক, তারই ছোট্ট একটা দৃষ্টান্ত অবতার মনুষ্য-রূপ নিয়েছে।'

জয়গোপাল সেন ও ত্রৈলোক্য এসেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিমুখে তাদের অভ্যর্থনা করলেন। তাঁরাও প্রণামান্তে আসন গ্রহণ করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বক্তা, সকলে শ্রোতা। তিনি বলছেন, 'অহঙ্কার থাকলে ভগবানের দেখা মেলে না। ভগবানের ঘরের সামনে রয়েছে অহঙ্কার স্বরূপ গাছের গুঁড়ি। যা না ডিঙোলে তাঁর ঘরে ঢোকা যায় না। একটা গল্প শোন তবে। একবার একজন ভূতসিদ্ধ হয়েছিল। সে সিদ্ধ হয়েই ভূতকে ডাক দিয়েছে। যেমনি ডাকা তেমনি ভূত সশরীরে হাজির। সে সামনে এসেই বলল, হুকুম দিন কি কাজ করতে হবে। তবে মনে রাখবেন যেই কাজ আর দিতে পারবেন না তখন কিন্তু ঘাড় মটকে চলে যাব। লোকটি তার যত রকম কাজ ছিল এক এক করে ভূতকে দিয়ে তা করিয়ে নিল। ভূত চোখের নিমেষে কাজ শেষ করে। লোকটা তো আর কাজ খুঁজে পায় না। তাই দেখে ভূত বলল, এবার তাহলে ঘাড় ভাঙি? লোকটি তাড়াতাড়ি ভূতের কাছে কিছু সময় চাইল। উত্তর দিল, তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি এখুনি আসছি। সে সোজা তার গুরুদেবের কাছে গিয়ে বলল যা যা ঘটেছে। তারপর জিজ্ঞেস করল, ভারী বিপদে পড়েছি, এখন কি করব? গুরুদেব সব শুনে তাকে একগাছা চুল দিয়ে বললেন, ভূতকে বলগে যাও এই চুল সোজা করতে। ফিরে এসে লোকটি ভূতকে চুল সোজা করতে দিন। ভূত দিনরাত চুল সোজা করে। কিন্তু চুল কি আর সোজা হয়—যেমন বাঁকা তেমনিই থাকে। সোজা হয় আবার বেঁকে যায়। অহঙ্কারও

এই চুলের মতো—যায় আর আসে। সোজা থেকে বাঁকা। তাই অহঙ্কার না ছাড়তে পারলে ভগবানকে দেখা যায় না। অছি নাবালক-দেরই জন্য। সাবালক হলে অছির প্রয়োজন হয় না। ছেলেমানুষ বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা করতে পারে না বলেই অন্যে সে ভার নেয়। অহঙ্কার না ছাড়লে ভগবান ভক্তের ভার নেন না।' অহঙ্কারহীন ভক্ত নাবালক প্রায়। আরেকটি গল্প শোন, 'বৈকুণ্ঠে বলে আছেন লক্ষ্মী-নারায়ণ। হঠাৎ নারায়ণ উঠে যেতে গেলেন। লক্ষ্মীদেবী তাঁর পদসেবা করছিলেন। তাই বললেন, ঠাকুর কোথায় যাচ্ছ? নারায়ণ বললেন, আমার এক ভক্তের ভারী বিপদ তাকে বাঁচাতে যাচ্ছি। কথার উত্তর দিয়ে নারায়ণ চলে গেলেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলেন। তাই দেখে অবাক হয়ে লক্ষ্মী বললেন, এত তাড়াতাড়ি ফিরলেন যে? নারায়ণ হেসে জানালেন, আমার এক ভক্ত প্রেমে অন্ধ হয়ে পথ দিয়ে যাচ্ছিল। যাবার পথে সে ধোপাদের শুকোতে দেওয়া কাপড় মাড়িয়ে ফেলছিল। তাই দেখে ধোপারা তাকে মারবার জন্য লাঠি নিয়ে তেড়ে এল। তাই তাঁকে বাঁচাতে যাচ্ছিলাম। তাহলে ফিরে এলেন যে বড়? লক্ষ্মীদেবী প্রশ্ন করলেন। হাসতে হাসতে নারায়ণ বললেন, দেখতে পেলাম সেই ভক্তটি ধোপাদের মারবার জন্য ইঁট তুলে ধরেছে তাই আমার যাওয়ার আর দরকার হল না।' গল্পটি শুনে সবাই হেসে উঠল হো হো করে। গল্পের মধ্যে দিয়ে কি সুন্দর সবল উপদেশ।

কর্মত্যাগের বিষয় আলোচনা হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন, 'জ্ঞান হলে খুব বেশি কাজ করা যায় না।'

প্রতিবাদ করলেন ত্রৈলোক্য। 'তা কেন? পওহারি বাবা তো কত বড় যোগী—কিন্তু তিনি তো কত লোকের ঝগড়া-ঝাটি মিটিয়ে দেন, এমন কি মামলার পর্যন্ত বিচার করে দেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছ—' শ্রীরামকৃষ্ণ ঘাড় নাড়লেন। বিষয়টিকে

আরো তরল করে দিলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রসিকতায়। 'দুর্গাচরণ ডাক্তার তো পাঁড় মাতাল, চব্বিশ ঘণ্টা মদ খেয়ে রয়েছে। কিন্তু কাজের সময় টনটনে জ্ঞান, চিকিৎসায় কোনো ভুল নেই। ভক্তি লাভের পর কাজ করলে তাতে দোষ হয় না। তবে খুব শক্ত কাজ, এর জন্য প্রচুর তপস্যা চাই।

'তাঁর ঐশ্বর্য অনন্ত, তবু তিনি ভক্তাধীন। বড় মানুষের এক দারোয়ান হঠাৎ বাবুর সভায় গিয়ে হাজির। বাবু তাকে দেখেই বুঝলেন ঢাকা কাপড়ের তলায় ওর হাতে কিছু আছে। সঙ্কোচের জন্য ও কিছু বলতে পারছে না। তাই দেখে বাবু বললেন, কি দরোয়ান তোমার হাতে কি ? লজ্জায় দারোয়ান একটা আতা বার করে বাবুর হাতে দিল। তার ইচ্ছা বাবু যেন ওটা খান। দারোয়ানের ভক্তিভাব দেখে বাবু খুব আদর করে আতাটি নিয়ে বললেন, ভারী সুন্দর আতা তো, তুমি এটি কোথা থেকে কষ্ট করে জোগাড় করলে !'

ভক্ত সঙ্গে নানাভাবে ধর্মকথা বলে চলেছেন পরমপুরুষ। তাঁর ক্লান্তি নেই। রসে পুঁজির শেষ নেই। রসের সঙ্গে চিত্রকল্প প্রতীকী। সোজা সরল আলাপচারী গদ্যে তিনি কবিতা রচনা করেছেন। শুকনো কঠিন বিষয়কে রস ঢেলে ঢেলে পরিবেশন করেছেন। 'ভোগের আশা থাকলেই কর্ম থাকবে। ভোগ শেষ তো কর্মেরও নিবৃত্তি। একটি পাখি আনমনা হলে এক জাহাজের মাস্তুলে বসেছিল। জাহাজ নদীমধ্য থেকে ক্রমশ সাগরে পড়ল। চটকা ভাঙতেই পাখি দেখল চারিদিকে কূল-কিনারাহীন জল। সে তখন ডাঙায় ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উত্তর দিকে উড়ে চলল। ক্লান্ত হয়ে বহুদূর গিয়েও ডাঙা না পেয়ে আবার মাস্তুলে এসে বসল। আবার খানিক বাদে সে পুব দিকে উড়ে গেল—সেদিকেও কিছু না পেয়ে আবার ফিরে এল। এ ভাবে দক্ষিণ পশ্চিম চারদিকেই

কূল না পেয়ে সেই যে মাস্তুলে আশ্রয় নিল আর উড়ল না। নিশ্চিন্ত হয়ে সে নিশ্চেষ্ট হল। কোনো ব্যস্ততা বা অশান্তি রইল না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ কলকাতা গিয়েছেন। বলরামবাবুর বাড়ি। সেখান থেকে নন্দবাবুর বাড়ি। এখানে তিনি এর আগে আসেন নি। নন্দ বসুর বাড়িতে ঈশ্বরের বিভিন্ন ছবি ছিল। ঠাকুর তাই দেখছেন ভীষণ খুশি হয়ে। নন্দ বসুর মধ্যে হিঁদুয়ানা দেখে ভগবান প্রীতি লক্ষ্য করে তাঁকে উৎসাহিত করছেন নানা কথায়। বহু মানুষ দেখতে এসেছেন ঠাকুরকে। ঠাকুর মিষ্টিমুখ করলেন। সকলের জন্য রেকাবি করে পান আনা হয়েছিল। খাবার পর ঠাকুরের সামনে পান দেওয়া হল। তিনি রেকাবির পান নিলেন না। ঘটনাটা নন্দ বসুর চোখ এড়ায় নি। তিনি তাড়াতাড়ি এসে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন, 'একটা কথা বলব ?'

হাসিমুখে ঠাকুর জানতে চাইলেন, 'কি ?'

নন্দ বসু বললেন, 'পান নিলেন না কেন ? সমস্ত ত্রুটিহীন হলেও এটা কিন্তু দোষের।'

'আমি ইষ্টকে দিয়ে খাই—ও আমার একটা স্বভাব—তাই ও পান নিই নি।' শ্রীরামকৃষ্ণ জবাব দিলেন।

'পান তো ইষ্টব ভেতরেই পড়ত।' নন্দ বসু বলে উঠলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ এবার বিশদ করে জবাব দিলেন, 'দেখুন একটা হচ্ছে জ্ঞান পথ আরেকটা হল ভক্তি পথ। জ্ঞানী সব কিছুই ব্রহ্মজ্ঞান করে গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু যারা ভক্তি পথ ধরে হাঁটে তাদের মধ্যে একটু ভেদবুদ্ধি থেকে যায়।'

'যাই বলুন ওটা আপনার অন্যায় হয়েছে।' নন্দ বসু ছাড়বেন না।

ভক্ত মনোরঞ্জক শ্রীরামকৃষ্ণ মুখে হাসি বিস্তৃত করলেন, 'দেখুন ওটা আমার একটা নিজস্ব ভাব রয়েছে, আর আপনি যা বলছেন, তাও ঠিক ধরে নিন, সঙ্গে ওই ভাবটা যে রয়েছে।' শ্রীরামকৃষ্ণ বিদায় কালে

বললেন, 'গীতায় বলছে, যাকে বহুজন মান্য করে তার ভেতর ভগবানের বিশেষ শক্তি আছে। আপনার মধ্যেও সেই ক্ষমতা রয়েছে।'

'সব মানুষের শক্তিই সমান।' নন্দ বসু উত্তর দিলেন।

ঠাকুর এবার একটু বিরক্ত হলেন। বললেন, 'তোমাদের ওই এক ধারণা। সবার ক্ষমতা কি কখনোও সমান হয়? বিভুরূপে সব জায়গায় তিনি এক হয়ে রয়েছেন তবু ওই শক্তি বিশেষে। বিদ্যাসাগরও এই কথাই বলেছিল। তিনি কি ব্যক্তি ভেদে কম বেশি শক্তি দিয়েছেন? তখন উত্তরে বলেছিলাম, যদি তাই না হয় তাহলে তোমাকে আমরা কেন দেখতে এসেছি? তোমার মাথায় কি দুটো শিং বেরিয়েছে?' তিনি বিদায় নিলেন সশিষ্য।

ফিরবার পথে বাগবাজারের ব্রাহ্মণী ও গনুর মার বাড়িতে বহুক্ষণ কাটিয়ে পুনরায় ঠাকুর বলরামবাবুর বাড়িতে এলেন। ওখানেই রাত্রি-বাস হবে। রাত প্রায় এগারোটায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব শয্যায় বিশ্রামের জন্য শয়ন করলেন। প্রায় ভক্তই চলে গেলে মণি ঠাকুরের পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। পরমপুরুষ তাঁর সঙ্গে আলাপ করছেন। হঠাৎ তিনি বললেন, 'আচ্ছা এই সব দেখে তোমার আমাকে কি মনে হয়?'

'আমার ধারণা—' মণি বললেন, 'আপনারা তিনজনেই একই জিনিস, একই রূপ। যীশুখ্রীস্ট, শ্রীচৈতন্য আর এই আপনি।'

পরমপুরুষ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'এক এবং এক বই কি! তাঁকে দেখছ না—যেন এর ওপর এমন করে রয়েছেন।' কথা শেষ করে আঙুল দিয়ে নিজের শরীর দেখাচ্ছেন। যেন বোঝাতে চাইছেন ভগবান তার দেহ অবলম্বন করেই শরীরীরূপ ধারণ করেছেন। পরম-পুরুষ খানিক চুপ করে আবার বললেন, 'এই যে গলায় এইটে হয়েছে না ওরও হয়তো কোনো অর্থ আছে। যদি সব লোকের কাছে হালকামী করি—না হলে যেখানে সেখানে নাচা গাওয়া তো হয়েই যেত

'যাই বলুন, লীলার মধ্যে নরলীলা—আমার বেশ ভাল লাগে।' মণি বললেন।

'তবেই তো হল—' পরমপুরুষ নির্লিপ্ত উত্তর দিলেন, 'আব আমাকে তো দেখতেই পাচ্ছ।'

মহেন্দ্রনাথের সঙ্গে ডাক্তারের বিষয়ে আলাপ করছেন তিনি। মহেন্দ্রনাথ তাঁর অবস্থার কথা বলবার জন্য ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জানতে চাইলেন ডাক্তার কি কি বলেছেন। মহেন্দ্রনাথ নানা বিষয়ে যা যা কথা হয়েছে সব তাঁকে বললেন। তিনি বললেন, 'আপনার কাছে যারা শরণাগত তারা কামজয়ী একথা ওঁকে আমি বললাম। উত্তরে ডাক্তার বললেন, আমারও কাম-টাম চলে গেছে। গিরিশ ঘোষের কথা আলোচনা হল। ডাক্তার জানতে চাইলেন গিরিশ মদ ছেড়েছেন কিনা?'

আনন্দের সঙ্গে ঠাকুব বলে উঠলেন, 'কালীপদর কাছে শুনলাম, সে সব কিছু ছেড়েছে।'

দুপুরের খাবার পর নিজের ঘরে ভক্তসহ ঠাকুর বসে আছেন। কাছে হাজরা আছেন। তিনি বহুদিন তার সঙ্গে রয়েছেন। যদিও জ্ঞানী বলে তাঁর মধ্যে অহঙ্কার রয়েছে প্রচ্ছন্নে। সুযোগ পেলে শ্রীরামকৃষ্ণর নিন্দে করেন। অন্যের তো কথাই নেই। ঠাকুর শুনেও শোনেন না, দেখেও দেখেন না। এদিন হঠাৎ বড়কালা সুযোগ পেয়ে হাজরাকে চেপে ধরলেন। বললেন, 'তুমি যে কষ্টিপাথর হয়ে কে ভাল সোনা কে মন্দ সোনা যাচাই করছ কি জন্য? পরের অত নিন্দে করো কেন?'

'যা বলি তা তো ওঁর কাছেই শুনি।' 'হাজরা ঠাকুরকে উদ্দেশ্য করে বললেন।

'এ কথা ঠিক।' শ্রীরামকৃষ্ণ সায় দিলেন।

কে একজন তত্ত্বজ্ঞান কি জানতে চাইলে হাজরা তা বোঝাচ্ছেন। হাজরা বললেন, 'চব্বিশ তত্ত্ব—যেমন পঞ্চভূত, ছয় রিপু, পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটা কর্মেন্দ্রিয় এই সব।'

হেসে উঠলেন মহেন্দ্রনাথ। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণকে ডেকে বললেন, 'উনি বলছেন চব্বিশ তত্ত্বের ভিতরে নাকি ছয় রিপু।'

হেসে ফেললেন শ্রীরামকৃষ্ণ। উত্তর দিলেন, কাণ্ডটা দেখ না, তত্ত্বজ্ঞানের নামে কি বলছে তোমরা দেখ। তত্ত্বজ্ঞান মানে আত্ম-জ্ঞান।' তিনি নিজেই বুঝিয়ে দিচ্ছেন। 'তত্ত্ব মানে পরমাত্মা, ত্বং মানে জীবাত্মা। এই দুইকে এক জ্ঞান হলে তত্ত্বজ্ঞান হয়।'

হাজরা বিপদ বুঝে একটু বাদেই ঘর থেকে বারান্দায় চলে গেলেন। তাই দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ও খালি তর্ক করে। এই বেশ বুঝে গেল—একটু বাদেই দেখবে যেই কে সেই।' একটু থামলেন তিনি। তারপর বলতে লাগলেন, 'কি জান, বড় মাছ জোর করছে দেখে আমি সুতো ছাড়ি। তা যদি না করি তো মাছ সুতো ছিঁড়বে—এমন কি যে ছিপ নিয়ে বসে আছে সেও জলে পড়বে। আমি তাই ওকে আর কিছু বলি না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ হাজরার কথা বলে যাচ্ছেন। বহু চেষ্টা করেও তাকে মানাতে পারছেন না। তাই বলছেন, 'অহঙ্কার দূর করা খুব কঠিন। এ যেন অশ্বত্থ গাছ—এই কেটে দিলে পরদিনই দেখবে আবার ফ্যাকরা গজিয়েছে। নির্মূল না করা পর্যন্ত শেষ নেই। ওকে অনেক বুঝিয়েছি। কতবার লোকের নিন্দে করতে বারণ করেছি, তবু শোনে না। বলেছি, ছ্যাখ না কুমারী পূজা। একটা মেয়েকে পুজো করা—যে কি না হাগে মোতে, নাক দিয়ে যার কফ পড়ে। তবু ভগবতীর ওই এক রূপ। নারায়ণই সব রূপ ধরে রয়েছেন। খারাপ লোকেরও পুজো করা যায়। ভক্তের ভিতরই ভগবান রয়েছেন। ঈশ্বরের বৈঠকখানা ভক্ত হৃদয়। লাউয়ের ডোল ভাল

হলে তবেই তানপুরা ভাল হয়। ভাল বাজে।' হঠাৎ হাজরার শ্লোক পড়ার কথা মনে পড়তেই ঠাকুর বলে উঠলেন, 'হ্যাঁরে রামলাল হাজরা কি করে শ্লোকটা বলছিল, অন্তম্ বহিস্ যদি হরিস—সব 'স' কার দিয়ে , যেমন একজন বলেছিল, মাতরং ভাতরং খাতরং—মানে মা ভাত খাচ্ছে—'

রামলাল শ্লোকটা বললেন, 'অন্তর্বহির্যদিরিস্তপস্যা ততঃ কিম—'

সকলে হো হো করে হেসে উঠল ঠাকুরের কথায়।

মণির সঙ্গে বেড়াচ্ছেন আর গল্প কবছেন। কে বলবে সাধু। দিব্যি সংসারী মানুষের মতো কথা বলছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ এক সময় আক্ষেপ করার মতো বলে উঠলেন, 'লোকেরা শ্বশুরবাড়ি যায়—জান আমারও কত সাধ ছিল। খুব ভেবেছিলাম বিয়ে করব—শ্বশুরবাড়ি যাব সাধ-আহ্লাদ করে নেব কিন্তু কোথা দিযে কি যে হযে গেল।'

'তা ঠিক।' মণি বললেন, 'দেখুন ছেলে যদি বাপের হাত ধরে তো পড়েও যায় কিন্তু বাপ যে ছেলের হাত ধরেছেন সে আর পড়ে না। এ আপনার কথা। তা আপনার অবস্থাও তো তাই। মা যে আপনাকে ধরে আছেন।'

'বিশ্বাসদের বাড়িতে উলোর বামনদাসের সঙ্গে দেখা হতে বললাম, তোমাকে দেখতে এসেছি।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে লাগলেন, 'যখন চলে আসছি শুনতে পেলাম, বামনদাস বলছে, বাবা বাঘ যে রকম মানুষকে ধরে ভগবতী সেভাবেই একে ধরে আছেন। তখন যৌবন—স্বাস্থ্য ভাল, সব সময়েই ভাবের মধ্যে থাকতাম। অন্য কথায় চলে গেলেন তিনি। 'মেয়েদের আমি খুব ভয় পাই। মনে হয় এই বুঝি বাঘিনী খেতে এল। মেয়েদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ছিদ্র সব খুব বড় দেখি। মনে হয় সব কিছু যেন রাক্ষসী! এই ভয়টা আগে প্রবল ছিল, এখন মনকে অনেক বুঝিয়ে মেয়েদের মা আনন্দময়ীর এক একটা রূপ মনে করি। মেয়েরা ভগবতীর অংশ। তবু সাধু বা ভক্তের কাছে তারা পরিত্যাজ্য। যে

মন ঈশ্বরের জন্য, মেয়েমানুষ এসেই তার বারো আনা দখল করে নেয়। বাকীটুকুও খরচ হয়ে যায় ছেলেপুলে হলে। মেয়েদের আগলাতে আবার অনেকের প্রাণ বেরিয়ে যায়। পাঁড়ে জমাদার, বুড়োমানুষ—তার বৌউর বয়েস চোদ্দ—বুড়োর সঙ্গেই থাকে গোলপাতার ঘরে। গোলপাতা খুলে খুলে মানুষ দেখে। তারপর বেরিয়ে যায় একদিন—মেয়েদের সঙ্গে থাকলেই তাদের বশ হতে হয়। সবাই যে যার নিজের স্ত্রীর প্রশংসা করে। সাধনকালে কামিনী দাবানলের মতোন। কাল-সাপ যেমন। সিদ্ধ হয়ে গেলে, ঈশ্বরের দেখা পেলে ওরাই আবার মা আনন্দময়ী।'

শ্রীরামকৃষ্ণর অসুস্থ অবস্থা চলছে। নিয়মিত ডাক্তার দেখছেন। ভক্তরা ঘিরে সেবা করছে। তাঁর কিন্তু আচরণে কোনো পরিবর্তন নেই। সেই অমৃতবাণী পরিবেশন। অমৃতকথন আর লোকশিক্ষা। হাসি ঠাট্টা রহস্য উপমা কোনো কিছুরই বিরাম নেই। বিকেলে ডাক্তার এসেছেন। কথা বলছেন ঠাকুর। তিনি বললেন, 'তোমার ছেলে বলে অবতার মানে না। তা নাই মানল। তোমার ছেলেটি কিন্তু ভাল। বোম্বাই আমের গাছে কি টোকো আম হয়?'

শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। ডাক্তারও নানা আলোচনা করছেন। ঠাকুর শুনছেন। গিরিশ ঘোষ বলছেন, 'উনি অবতার আমি তা প্রমাণ করব।'

শুনে ঠাকুর বলে উঠলেন, 'এসব কথা কিছুই নয়। বিকারের রোগীর খেয়াল যেনন। ঘি যতক্ষণ কাঁচা থাকে ততক্ষণই কলকল করে, পাকা হলে শব্দ থাকে না আর। যার যেমন মন সে ভগবানকে সেই ভাবে দেখে। পূর্ণ জ্ঞান হলে বিচার উঠে যায়।'

ডাক্তার বলছেন, 'সবই যখন জ্ঞান বোঝ, তবে কেন বলছ রোগ সারিয়ে দাও? এটা—কি এর মানে বলতে হবে।' 'মানে খুবই সোজা।' পরমপুরুষ হাসিমুখে বললেন, 'যতক্ষণ আমি ঘট রয়েছে ততক্ষণ এরকম

হবে। ধরে নাও মহাসমুদ্র—ওপর নীচ পরিপূর্ণ। তার মধ্যে একটা ঘট, ঘটের ভেতর বাইরে জল—অথচ যতক্ষণ ঘট না ভাঙছ ততক্ষণ দুজনে মিলে যাবে না। সেই ভগবানই এই আমি ঘট রেখে দিয়েছেন।'

'তাহলে এই 'আমি' কি? তিনি কি আমাদের সঙ্গে চালাকি করছেন?' ডাক্তার বলে উঠলেন।

'চালাকি যে নয় তাই বা বুঝছেন কি করে?' গিরিশ ডাক্তারের কথার জবাব দিলেন।

'এই আমিকে তিনিই রেখেছেন।' শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যে ভক্তের সন্দেহ নিরসন করছেন। 'এই তাঁর খেলা। এই তাঁর লীলা। তাঁর দর্শন হলে সন্দেহ দূর হবে। আত্মার দেখা পেলে এসব মানতেই হবে।'

'সব সন্দেহ যাচ্ছে কোথায়?'

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'এ পর্যন্ত আমি জানি, বলতে পারি, এরপর জানতে হলে তাঁর কাছে একা গিয়ে বলো। জিজ্ঞেস করো, তিনি কি জন্য এ রকম করেছেন। একটি বাচ্চা ছেলে বাড়িতে ভিক্ষুক এলে তাকে এক কুনকে চাল দিতে পারে কিন্তু রেলভাড়া দিতে হলে কর্তা ছাড়া উপায় নেই।' ডাক্তার চুপ করে রইলেন। ঠাকুর তাঁকে বোঝা-নোর জন্য আবার কথা শুরু করলেন। 'দেখ তাঁর দিকে যত এগোবে তত তাঁর ঐশ্বর্য কমে যাবে। প্রথমে ভক্ত দেখল দশভুজা। কিছুটা এগিয়ে সে দেখল ষড়ভুজা। আরও খানিক যাওয়ার পর দ্বিভুজ। গোপালে পরিণত হয়েছেন তিনি। তারও পরে শুধুমাত্র জ্যোতি অবলোকন, তখন কোনো উপাধিই আর অবশিষ্ট নেই। বেদান্তের বিচারের একটা গল্প বলি শোন। এক রাজাকে একজন যাদুর খেলা দেখাতে এসেছিল। একটু সরে যাওয়ার পর রাজা দেখতে পেল, ঘোড়ায় চড়ে খুব সেজেগুজে একজন সওয়ার আসছে। হাতে নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র। রাজা আর সভার সবাই তখন ভাবতে বসল এর মধ্যে কোনটা সত্য! শেষ পর্যন্ত তাঁরা সেই সওয়ারকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে

দেখল সত্যরূপে। বাকি সবটাই ভোজবাজি। যেমনি ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যে—বিচার করতে গেলে কিছুই আর ধোপে টেঁকে না।'

ডাক্তার শুনে বললেন, 'এ বেশ কথা। ভাল লাগল।'

'তাহলে একটা ধন্যবাদ দাও।' ঠাকুর হেসে বললেন।

'তুমি আমার মনের ভাব কি বোঝ না। কত কষ্ট করে তোমাকে দেখতে এসেছি।'

হেসে উঠলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। ভুবন ভোলানো হাসি। হেসেই বললেন, 'না গো তুমি মূর্খের জন্য কিছু বলো। বিভীষণ লঙ্কার রাজা হতে চান নি। বলেছিলেন, তোমাকে যখন পেয়েছি—রাম, তখন আবার কিসের রাজা? রাম উত্তর দিয়েছিলেন, তুমি মূর্খদের জন্য রাজা হও। যারা বলছে রামের যে এত সেবা করলে তা তোমার কি হল? তাদের শিক্ষা দেবার জন্য রাজা হও।'

'তোমার এখানে তেমন মূর্খ কোথায়?' ডাক্তার বলে উঠলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে বলে উঠলেন, 'না গো আছে আছে। শাঁখও আছে আবার গেড়ি-গুগলিও রয়েছে।' এবার একসঙ্গে সবাই হেসে উঠল।

রসিকজনের পরিমণ্ডলে রসিকই আসে। ডাক্তারও কম নন। তিনি দুটি গ্লোবিউল ওষুধ ঠাকুরকে দিয়ে বললেন, 'এই দুটি গুলি দিলাম, পুরুষ আর প্রকৃতি।' তাঁর কথাতেও সবাই হেসে উঠল।

হাসিমুখেই জবাব দিলে রসিক চূড়ামণি পরমপুরুষ, 'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ—ওঁরা একসঙ্গেই থাকেন। পায়রাদের দেখনি—দূরে থাকতে পারে না, একই জায়গায় পুরুষ আর প্রকৃতি বকবকম করছে।'

মিষ্টিমুখ করে ডাক্তার বিদায় নিলেন। তবু ভক্তদের মধ্যে তাঁর আলোচনা চলতে লাগল। তাই শুনে তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, 'ডাক্তারকে আর বেশি কিছু বলতে হবে না। গাছ কাটা হয়ে গেলে যে গাছটা কাটছিল সে একটু দূরে সরে দাঁড়ায়। একটু বাদে কাটা

গাছ আপনিই পড়ে যায়।' বৈঠকখানা ঘরে কজন ভক্তর কেউ কেউ গান করছিলেন। তাঁরা শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরে ফিরে এলেন। তাদের দেখে ঠাকুর বলে উঠলেন, তোমরা গান গাইছিলে তা তাল হয় না কেন ? কে একজন বেতালসিদ্ধ ছিল, একি তাহলে তাই।' সবাই এ কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল।

ছোট নরেনের কাছে তাঁর এক আত্মীয় এসেছে। তুজনে কথা বলছে। আগন্তুকের সাজগোজ খুব, চোখে চশমা। ঠাকুর ছোট নরেনকে ডেকে বললেন, 'দেখ রাস্তা দিয়ে একজন ছোকরা যাচ্ছিল। প্লেটওলা জামা পরা। চলবার কি কায়দা। প্লেটটা সামনে রেখে সেখানের চাদর খুলে দেয়—আবার চারদিন তাকিয়ে দেখে কেউ তাকে দেখছে কিনা। চলবার সময় কোমর বেঁকায়।' সকলে হেসে ফেলে তার বলার কায়দায়। 'তোরা একবার দেখিস না। ময়ূর পাখা দেখায় ঠিকই—কিন্তু তার পাগুলো নোংরা। উট দেখতে খারাপ তা তার সব খারাপ।' সবাই আবার হাসতে থাকে।

নরেনের আত্মীয়টি বলে, 'কিন্তু উটের স্বভাব ভাল।'

'তা ভাল—' ঠাকুর জবাব দিলেন, 'তবে কাঁটা ঘাস খায়, মুখ দিয়ে রক্ত পরে তবু খায় ! সংসারী আর কি ! এই ছেলে মরে আবার ছেলে ছেলে করে।'

আবার ডাক্তার দেখতে এসেছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে। দোতলার ঘরে বসে রয়েছেন পরমপুরুষ। রসসিদ্ধ গুরু পরিবৃত হয়ে আছেন ভক্ত নিয়ে। ডাক্তার সরকার ছাড়া প্রতাপ আছেন। ওদের সঙ্গে আলাপ করছেন তিনি। শ্রীরামকৃষ্ণর কাশি হয়েছে। তিনি কাশছেন। তাই দেখে ডাক্তার বলছেন, 'আবার কাশি হয়েছে, তা কাশীতে যাওয়া মন্দ কি !'

হেসে উঠলেন পরমপুরুষ। 'তাতে তো মুক্তি—সে তো ভালই

হত—কিন্তু আমি যে মুক্তি চাই না ভক্তি চাই।'

শুনে ডাক্তার ও অন্য ভক্তরা হেসে উঠলেন।

অসুস্থতার মধ্যেও ঈশ্বর ছাড়া তাঁর অন্য কথা নেই। ভক্তরা সেই আলোচনা করছেন। প্রতাপ বলে উঠলেন, 'কালকেই ভাবাবস্থায় দেখে গেলাম।'

'ও কিছু নয়; সামান্যক্ষণ—' ঠাকুর বলে উঠলেন, 'আপনা আপনি অমন হয়েছিল।' হঠাৎ ডাক্তারের দিকে ফিরে বললেন, 'কালকে ভাবের মধ্যে তোমাকে দেখলাম। দেখতে পেলাম পরিপূর্ণ জ্ঞান কিন্তু শুকনো খটখটে মগজ—আনন্দরস নেই এক ফোঁটা।' এবার প্রতাপকে উদ্দেশ্য করে বলতে লাগলেন, 'এ যদি একবার আনন্দ পায় তো ওপর নীচ সব পরিপূর্ণ দেখবে। আর আমার কথাই ঠিক অন্যেদেরটা নয় এ সব কথা তাহলে বলবেন না; সঙ্গে সঙ্গে হ্যাক ম্যাক লাঠিমারা কথাগুলো আর ওঁর মুখ দিয়ে বেরোয় না।' হঠাৎ তিনি ভাবের মধ্যে চলে গেলেন। আত্মস্থ হয়ে ডাক্তারকে বলে উঠলেন, 'মহেন্দ্র বস্থ কি কেবল টাকা টাকা, মাগ মাগ, মান মান এসব করছ। এবার সব ছেড়ে এক মনে ভগবানকে ডাক—একবার ওই আনন্দে মজে যাও।' অনর্গল কথা বলছেন তিনি। কে বললে অসুস্থ। বলছেন, 'জ্ঞানীর ধ্যান কি রকম জান? অনন্ত সীমাহীন আকাশ। পাখি স্বাধীনভাবে তাতে পাখা মেলে উড়ছে। চিদাকাশে আত্মা হল পাখি। সেও উড়ছে মুক্তির খুশিতে। এই আনন্দের শেষ নেই।'

একটু বাদে ঠাকুর ডাক্তারকে বললেন, 'তোমার একটা কথা কিন্তু খুব সুন্দর। ভাবাবস্থা যে মনের যোগ হয় এই কথাটা কিন্তু আগে আর কেউ বলে নি। শিবনাথ বলেছিল, বেশি ঈশ্বরের কথা ভাবলে নাকি বেহেড হয়ে যায়। তার কথায় জগৎ চৈতন্যকে চিন্তা করে নিজে অচৈতন্য হয়ে যাওয়া। যিনি সমস্ত বোধস্বরূপ, যার অনুভবে সমস্ত জগতের অনুভব তাকে চিন্তা করে অবোধ হয়ে যাওয়া। বরং

তোমার বিজ্ঞানের এটা মিললে ওটা হয়, ওটা মিললে এটা, এতেই বোধের শূন্যতা দেখা দিতে পারে, কেবল জড়গুলোকে ঘেঁটে। তাকে চিন্তা করলে বোধহীন, যার বোধে জড় পর্যন্ত প্রাণ পেয়েছে হাত-পা নাড়ছে। বলে দেহ নড়ছে, তিনি যে নড়ছেন তা বোঝে না। বলে জলে হাত-পা পুড়ে গেল। জলে কিছু পোড়ে না—তার ভেতর যে উত্তাপ, যে আগুন তাতেই পোড়ে। হাঁড়ির ভাত ফুটছে—আলু বেগুন তাতে লাফাচ্ছে। ছোট ছেলে ভাবে আলু বেগুনরা নাচছে নিজে নিজে। তারা বোঝে না তলায় আগুন রয়েছে। মানুষ ভাবে তার ইন্দ্রিয় নিজে থেকেই কাজ করছে—একবারও ভেবে দেখে না ভেতরে চৈতন্যস্বরূপ রয়েছে বলে এমন হচ্ছে।'

ডাক্তার যাবার আগে বললেন, 'তা তাকে একবার বলো, তার কোলে রয়েছ, হাগছ আর অসুখ হলে বলবে না—একবার খুলে বলো।'

'কি বলব আর।' শিশুর মতো প্রশ্ন।

'রোগের কথা বলবে।'

'এক একবার ভাবি বলি—' ঠাকুর বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ, কিন্তু তা হয় না।'

'আচ্ছা বলতেই বা হবে কেন—' ডাক্তার বলে উঠলেন, 'তিনি নিজে কি জানেন না?'

শ্রীরামকৃষ্ণ এবার হেসে উঠলেন। বললেন, 'তাহলে শোন—এক মুসলমান নামাজ পড়ছিল। সে মাঝে মাঝে হায় আল্লা হায় আল্লা বলে চেঁচাচ্ছিল। তাই শুনে একজন তাকে বলল, আল্লাকে ডাকছ তা অত চেঁচাও কেন, তিনি যে পিঁপড়ের পায়ের নূপুর শুনতে পান। তাঁতে যখন মনের যোগ হয় তখন ভগবানকে খুব কাছ থেকে দেখা যায়। তবে কথা কি জান, যত এই যোগ হবে তত মন বাইরের বস্তু থেকে সরে যাবে। একটা কাহিনী শোনাই তাহলে। ভক্তমালে আছে, এক ভক্ত বেশ্যাবাড়ি যেত। একদিন যেতে অনেক রাত হয়ে

গেছে। বাড়িতে বাপ-মার শ্রাদ্ধ ছিল তাই এত দেরী। বেশ্যাকে দেবার জন্য হাতে করে শ্রাদ্ধের খাবার নিয়ে যাচ্ছে। তার মন বেশ্যার প্রতি এত আকৃষ্ট যে কোনখান দিয়ে কি মাড়িয়ে যাচ্ছে সেদিকে হুঁশ নেই। পথে এক সাধু চোখ বুজে ভগবানের চিন্তা করছিল, তাঁর গায়ে পা লেগে গেল। সাধু তো ভীষণ রেগে বলে উঠল, কি রে তুই দেখতে পাচ্ছিস না আমি ভগবানের ধ্যান করছি আর তুই আমার গায়ের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছিস? এই কথা শুনে লোকটি বলে উঠল আমাকে ক্ষমা করবেন—কিন্তু একটা প্রশ্ন করি আপনাকে। আমি বেশ্যাবাড়ি যাচ্ছি, তার চিন্তায় বেহুঁশ হয়ে আপনার গায়ে পা দিয়ে ফেলেছি আর আপনি ভগবানকে ভাবছেন আপনার সব জ্ঞান টনটনে হয়ে আছে, তা এ কি রকম ধ্যান? শেষ পর্যন্ত সেই ভক্ত সংসার ত্যাগ করেছিল ঈশ্বর আরাধনার জন্য। বেশ্যাকে বলেছিল, তুমিই আমার গুরু—তুমিই শিখিয়েছ ভগবানের প্রতি কেমন অনুরাগ করতে হয়—বেশ্যাকে সে মা বলে সংসার ত্যাগ করেছিল।'

গল্পটি শেষ করে ঠাকুর বললেন, 'তবে আর একটি গল্প শোনাই। এক রাজা একজন পণ্ডিতের কাছে রোজ ভাগবত শুনত। পাঠ শেষ করে প্রতিদিন পণ্ডিত রাজাকে বলত, রাজা বুঝেছ? রাজা তার কথার উত্তরে জবাব দিত, তুমি আগে বোঝ। বাড়ি গিয়ে পণ্ডিত ভাবত রোজ রাজা এমন কথা বলে কেন? এত করে বোঝাই উল্টে সে আমায় বলে, তুমি আগে বোঝ। একি ব্যাপার? পণ্ডিত নিজে সাধন ভজনও করত। কিছুদিন বাদে তার হঠাৎ হুঁশ হল ভগবানই পরম বস্তু—আর সব অসার। জগৎ মিথ্যা বোধ হওয়ায় সে তার সংসার ত্যাগ করল। যাবার আগে কেবল একজনকে বলে গেল, সে যেন রাজাকে বলে, যে এখন বুঝেছি।'

নরেন্দ্র তাঁর এক লেখক বন্ধু নিয়ে এসেছেন। ঠাকুরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, 'ইনি রাধাকৃষ্ণের বিষয়ে লিখেছেন।'

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে তাকে বললেন, 'তা কি লিখেছ শোনাও দেখি।'

'রাধাকৃষ্ণই পরব্রহ্ম, ওঁকারের বিন্দু স্বরূপ।' লেখক বলতে লাগলেন।

'বেশ কথা।' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'নিত্যরাধা দেখেছিলেন নন্দঘোষ। বৃন্দাবনে লীলা করেছিলেন প্রেমরাধা, আর কামরাধা চন্দ্রাবলী। কামরাধা প্রেমরাধা—আরও এগোলে নিত্যরাধা। যেমন পেঁয়াজ ছাড়ালে প্রথমে লাল খোসা, তারপর অল্প লাল, তারপর সাদা, তার আর পরে খোসাই থাকে না। ওই হল নিত্যরাধার স্বরূপ—যেখানে নেতি নেতি করে বিচার স্তব্ধ। নিত্য রাধাকৃষ্ণ আর লীলা রাধাকৃষ্ণ। যে রকম সূর্য আর তার রশ্মি। নিত্য সূর্যের স্বরূপ আর রশ্মি লীলার স্বরূপ।'

লেখক বললেন, 'রাধাকৃষ্ণই পরব্রহ্ম।'

'বেশ কথা।' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'তাতে কি সব হয়? সেই তিনিই নিরাকার সাকার। তিনিই স্বরাট বিরাট। তিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি। তার ইতি নেই অন্ত নেই। তাতে সব সম্ভবে। চিল শকুন আকাশের যত উপরে উঠুক না কেন আকাশ গায়ে ঠেকে না। ব্রহ্মের উপমা ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছুই নেই। যদি কেউ প্রশ্ন করে কেমন ঘি—তার উত্তরে বলতে হয় যেমন ঘি।'

কালী পুজোর রাত। শ্যামপুকুরের বাড়ির দোতলায় বসে ঠাকুর। জগন্মাতার পুজোর জন্য সমস্ত আয়োজন করছেন ভক্তগণ। ঠাকুরকে কেন্দ্র করে ভক্তরা চারপাশে। ঠাকুর ধুনো আনতে বললেন। এবার জগন্মাতাকে সমস্ত নিবেদন করলেন ঠাকুর। তারপর সবাইকে ধ্যান করতে বললেন। সবাই কিছুক্ষণ ধ্যানে ডুবে রইল। ধ্যান ভেঙে গিরিশ ঠাকুরের পায়ে মালা দিলেন। মহেন্দ্রনাথ দিলেন গন্ধপুষ্প। তারপর দেখাদেখি সবাই ফুল দিতে লাগলের। সব ভক্ত একসঙ্গে

জয় মা বলে আনন্দ ধ্বনি করে উঠলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ডুবে গেলেন সমাধিতে! বিস্ময়ের সঙ্গে সবাই এক অদ্ভুত পরিবর্তন দেখতে পেলেন। ঠাকুরের মুখে অপূর্ব জ্যোতি—দু হাতে বরাভয়। তাঁর বাহ্যজ্ঞান নেই। তিনি উত্তরদিকে মুখ করে বসে। জগন্মাতা যেন নিভৃতে তাঁর ভেতরে এসে উপস্থিত। ভক্তরা অভিভূত হয়ে স্তব শুরু করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ জ্ঞান ফিরে পেলেন। এবং আবার সহজ হয়ে সকলের সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন।

কাশীপুরের বাগানবাড়িতে দোতালার ঘর। মণির সঙ্গে কথা বলছেন ঠাকুর। এমন সময় নরেন্দ্র এলেন। তিনি ঠাকুরকে সারারাত ধ্যান করবেন জানালেন। নরেন্দ্র চলে গেলেন মণির সঙ্গে অনেক কথা বলে। রাত নটার সময়ও ঠাকুর নরেন্দ্রর কথা বলতে লাগলেন। তিনি সবাইকে বললেন, 'নরেন্দ্রর অবস্থাটা দেখ এবার, আগে সাকার মানত না। এখন প্রাণের ভেতর কি রকম হাঁকপাঁক করছে। তবে শোন একটা গল্প। একদিন একজন তার গুরুকে জিজ্ঞেস করল, ভগবানকে কি করে পাওয়া যায়। গুরু বললে, আমার সঙ্গে চল, দেখিয়ে দি কি ভাবে ঈশ্বর পাবে। ভক্তকে সঙ্গে করে তিনি এক পুকুরে নিয়ে এলেন তারপরে পুকুরের জলে তাকে চুবিয়ে ধরলেন। খানিক ওই ভাবে রাখার পর শিষ্যকে জিজ্ঞেস করলেন, জলের ভেতর তোমার প্রাণ কেমন করছিল? উত্তরে ভক্ত জানাল, প্রাণ যায় যায় উপক্রম হয়েছিল। ঈশ্বরের জন্য যদি এমন প্রাণ আটুপাটু করে তবে জানবে তোমার দেখা পাবার সময় হয়েছে। পুবদিক লাল হলেই বোঝা যায় সূর্যদেব উঠবেন।'

পরদিন মণির সঙ্গে কথা বলছেন। মণি কি কথার পর বললেন, 'সংসারে থাকা খুব যন্ত্রণার।'

ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'নরক যন্ত্রণা। জন্ম থেকে এই যন্ত্রণা। দেখছ না মাগ-ছেলে নিয়ে মানুষের কি দুর্গতি।'

একটু বাদেই বললেন, 'কামিনী-কাঞ্চনই সংসার। দেখতে পাও না টাকা থাকলেই আঁচলে বাঁধতে ইচ্ছে করে।' ঠাকুরের কথায় দুজনেই হেসে উঠলেন। মণি বললেন, 'টাকা বার করতে অনেক হিসেব এসে পড়ে।' দুজনে আবার হেসে উঠলেন।

'মনে ধ্যান হলেও হয়, তাতেও সন্ন্যাসী। কিন্তু বাসনায় আগুন জ্বালাতে হবে।'

মণি হঠাৎ বললেন, 'বড়বাজারের মাড়োয়ারীদের পণ্ডিতজীকে বলেছিলেন—আপনার ভক্তি কামনা আছে। তাহলে ভক্তি কামনা কি কামনার মধ্যে নয়?'

'ঠিক তাই।' শ্রীরামকৃষ্ণ বোঝানোর জন্য বললেন, 'যেমন হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়। তাতে পিত্ত দমন হয়।'

অসুস্থ ঠাকুর কাশীপুরের বাগানেই রয়েছেন। সেদিন তাঁর শরীর খুবই খারাপ। ভক্তদের মধ্যে তাই খুশির জোয়ার নেই। দু-এক জন ভক্ত যদি দরকার হয় তাই রাত জেগে বসে আছেন। ঠাকুর ঘুমোচ্ছেন। জাগ্রত ভক্তরা ভাবছেন একি ঘুম না মহাযোগ! হঠাৎ ঠাকুর মাস্টারকে ইশারায় কাছে ডাকলেন। খুব কষ্টে আস্তে আস্তে তাঁকে বললেন, 'তোমরা কাঁদবে বলে এত কষ্ট সহ্য করছি, সবাই যদি বল এত কষ্ট—তাহলে এ দেহ যাক, তবেই দেহ যাবে।' একটু থামলেন। খানিকবাদে আবার বললেন, 'দেহের অসুখ, তা হবে—এ যে দেখছি পঞ্চভূতের দেহ!' গিরিশের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তাঁর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'ঈশ্বরীয় বহু রূপ দেখছি—' নিজেকে দেখিয়ে বলছেন, 'তাঁর মধ্যে এই রূপটিও চোখে পড়ছে।'

রাত কাটল এই ভাবে। সকালে ভক্তদের বলছেন গভীর অনুধ্যানের উপলব্ধির কথা। তিনি বললেন, 'কি দেখছি জান, তিনিই সব। মানুষ আর অন্যান্য প্রাণী যা কিছু দেখছি সবই

চামড়ার—তার ভেতর তিনিই হাত পা নাড়ছেন। যেমন একবার মোমের বাড়ি বাগান রাস্তা মানুষ গরু—সমস্ত কিছু মোমের দেখেছিলাম, দেখতে পাচ্ছি তিনিই কামার, তিনিই বলি আবার তিনিই হাড়িকাঠ হয়েছেন।' লাটু মহারাজের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, 'ঐ লোটো মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে—মনে হচ্ছে তিনিই মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন।'

মাঝে মাঝে থামছেন। কথা বলছেন। ভক্তদের প্রতি স্নেহকে ছড়িয়ে দিতে চাইছেন। একটু পরে বলছেন, 'এই দেহটা কিছুদিন থাকলে মানুষদের চৈতন্য হত'—একটু থেমে বললেন, 'কিন্তু তা থাকবে না।' ভক্তরা বুঝতে পারছেন না তিনি কি বলতে চাইছেন। নিজেই ব্যাখ্যা করে দিলেন, 'তা রাখবে না, সরল বোকা দেখে সব লোক পাছে ধরা পড়ে। একে এই কলিতে ধ্যান জপ নেই।'

রাখাল আবদার করে উঠলেন, 'আপনি বলুন যাতে আপনার শরীর থাকে।'

তিনি উত্তর দিলেন, 'সে ঈশ্বরের ইচ্ছে।'

নরেন্দ্র বললেন, 'আপনার ও ঈশ্বরের ইচ্ছে এক হয়ে গেছে।' একটু চুপ করে থেকে বলছেন, 'এখন দেখছি এক হয়ে গেছে। ননদিনীর ভয়ে শ্রীমতী কৃষ্ণকে বললেন, তুমি প্রাণের ভেতরে থাক। যখন আবার ব্যাকুল হয়ে কৃষ্ণকে দেখতে চাইলেন—এমনি সেই আকুলতা, যেমন বেড়াল আচড়-পাঁচর করে—তখন কিন্তু আর বেরয় না।' নিজের হৃদয়ে হাত দিয়ে ভক্তদের বলে উঠলেন, 'এর ভেতর দুজন রয়েছেন, যার একজন তিনি। আর একজন ভক্ত হয়ে আছে। যার হাত ভেঙেছিল। তারই এখন অসুখ করেছে। বুঝতে পেরেছ?' আপন মনে কথা। আপন মনে উত্তর, 'কাকেই বা বলব—কেই বা বুঝবে! তিনি অবতাররূপে মানুষ হয়ে ভক্তদের সঙ্গে আসেন। ভক্তরা তাঁর সঙ্গেই ফের চলে যায়।'

'তাই আপনি আমাদের ফেলে যাবেন না।' রাখাল বলে উঠল।

শ্রীরামকৃষ্ণ হাসছেন। কোথায় অসুখ! কোথায় যন্ত্রণা! হাসতে হাসতেই বলছেন, 'বাউলের দল হঠাৎ এল, নাচল, গান গাইল, হঠাৎই চলে গেল! এল গেল কেউ চিনতে পারল না'। ঠাকুরের সঙ্গে সবাই হেসে উঠল।

'দেহ ধারণ করলে কষ্ট থাকবেই। এক একবার ভাবি, আর যেন আসতে না হয়। নেমতন্ন খেয়ে খেয়ে বাড়ির কড়ার ডাল আর ভাল লাগে না। তবু যে দেহ ধারণ করা তা ভক্তর জন্য।'

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর স্নেহমাখানো দৃষ্টি দিয়ে নরেন্দ্রনাথকে দেখছেন। তাঁকে শুনিয়ে বলছেন এবার,'এক চণ্ডাল মাংসর ভার নিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় শঙ্করাচার্য গঙ্গা স্নান সেরে পথে ফিরছেন। চণ্ডাল হঠাৎ তাঁকে ছুঁয়ে দিল। বিরক্ত হয়ে শঙ্কারাচার্য বললেন, তুই আমায় ছুঁয়ে ফেললি! এর উত্তরে সে বলল, ঠাকুর আমিও তোমায় ছুঁই নি তুমিও আমায় ছোঁও নি। নিজেই বিচার করে দেখ। শুদ্ধ আত্মা নির্লিপ্ত। তিন গুণ—সত্ত্ব রজঃ তমঃ কোনো গুণে লিপ্ত নয়। ব্রহ্ম কেমন জানিস? যেমন বাতাস—দুর্গন্ধ সুগন্ধ সব তাতেই ভেসে আসছে। কিন্তু বাতাস নির্লিপ্ত।'

তিনি নরেন্দ্রকে বোঝাচ্ছেন। বিশেষ জ্ঞান দিচ্ছেন। 'শঙ্করাচার্য বিদ্যমায়া রেখেছিলেন। এই যে তুমি আর সবাই আমার জন্য ভাবছ—এই ভাবনাই বিদ্যামায়া! বিদ্যামায়া ধরে ধরে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। কেউ কেউ ত্যাগ করবার কথায় আমার ওপর রেগে যায়।' নরেন্দ্র বললেন।

'ত্যাগ দরকার।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন। তিনি নিজের শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দেখিয়ে বলছেন,'একটা জিনিসের পর আর একটা জিনিস যদি থাকে প্রথমটা না সরালে পরেরটা দেখা যায় না।'

'বুঝতে পেরেছি।' নরেন্দ্র উত্তর দিলেন।

খুব আস্তে ঠাকুর বললেন নরেন্দ্রকে, 'সেই-মা দেখলে আর কি কিছু দেখা যায়।'

নরেন্দ্র প্রশ্ন করলেন, 'সংসার ত্যাগ করতে হবেই?'

'যা বললাম—' ঠাকুর উত্তর দিলেন, 'সেই মা দেখলে কি আর কিছু দেখা যায়, সংসার-ফংসার?' শ্রীরামকৃষ্ণ থামলেন সামান্য। তারপর বললেন, 'তবে মনে ত্যাগ। এখানে যারা আসে কেউই সংসারী নয়। কারো কারো সামান্য ইচ্ছে ছিল, মেয়েমানুষের সঙ্গে থাকা। সেই ইচ্ছেটুকু হয়ে গেল।' তাঁর কথায় রাখাল মাস্টার সবাই হেসে উঠলেন।

নানা কথা বলে চলেছেন। ক্লান্তি নেই। হঠাৎ কথা বলতে বলতে নিজেকে দেখিয়ে বলছেন, 'দেখছি এর ভেতর থেকেই যা কিছু।' কথাটা বলেই প্রশ্ন করলেন, 'বুঝলি কিছু?'

উত্তর দিলেন নরেন্দ্রনাথ, 'যা কিছু পদার্থ সৃষ্টি হয়েছে সবই আপনার ভেতর থেকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন খুশিতে। রাখালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখেছিস!'

তাঁর এই আনন্দকে ধরে রাখবার জন্য নরেন্দ্র গান গেয়ে শোনাতে লাগলেন ঠাকুরকে। সকলেই সেই গানের ভাবে ও গভীরতায় মুগ্ধ হয়ে পড়লেন।

বুদ্ধগয়া থেকে ফিরে এসেছেন নরেন্দ্রনাথ। শ্রীরামকৃষ্ণ তখনো কাশীপুরের বাগানে বাস করছিলেন। নরেন্দ্র ঠাকুরের কাছে এসেছেন। বুদ্ধগয়ার কথা হচ্ছিল। মাস্টার নরেন্দ্রনাথকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বুদ্ধদেবের মত কি?'

নরেন্দ্রনাথ উত্তর দিলে, 'তপস্যান্তে তিনি কি পেয়েছিলেন তা মুখে কাউকে বলতে পারেন নি। তাই সকলে তাঁকে বলে তিনি নাকি নাস্তিক।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন ঠাকুর, 'নাস্তিক কেন? নাস্তিক মোটেই

নয়। মুখে বলতে পারেন নি ; বুদ্ধ কি তা জান ? বোধ-স্বরূপকে চিন্তা করে করে তাই হওয়া। বোধ-স্বরূপ হয়ে যাওয়া। এ তাঁরই খেলা, নতুন এক লীলা। তা বলে নাস্তিক কেন হতে যাবে। স্বরূপকে বোধ হওয়া মানে অস্তি আর নাস্তির মাঝখানের অবস্থা। এ অস্তি নাস্তি প্রকৃতির গুণ। যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে অস্তি নাস্তি ছাড়া।'

অন্য এক দিন। কাশীপুর বাগানবাড়ির ওপরের ঘরে বসে রয়েছেন পরমপুরুষ। চড়কের দিন। পাড়াতেই চড়ক হচ্ছে। একজনকে তিনি কিছু জিনিস কিনতে পাঠিয়েছেন। সেই ভক্ত ফিরে এল। তাকে দেখেই শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'এই কি আনলি ?'

ভক্ত বললেন, 'এক পয়সার বাতাসা, দু পয়সার বঁটি, দু পয়সাব হাতা—'

'ছুরি কই ?' ঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন।

'দু পয়সায় ছুরি দিলে না।' ভক্ত উত্তর দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, 'যা যা, শিগগির ছুরি আন।' সামান্য পার্থিব জিনিসে কি আগ্রহ। সন্ধ্যের পরে মণিকে হাতের আকারে দেখিয়ে বললেন, 'একটা পাথরবাটি আনবে। যাতে এক পো দুধ ধরে। সাদা পাথরের।' জাগতিক বস্তুর ওপর আকর্ষণ। তিনি যেন সংসারী মানুষের মতো মায়া নিয়ে আছেন।

পরের দিন মণিকে দেখেই আবার প্রশ্ন করলেন,'পাথরবাটি কই ?'

মণি তক্ষুনি পাথরবাটি আনবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। তখন তিনি বললেন, 'থাক থাক এখন থাক।' মণি শুনলেন না। তখুনি কলকাতা চলে গেলেন। দুপুরবেলা পাথরবাটি নিয়ে ফিরে এলেন। ঠাকুর সেই বাটি হাতে করে দেখতে লাগলেন। অন্যান্য নানা কথা হচ্ছে। তার ভেতরেই শ্রীরামকৃষ্ণ পাথরবাটি ধরে রয়েছেন।

সন্ন্যাসীর কোনো কিছু নিতে নেই চাইতে নেই। একবার ঠাকুর গল্প করেছিলেন মাস্টারের কাছে, 'এখন শিব সেজেছ পয়সা নেবার

উপায় নেই। গল্পটা খুলে বললেন। 'বহুরূপী শিব সেজে এক বাড়িতে গিয়েছিল। বাড়ির লোকেরা খুশি হয়ে তাকে একটা টাকা দিতে চাইল। কিন্তু সে তখন নিলে না। তারপর নিজের বাড়ি গিয়ে হাত-পা ধুয়ে শিবের সাজ মুছে এসে টাকাটি চাইলে। বাড়ির লোকেরা বলল, তখন যে নিলে না? তার উত্তরে সে বলল, তখন যে শিব সেজেছিলুম—শিব সন্ন্যাসী—টাকা ছোবার উপায় নেই।' অথচ ঠাকুর চেয়ে নিচ্ছেন। পাথরবাটি, ছুরি। অথচ তাঁর চেয়ে বড় সন্ন্যাসী আর কে! এর নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। ঈশ্বর-কোটির দোষ নেই। তাদের থাক আলাদা। তাদের সবটুকু লোক-শিক্ষার জন্য। তাদের কর্ম ইঙ্গিতবাহী।

মহিমাচরণ ও অন্যান্য ভক্তদের সঙ্গে বসে কথা বলছেন ঠাকুর। পুঁথিগত বিদ্যায় ধর্ম লাভ হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ সবাইকে বলছেন, 'শাস্ত্রর কত পড়বে? শুধু বিচারে কি হয়? আগে তাঁকে পাবার চেষ্টা করতে হবে। বই পড়ে কি জানার আছে? যতক্ষণ না কেউ হাটে পৌছয় ততক্ষণ দূর থেকে শুধু হো হো শব্দ শুনতে পায়। হাটে পোঁছলে অন্য রকম। সব কিছু চোখের সামনে স্পষ্ট। শুনতে পাবে, 'আলু লাও পয়সা দাও।'

সুরেন মিত্রর বাগানে মহোৎসবে শ্রীরামকৃষ্ণ গিয়েছেন। নানা ভক্ত সঙ্গে তিনি বসে আছেন। কয়েকজন ব্রাহ্ম ভক্তও রয়েছেন। উপস্থিত রয়েছেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদার। নানা কথা আলোচনা হচ্ছে। বলছেন ঠাকুর। শ্রোতা সকলে। তিনি প্রতাপ মজুমদার ও অন্য ভক্তদের বলছেন, 'দেখ আমি আমার এই বোধটাই অজ্ঞান। আমি করেছি অমুকে করেছে লোকে এই কথাই বলে, কেউ বলে না ঈশ্বর করছেন বা তার ইচ্ছায় হয়েছে, একে বলে অজ্ঞান। হে ভগবান কিছুই আমার নয়, সব তোমার জিনিস—স্ত্রী-পুত্র-পরিবার

এ সবও তোমার—এই কথা হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানীর। আমার আমার বলে ভালবাসার নাম হল মায়া। সবাইকে ভালবাসার নাম হল দয়া। শুধু ব্রাহ্ম সমাজের সবাইকে ভালবাসি এর নাম মায়া, শুধু দেশের লোককে ভালবাসি এর নামও মায়া। সব দেশের সবাইকে ভালবাসা সব ধর্মের লোককে ভালবাসা দয়া থেকে উৎপন্ন হয় ভক্তি থেকে মনে গেঁথে যায়। মায়াতে মানুষ আটকা পড়ে ঈশ্বর থেকে বিমুখ হয়। অথচ দয়া থেকে তাঁকে পাওয়া যায়। শুকদেব নারদ এঁরা দয়া রেখেছিলেন।' কি গভীর উদাহরণ! কি আন্তর্জাতিক মমত্ব বোধ! এই পৃথিবী, তার জীব, সমগ্র মানবজাতিই ঈশ্বর। আমি মানে ক্ষুদ্রতা নীচতা—বদ্ধ আবেষ্টনীতে ঘুরে বেড়ানো। আর তাঁর এই বোধ মানে সীমাহীন চরাচরে বৃহৎ এক অসীমে নিজেকে উত্তরণ করে দেওয়া।

একদিন কৃষ্ণদাস পালকে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা বলতে পার জীবনের উদ্দেশ্য কি?'

কৃষ্ণদাস উত্তর দিলেন, 'এই জগতের দুঃখ দূর করা, উপকার করা আমি তো এই মনে করি।'

উত্তর শুনে ঠাকুর বিরক্ত হয়ে বললেন,'তোমার ওরকম রাঁড়ীপুতি বুদ্ধি কেন? জগতের দুঃখনাশ তুমি কি করবে? জগৎ কি এতটুকু? বর্ষার সময়ে গঙ্গায় কাঁকড়া হয় তা জান? এ রকম অসংখ্য জগৎ আছে। এই জগৎ স্বামী যিনি তিনি সবার খবর রাখছেন। তাঁকে আগে জানাটাই জীবনের উদ্দেশ্য—তারপর অন্য যা হয় করো।'

কেশব সেনের সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁকে একদিন বললেন, 'দেখ যে মানুষ একটা ঠিক জানে সে আরেকটাও জানতে পারে। নিরাকার যে জানতে পারে সাকারও সে জানতে পারে। যে লোক পাড়াতেই গেল না সে কোনটা তেলিপাড়া কোনটা শ্যামপুকুর কি করে বুঝবে?'

দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়িতে বিজয়কৃষ্ণ এসেছেন। তাঁর সঙ্গে কথা

বলছেন ঠাকুর। অন্তরঙ্গ কথা। অমূল্য উপদেশ। কেশব সেনের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, 'কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করলে লোককে শিক্ষা দেওয়া চলে না। দেখলে না কেশব সেন শেষ পর্যন্ত পারল না। আখেরে তাঁর কি হল! তুমি নিজে কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে থেকে যদি কাউকে বলো, সংসার অনিত্য, ভগবানই একমাত্র বস্তু তোমার কথা কে শুনবে! অনেকেই শুনবে না। নিজের কাছে গুড়ের নাগরী রেখে অন্যকে উপদেশ দিচ্ছ গুড় খেও না। এই ভাবে হয় না। তাই চৈতন্যদেব সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।' একটু থেমে তিনি আরো বলতে লাগলেন, 'কেশব যদি ত্যাগী হতে পারত অনেক কাজ হত। ছাগলের গায়ে কোনো ক্ষত থাকলে তা দিয়ে আর ঠাকুর সেবা হয় না। ক্ষতওলা ছাগলকে বলি দেওয়া যায় না। ত্যাগী না হলে লোকশিক্ষার অধিকারী হওয়া যায় না। গেরস্থ লোকের কথা কজন আর শুনবে?'

উদাহরণ দিয়ে বোঝানোর জন্য নরেন্দ্রনাথের কথা তুললেন। নরেন্দ্রকে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'এই ছেলেটিকে দেখছ,—এখানে এক রকম। দুরন্ত ছেলে অথচ বাবার কাছে যখন বসে যেন জুজুটি। আবার চাঁদনীতে যখন খেলে তখন তার অন্য মূর্তি। এরা নিত্য সিদ্ধের থাক। কখনোই সংসারে বাঁধা পড়ে না। একটু বয়স বাড়লেই চৈতন্য হয় আর—তখন সংসার ছেড়ে ঈশ্বরের দিকে চলে যায়। শুধু জীবশিক্ষার জন্য এরা সংসারে আসে। সংসারের কোনো কিছুই এদের ভাল লাগে না—কামিনী-কাঞ্চনে কোনো সময় আসক্ত হয় না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ যা বুঝতেন সোজা সহজ ভাবে বুঝতেন। তাঁর প্রগাঢ় চৈতন্যবোধ তাই কোনো ব্যক্তিত্বের সামনেই অবনত হত না। কারণ তিনি যা জানতেন তা সত্য, যা বলতেন, তা স্থির। তাই বিদ্যাসাগরের মতো মানুষের সামনেও বলতে পেরেছিলেন, 'পাণ্ডিত্য

শুধু পাণ্ডিত্য দিয়ে কি হবে? শকুনি আকাশে অনেক উঁচুতে ওঠে। হলে কি হবে? তার দৃষ্টি থাকে ভাগাড়ের দিকে—সে খোঁজে কোথায় পচা-মড়া। তেমনি যে পণ্ডিত সে আগে শ্লোক আওড়াতে পারে কিন্তু তার মন কোথায়? যদি হরি পাদপদ্মে থাকে আমি তাকে মানি, যদি কামিনী-কাঞ্চনে থাকে তাহলে তাকে আমার খড়-কুটো বলে মনে হয়।'

দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রনাথ একদিন ঠাকুরকে দেখতে এসেছেন। সেই সময়ের নরেন্দ্রনাথের মধ্যে অনেক প্রশ্ন। বহু জিজ্ঞাসা। ঠাকুরের কাছে বাবুরাম ও ভবনাথও রয়েছেন। নরেন্দ্রনাথ দু-এক কথার পর ঘোষপাড়া ও পঞ্চনামী সম্বন্ধে কথা শুরু করলেন, 'তারা স্ত্রীলোককে নিয়ে কি ভাবে সাধনা করে?'

উত্তরে শ্রীরামকৃষ্ণ তাকে বললেন, 'তোর আর এসব কথা শুনে কাজ নেই। কর্তাভজা ঘোষপাড়া আর পঞ্চনামী আবার ভৈরব-ভৈরবীর, এরা সাধনা ঠিক মতো করতে পারে না, ফলে পতন হয়। ওসব রাস্তা নোংরা, খারাপ রাস্তা। ও পথে যাওয়া উচিত নয়—শুদ্ধ পবিত্র রাস্তা দিয়ে যাওয়াই ভাল। কাশীতে আমাকে ভৈরবী-চক্রে নিয়ে গিয়েছিল। একজন করে ভৈরব আরেকজন করে ভৈরবী। জোড়ায় জোড়ায়। তারা কারণ পান করতে বললে আমায়। শুনে বললাম, মা, আমি কারণ ছুঁতে পারি না। তারা খেতে লাগল। তারপর ভাবলাম, এইবার বুঝি জপ ধ্যান এই সব করবে। কোথায় কি! তারা মদ খেয়ে নাচতে লেগে গেল।'

নরেন্দ্রকে আবার বললেন, 'আমার ভাব কি জান, মাতৃভাব, সন্তান ভাব। মাতৃভাব সবচেয়ে পবিত্র, এতে কোনো বিপদ নেই। স্ত্রীভাব বীরভাব খুব শক্ত, মনকে ঠিক রাখা যায় না—পতন হয়। তোমরা আমার নিজের লোক, তোমাদের তাই বলছি, শেষ পর্যন্ত এই বুঝেছি, তিনি পূর্ণ আমি তাঁর অংশ বা খণ্ড মাত্র। তিনিই

প্রভু, আমি তার দাস। একেকবার এ কথাও ভাবি, আমিই তিনি আর তিনিই আমি। ভক্তিই হল সব কিছুর সার।'

দক্ষিণেশ্বরেই অন্য একদিন ভক্তদের কাছে তিনি বললেন, 'আমার সন্তান ভাব। অচলানন্দ এখানে এসে থাকত। সে খুব কারণ পান করত। স্ত্রীলোক নিয়ে সাধনাকে আমি ভাল বলতাম না। সে তাই আমাকে একদিন বলেছিল, বীর ভাবের সাধন কেন তুমি মানবে না? তন্ত্রে আছে। শিবের কলম মানবে না? তিনি অর্থাৎ শিব সন্তান ভাবও বলেছেন আবার বীরভাবও বলেছেন। উত্তরে আমি বললাম, কি জানি, আমার ও সব ভাল লাগে না।

'ওদেশে ভগী তেলীকে কর্তাভজার দলে দেখেছিলাম। ওই মেয়েছেলে নিয়ে সাধনা। আবার একটি পুরুষ না হলে মেয়েছেলের সাধন ভজন হবে না। সেই নির্দিষ্ট পুরুষটিকে ওরা বলে রাগকৃষ্ণ।'

রাখাল রাম প্রভৃতি ভক্তদের কাছেও শ্রীরামকৃষ্ণ এ বিষয়ে বলেছিলেন। একদিন তাঁদের তিনি বললেন, 'বৈষ্ণবচরণের কর্তাভজার মত ছিল। ওদের যখন শ্যামবাজারে গিয়েছিলাম তখন আমি ওদের বলেছিলাম, এ রকম সাধন আমার নয়, আমার মাতৃভাব। দেখতে পেলাম ওরা বড় বড় কথা বলে শুধু—আসলে ব্যভিচারে লিপ্ত। ঠাকুর পুজো প্রতিমা পুজো এ সব ওরা পছন্দ করে না, জীবন্ত মানুষ চায়। অনেকে রাধাতন্ত্রের মতে চলে। পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশতত্ত্ব মল-মূত্র রজ-বীজ এ সব তত্ত্ব। এ সাধন খুবই নোংরা সাধন। যেমন ধরো পায়খানার মধ্যে দিয়ে গিয়ে বাড়িতে ঢোকা।'

ঈশ্বরের নামে মদ্যপান ব্যভিচার তিনি সহ্য করতেন না। এই সব নষ্টামি ভণ্ডামিকে তিনি ঘৃণা করতেন। একদিন তাই কাশীপুর বাগানবাড়িতে অসুস্থ অবস্থায় নিভৃতে নরেন্দ্রনাথকে ডেকে বলেছিলেন, 'দেখ বাবা, এখানে যেন কোনো লোক কারণ পান না করে। ধর্মের দোহাই দিয়ে মদ্য পান করা ভাল নয়। আমি দেখেছি

যেখানে ওরকম কাজ হয়েছে সেখানে ভাল হয় নি।'

দক্ষিণেশ্বরে বাবুরাম ও আরো অন্যান্য ভক্তদের নিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বসে। ভক্তরা ঠাকুরের পদসেবা করছেন। তিনি এই পদসেবা দেখে হাসলেন। তারপর ভক্তদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমাদের এই কাজের অনেক মানে আছে।' নিজের বুকে হাত দিলেন তিনি। তারপর বলে উঠলেন, 'এর ভেতর যদি কিছু থাকে তাহলে এই কাজ করলে অজ্ঞান অবিদ্যা একেবারে দূর হবে।'

এবার তিনি গম্ভীর হয়ে গেলেন। কোনো গূঢ় কথা বলবার আগে প্রস্তুতি। সামান্য বাদেই বলতে লাগলেন,'দেখ এখানে বাইরেব কোনো লোক নেই তাই তোমাদের একটা গভীর কথা বলছি। সেদিন দেখলুম, আমার মধ্য থেকে বাইরে এসে সচ্চিদানন্দ রূপ পরিগ্রহ করে বললেন, যুগে যুগে আমিই অবতার। দেখলাম সত্ত্ব-গুণের ঐশ্বর্য মাখানো পূর্ণ তাঁর আবির্ভাব।'

গিরিশ ঘোষ তাঁর দু একজন বন্ধুসহ দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। তিনি কাঁদছেন। দুচোখ দিয়ে জলের ধারা। এ কান্না আকুলতার বিশ্বাসের ভালবাসার। শ্রীরামকৃষ্ণও স্নেহময় পিতার মতো তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন। গিরিশ এবার মাথা তুলে হাত জোর করে বললেন, 'তুমিই পূর্ণ ব্রহ্ম—তা যদি না হয় তো সব মিথ্যে। জীবনে আমার খুব দুঃখ রয়ে গেলে তোমার সেবা করতে পারলাম না। এক বছর তোমায় সেবা করব, এই বর দাও!'

বার বার তাঁকে ঈশ্বর বলায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন, 'ছি ও কথা বলতে নেই—ভক্তবৎ ন চ কৃষ্ণবৎ। তুমি যা ভাব তা ভাবতে পার—প্রত্যেকের গুরু তার কাছে ভগবান, তা বলে এসব কথা বলায় পাপ হয়।'

গিরিশ ভোলবার পাত্র নন। তবু তিনি বলতে লাগলেন, 'হে ভগবান আমাকে পবিত্রতা দাও, যাতে কখনোও সামান্য পাপ চিন্তা

মনে না আসে।'

'তুমি তো পবিত্রই—তোমার যে বিশ্বাসভক্তি।' ঠাকুর আকুল ভক্তকে সহজে আশ্বস্থ করলেন। গিরিশের বিশ্বাসের কথা অন্যত্রও বলেছেন। তিনি একদিন নরেন্দ্রকে কথায় কথায় বললেন, 'গিরিশ ঘোষ যা বলে তোর সঙ্গে কি মিলল ?'

'আমি কিছু বলি নি।' নরেন্দ্র উত্তর দিলেন, 'উনি অবতার বলে বিশ্বাস করেন।'

'কিন্তু খুব দৃঢ় বিশ্বাস, তা দেখেছিস?' শ্রীরামকৃষ্ণ আবার বললেন।

অন্য একদিনও নরেন্দ্রকে তিনি অবতার বিষয়ে কথা তুলে প্রশ্ন করলেন, 'লোকে যে আমাকে ঈশ্বরের অবতার বলে তাতে তোর কি বোধ হয় ?'

'অন্যের কথা শুনে আমি কোনো মতামত জানাব না।' নরেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন, 'নিজে যেদিন বুঝব, নিজের যখন বিশ্বাস হবে তখনই বলব।'

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথের কাছে আর কোনো দিন এ প্রসঙ্গ তোলেন নি। তিনি জানতেন নরেন্দ্রনাথকে। নিজের বিশ্বাস না হলে ওকে কেউ টলাতে পারবে না। কাশীপুরের বাগানবাড়িতে অসুস্থ ঠাকুর। রোগ যন্ত্রণায় কাতর। গলা ভাত পর্যন্ত গিলতে তাঁর কষ্ট। ভক্তরা সব সময়ে চারপাশে থেকে সেবা করছেন। নরেন্দ্রনাথও রয়েছেন ভক্তমধ্যে। একদিন নরেন্দ্রনাথ একাকী শ্রীরামকৃষ্ণের সামনে বসে ভাবছেন, যদি এই যন্ত্রণার ভেতরও তিনি বলেন যে আমি সেই ঈশ্বরের অবতার তাহলেই আমার বিশ্বাস হয়।

চকিতের মধ্যে কি যেন হয়ে গেল। উনি কি অন্তর্যামী! নরেন্দ্রনাথের মানসিক ভাবনার উত্তর দেবার জন্যই ঠাকুর বলে উঠলেন অবিস্মরণীয় বাণী, 'যে রাম সে কৃষ্ণ, ইদানীং সেই রামকৃষ্ণ-রূপে ভক্তের জন্য অবতীর্ণ।' নরেন্দ্রনাথ অবাক! এ কি শুনলেন!

একি শুনছেন ! তিনি অভিভূত হয় পড়লেন ঘটনার আকস্মিকতায় ।

ঠাকুরের ভক্ত অধরলাল সেন। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ভক্তের বাড়িতে ভগবান। শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বাড়িতে ভক্তসঙ্গে এলেন একদিন। গভীর ভালবাসেন ঠাকুর তাঁকে। অধরেরও তেমনি ভক্তি। শোভাবাজার থেকে প্রায় প্রতিদিন ঠাকুরকে দেখতে যেতেন। সারাদিন পরিশ্রান্তির পর এই আকুলতা তুলনারহিত। প্রতিদিন ছ-টাকা গাড়ি ভাড়া খরচা হত। প্রায় দিনই ঠাকুরের পদতলে উপস্থিত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন।

ভগবানও ভক্তের ডাকে সাড়া না দিয়ে পারতেন না। মাঝে মাঝেই শোভাবাজারের বাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণ আসতেন। ঠাকুরের উপস্থিতিতে সেখানে উৎসব মুখরিত হয়ে উঠত। অনেক দিন বাদে শোভাবাজারে একদিন এলেন ঠাকুর। তাঁকে অভ্যর্থনা করে অধর সেন বললেন, 'বহুদিন আপনি এ বাড়িতে আসেন নি, তাই চার-পাশে মালিন্য জমে উঠেছিল ! আজ আপনার পদার্পণে সব মলিনতা মুছে গিয়ে বাড়িটা হেসে উঠেছে। আজ ভগবানকে আমি ডেকে-ছিলাম। আমার চোখ দিয়ে জল পর্যন্ত বেরিয়ে এসেছিল।'

'বল কি গো !' শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তর দিকে স্নেহমধুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। একটু বাদেই শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলতে লাগলেন। এই সময় অধর কয়েক জন বন্ধু নিয়ে ঠাকুরের কাছে এসে বসলেন। সঙ্গীদের একজনকে দেখিয়ে তিনি বললেন, 'ইনি খুব পণ্ডিত লোক, অনেক বই-টই লিখেছেন। আপনাকে দেখতে এসেছেন। এঁর নাম বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।'

স্বভাবসিদ্ধ রসিক ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে হেসে বলে উঠলেন, 'বঙ্কিম ! তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো !'

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিলেন রহস্যপ্রিয়তার হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে, 'আর মহাশয়! জুতোর চোটে।' দুজনের রসঘন আলাপের সূত্রপাতে সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

ঠাকুর রসময় কথা শুরু করলেন জ্ঞানময় গভীরতায়। তিনি বললেন, 'না গো, শ্রীকৃষ্ণ প্রেমে বাঁকা হয়েছিলেন। রাধার প্রেমে ত্রিভঙ্গ হয়েছিলেন। কৃষ্ণর রূপের ব্যাখ্যা কেউ কেউ তাই করেছেন শ্রীরাধার প্রেমে ত্রিভঙ্গ। কালো কেন জান? আর চৌদ্দপো, অত ছোট কেন? যতক্ষণ ভগবান দূরে থাকেন ততক্ষণ তাঁকে কালো দেখায়। যেমন ধরো সমুদ্রের জল দূর থেকে নীলরঙের মনে হয়। কিন্তু জলের কাছে গেলেই ও হাতে তুললে আর কালো থাকে না। তখন ভারি পরিষ্কার, সাদা। সূর্য দূরে বলে খুব ছোট দেখতে লাগে, কাছে গেলে আর ছোট থাকে না। ভগবানের ঠিক রূপ জানতে পারলে তা আর কালোও থাকে না, ছোটও থাকে না। অবশ্য সে অনেক দূরের কথা, সমাধিস্থ না হলে হয় না। যতক্ষণ তুমি আমি বর্তমান ততক্ষণ তার প্রকাশ নানা রূপে। সব লীলা তাঁর। আমি তুমি থাকা মানেই বিভিন্ন নাম থাকা।

'পুরুষ হলেন শ্রীকৃষ্ণ, তার আদ্যাশক্তি শ্রীমতী। পুরুষ ও প্রকৃতি। এই যুগ্ম মূর্তির মানে কি জান? পুরুষ আর প্রকৃতিতে কোনো ভেদ নেই—দুয়ে মিলে অভিন্ন—এক না হলে আরেকজন থাকতে পারে না আবার অন্যজনও আরেকজনকে ছাড়া অসম্ভব। একজনের উল্লেখ করলেই সাথে সাথে অন্য জনকেও বুঝতে হবে। যেমন আগুন আর তার দহন ক্ষমতা। আগুনকে দাহিকা শক্তি ছাড়া ভাবাই অসম্ভব। তার জন্যই যুগল মূর্তিতে শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টি শ্রীমতীর প্রতি, তেমনি শ্রীমতীর দৃষ্টি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি। শ্রীমতীর গাত্রবর্ণ ফরসা, যেন বা বিদ্যুৎ, অঙ্গে নীলাম্বরী নীলকান্ত মণির ভূষণ। শ্রীমতী পায়ে নূপুর পরেছেন তাই শ্রীকৃষ্ণর পায়ে নূপুর অর্থাৎ

প্রকৃতি আর পুরুষের ভেতরে বাইরে মিল।'

ঠাকুর বক্তব্য পেশ করে থামলেন। অধর বঙ্কিম প্রভৃতিরা নিজেদের মধ্যে ইংরেজিতে ধীরে ধীরে কিছু বিষয়ে আলোচনা শুরু করলেন।

সামান্য শুনে ঠাকুর হেসে তাঁদের প্রতি বলে উঠলেন, 'কি গো, আপনারা ইংরেজীতে কি সব কথা বলছ?' ঠাকুরের ছেলেমানুষের মতো প্রশ্নে সবাই হেসে উঠলেন।

'কৃষ্ণপ্রেমের ব্যাখ্যার আলোচনা করছিলুম আর কি।' অধর উত্তর দিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ হেসে উঠলেন। তারপর সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, 'দেখ একটা কথা মনে পড়ায় আমার হাসি পাচ্ছে। শোন, তাহলে একটা গল্প শোনাই। এক নাপিত কামাতে বেরিয়েছিল। সে এক ভদ্রলোককে কামাচ্ছিল। কামাতে কামাতে ভদ্রলোকের সামান্য লেগে যায়। ফলে সে রেগে ড্যাম একথাটা বলে ওঠে। এদিকে নাপিত তো ড্যামের মানে জানে না, তখন সে ক্ষুরটুর ফেলে দিয়ে শীতকালেই জামার আস্তিন গুটিয়ে বলল, তুমি আমাকে ড্যাম বললে, এর মানে কি আগে বলো। সেই ভদ্রলোক তাকে থামাবার জন্য বলল, আরে তুই কামা না, ওর এমন কিছু মানে নেই, যাইহোক একটু সাবধানে কামাস। নাপিত মোটেই ছাড়বার পাত্র নয়, সে বলে উঠল, দেখ ড্যাম মানে যদি ভাল হয় তবে আমি ড্যাম আমার বাবা ড্যাম, এমন কি আমার চোদ্দপুরুষ সবাই ড্যাম। আর ওর মানে যদি খারাপ হয় তো তুমি ড্যাম তোমার বাবা ড্যাম, তোমার বাপ চোদ্দপুরুষ ড্যাম আর শুধু ড্যাম নয়— ড্যাম ড্যাম ড্যাম ড্যা-ড্যাম ড্যাম।' ঠাকুরের গল্প শুনে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। কি অনাবিল আনন্দ বিতরণ করতে পারেন সহজ গল্পে।

হাসি থামল সবাইর। বঙ্কিমচন্দ্র আলাপ শুরু করলেন। প্রথমেই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রশ্ন করলেন, 'আপনি নিজের প্রচার করেন না কেন?'

'প্রচার!' ঠাকুর কথাটা শুনেই হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন, 'ওসব অভিমানের কথা। মানুষ তো সামান্য জীব মাত্র। তিনিই প্রচার করবেন; যিনি চন্দ্র সূর্য সৃষ্টি করে এই জগতের প্রকাশ করেছেন। প্রচার করা কি চাড্ডিখানি কথা! তিনি আবির্ভূত হয়ে আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রচার হয় না। তবে হ্যাঁ, এমন হবে, তাঁর বিনা আদেশেই তুমি বলে যাচ্ছ, দিন দুই লোকে শুনবে তারপর ভুলে যাবে। হুজুগে ব্যাপার আর কি! যতক্ষণ তুমি বলবে ততক্ষণ লোকও বলবে বাঃ উনি বেশ কথা বলেছেন। যেই তুমি থামলে সব চুপচাপ। আর কোথাও কিছু নেই। এ ভারী মজার ব্যাপার। দুধের নিচে যতক্ষণ আগুনের জ্বাল আছে সেটুকু সময়ই দুধ ফোঁস করে ফুলে ওঠে। জ্বাল যেই মাত্র টেনে নেবে যেমন দুধ তেমন—ফোঁস-ফোঁসানি কমে গেল।

'তাছাড়াও আছে।' শ্রীরামকৃষ্ণ বোঝাচ্ছেন গভীর বোধকে তরল করে। 'সাধন করে নিজের ক্ষমতাকে বাড়াতে হয়, তা না হলে প্রচার হয় না। কথাটা ওই আর কি, আপনি শুতে জায়গা পায় না শঙ্করাকে ডাকে—ওরে শঙ্করা আয় আমার কাছে শুবি আয়।' শ্রীরামকৃষ্ণ হাসলেন। লঘুতা দিয়ে, পরিহাস করে সামান্য একটি শব্দের কি অসামান্য ব্যাখ্যা দিচ্ছেন।

'ঈশ্বর নিজে দেখা দিয়ে যদি আদেশ করেন তাহলেই প্রচার সমাধা হয়, লোকশিক্ষা হয়, তা না হলে খামোকা কে তোমার কথা শুনবে?'

সবাই স্থির হয়ে ঠাকুরের কথা শুনছেন। তিনি এবার বঙ্কিম-চন্দ্রকে বললেন, 'আপনি তো খুব বড় পণ্ডিত, বহু বই লিখেছেন,

আপনার মতে মানুষের কর্তব্য কি? তার সঙ্গে কি যাবে? পরকাল তো রয়েছে?'

'পরকাল আবার কি?' বঙ্কিমচন্দ্র জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ পরকাল আছে।' শ্রীরামকৃষ্ণ আবার গভীর বিষয়ের ব্যাখ্যা করছেন। 'জ্ঞানের পর আর অন্য কোনো লোকে যেতে হয় না। কিন্তু জ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত, ভগবান প্রাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে সংসারে আসতে হয়—এর হাত থেকে কোনো মতেই নিস্তার নেই। সুতরাং অজ্ঞান থাকা পর্যন্ত পরকাল আছে। জ্ঞান লাভ করে ঈশ্বর দর্শন হলেই মুক্তি—এরপর আর ঘুরে আসতে হয় না। সেদ্ধ করা ধান পুঁতলে আর গাছ হয় না। জ্ঞানের আগুনে কেউ সেদ্ধ হয়ে গেলে তাকে দিয়ে আর সৃষ্টির কাজ হয় না। সে সংসার করতে পারে না—কামিনী-কাঞ্চনে তার আসক্তি থাকে না। সেদ্ধ ধান ক্ষেতে পুঁতলে কি হবে?'

'তা বলে আগাছা দিয়েও তো কোনো কাজ হয় না।' বঙ্কিমচন্দ্রও হেসে উত্তর দিলেন।

'তাই বলে জ্ঞানী আগাছা নয়—' শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন, 'যে ভগবানের দেখা পেয়েছে সে অমৃত ফল লাভ করেছে, লাউ কুমড়ো নয়। তার আর জন্ম হয় না। পৃথিবী চন্দ্রলোক সূর্যলোক—কোথাও তাকে যেতে হয় না। তুমি তো পণ্ডিত ন্যায় পড় নি! বাঘের মতো ভয়ানক মানে এই নয় যে তার বাঘের ল্যাজ থাকবে বা হাঁড়ি মুখ থাকবে।' এবার সবাই হেসে উঠল।

ঠাকুর আবার কথা শুরু করলেন। 'কেশব সেনকে আমি ও কথাই বলেছিলাম। সে প্রশ্ন করেছিল, পরকাল আছে কি না। আমি এদিক ওদিক কোনোটাই বলি নি। বলেছিলাম, কুমোরেরা হাঁড়ি শুকোতে দেয় তার ভেতর পাকা কাঁচা দুরকম হাঁড়িই থাকে। কখনো গরু এলে হাঁড়ি মাড়িয়ে যায়। পাকা হাঁড়ি ভাঙলে কুমোর

সেগুলো ফেলে দেয়। কিন্তু কাঁচা হাঁড়ি ভাঙলে সেগুলো ফের ঘরে নিয়ে আসে, তা থেকে আবার নতুন হাঁড়ি তৈরি করে। তাই বলেছিলাম, যতক্ষণ কাঁচা থাকবে ততক্ষণ কুমোর ছাড়বে না। মানে জ্ঞান লাভ না হওয়া পর্যন্ত, ভগবান প্রাপ্তি না ঘটা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে সংসারে আসতে হবেই। তাঁকে পেলেই মুক্তি। তখন ছাড় পাওয়া যায়—তার দ্বারা মায়া সৃষ্টির কোনো কাজ আর হয় না। জ্ঞানী মায়াকে অতিক্রম করে, তাই মায়ার সংসারে সে আর কি করবে! অবশ্য এর মধ্যে কাউকে তিনি রেখে দেন লোকশিক্ষার জন্য। জ্ঞানী কখন শুধু বিদ্যা মায়া ভর করে থাকে। এবার আপনি বল, মানুষের কি কর্তব্য?'

হেসে হেসে বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, 'মানুষের কর্তব্য যদি বলেন তো আহার নিদ্রা আর মৈথুন।'

বিরক্ত হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। উত্তর দিলেন, 'তুমি তো ভীষণ ছ্যাঁচড়া! যা দিনরাত কর, মুখ দিয়ে তাই বেরুচ্ছে। লোক যা খায় তার ঢেকুর তোলে। মুলো খেলে মুলোর ঢেকুর ওঠে। ডাব খেলে ডাবের। রাতদিন কামিনী-কাঞ্চনের মধ্যে রয়েছে আর মুখ দিয়েও ওই কথা বেরচ্ছে। শুধু বিষয় চিন্তা করলে পাটোয়ারী স্বভাব হয়। মানুষ কপট হয়। আর ভগবানের কথা ভাবলে সরলতা জন্মে। ঈশ্বরের দেখা পেলে ওকথা কেউ আর বলবে না। ভগবানকে যে না ভাবে তার পাণ্ডিত্যে কি হবে। বিবেক-বৈরাগ্য না এলে সে পাণ্ডিত্য কি কাজে লাগবে? কেউ কেউ ভাবে, এরা পাগল, কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করছে। এরা বেহেড হয়েছে। আমরা কত শেয়না, খালি সুখ ভোগ করছি; কিন্তু সকালবেলা উঠেই পরের গু খেয়ে মরে। কাককে দেখ না, কত চালাক, খালি উড়ুর ফুরুর করে। অথচ যাঁরা ঈশ্বর চিন্তা করে, কামিনী-কাঞ্চন থেকে মোহ তাড়ানোর জন্য দিনরাত প্রার্থনা করে, যাদের কাছে বিষয় রস তেতো, বিস্বাদ, হরিপাদপদ্ম ছাড়া অন্য কোনো

সুখ নেই, তাদের স্বভাব হাঁসের মতোন। হাঁসের সামনে দুধজল মিশিয়ে দাও, জল বাদ দিয়ে হাঁস দুধ খাবে। আর হাঁসের গতি—সোজা একদিকে সে চলে যাবে। শুদ্ধ ভক্তের গতিও ওই রকম—কেবল ঈশ্বরমুখীন, সে আর কিছু চায় না।' ঠাকুর এক নাগাড়ে অনেকটা বলে একটু থামলেন। তারপর কি মনে হওয়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি বললেন, 'আপনি কিছু মনে করবেন না।'

'আজ্ঞে, মিষ্টি কথা শুনতে আমি আসি নি।' বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিলেন।

ঠাকুর এবার বিস্তৃত করলেন তাঁর গভীর প্রজ্ঞার ছায়া। তিনি বলতে লাগলেন, 'সংসার মানেই হল কামিনী-কাঞ্চন। এর নাম মায়া; যা কিনা ঈশ্বর দেখা তো দূরের কথা, তাঁকে ভাবতে পর্যন্ত দেয় না। দু'একটি ছেলে হলে পরিবারের সঙ্গে বোনের মতো থাকতে হয়, তার সঙ্গে সবসময় ভগবানের কথা আলোচনা করতে হয়। তাহলে দুজনের মনই ঈশ্বরের দিকে যাবে, স্ত্রী হয়ে উঠবে সহধর্মিণী। যতক্ষণ পশুভাব না যায় ততক্ষণ ঈশ্বরীয় আনন্দর আস্বাদন হয় না। তাই পশুভাব দূর করবার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাতে হয়। তিনি অন্তর্যামী, ব্যাকুল প্রার্থনা হলে শুনবেনই।' এই বলে ঠাকুর তাকালেন বঙ্কিমের দিকে। 'গঙ্গার ধারে বসে টাকা মাটি মাটি টাকা বলে জলে ফেলে দিয়েছি এই আমি।'

'টাকা মাটি বলেন কি!' বঙ্কিম উত্তর দিলেন, 'চারটে পয়সা থাকলে গরিবকে দেয়া যায়। টাকা যদি মাটি তাহলে দয়া পরোপকার করা হবে না?'

'দয়া পরোপকার!' ঠাকুর কথার সূত্র ধরে বলে উঠলেন, 'তোমার সাধ্য কি যে তুমি পরের উপকার করবে! মানুষের এত নপর-চপর কিন্তু যখন ঘুমোয় তখন যদি কেউ তার মুখে মুতে দেয় সে টের পায় না—মুখ ভেসে যায়। তখন অভিমান অহঙ্কার থাকে কোথায়!

সন্ন্যাসীর কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ করতেই হয়; সে তা আর গ্রহণ করতে পারে না। থুথু ফেলে তা আবার গিলতে নেই। মানুষ আবার কি দয়া করবে! দানধ্যান সবই রামের ইচ্ছে। প্রকৃত সন্ন্যাসী মনে বাইরে দুদিকেই ত্যাগ করবে। সে গুড় খায় না তাই তার কাছে গুড় রাখা ভাল নয়। কাছে গুড় রেখে সে অন্যকে তা খেতে বারণ করলে তা লোকে মানবে না।

'সংসারী লোকের টাকার প্রয়োজন, কারণ তাদের মাগ ছেলে রয়েছে। তাদের খাওয়াতে হবে। কিন্তু পাখি আর সন্ন্যাসী কোনো কিছুই জমায় না। তবু পাখির ছানা হলে তাকে মুখে করে খাবার আনতে হয়। তখন সেও যে সংসারী। সংসারী মানুষের টাকা চাই-ই পরিবারকে খাওয়াতে হয়।

'সেই সংসারীও যদি শুদ্ধ ভক্ত হয়ে ওঠে তখন সে আসক্তিহীন কাজ করে। কাজের যা কিছু ফল লাভ ক্ষয়ক্ষতি সে ঈশ্বরকে নিবেদন করে; পরিবর্তে শুধু ভক্তি চায়—অন্য কিছু না। একেই বলে নিষ্কাম কর্ম। সন্ন্যাসীকেও সব কাজ নিষ্কাম করতে হয়। তা বলে সে বিষয় কর্ম করে না।

'সংসারী মানুষ অনাসক্ত হয়ে যদি কাউকে কিছু দান করে সে তার নিজের উপকারের জন্য—পরোপকারের জন্য নয়। হরি জগতে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত—এর দ্বারা হরিসেবা হয়। হরিসেবা নিজেরই উপকার—পরোপকার নয়। একে বলে কর্মযোগ। এই কর্মযোগ ভগবান লাভের একটা পথ। কিন্তু সেই পথ খুবই কঠিন, কলিযুগের পক্ষে উপযুক্ত মোটেই নয়।

'পরের ভাল পরের উপকার সে তো ভগবান করছেন। যিনি জীবের প্রয়োজনে চন্দ্র-সূর্য বাপ-মা ফল-ফুল শস্য সব করেছেন। বাপ-মার ভেতর যে স্নেহ সে তো তাঁরই স্নেহ, জীবকে রক্ষার জন্য দিয়েছেন। দয়ালুর মধ্যে যে দয়া, সে তাঁরই করুণা। এও জীবকে

রক্ষার জন্য তাঁর দান। তুমি দয়া কর বা নাই কর, তিনি কোনো না কোনো সূত্রে তাঁর কাজ করবেন। ভগবানের কাজ কারো জন্যই আটকে থাকে না। তাই জীবের কর্তব্য তাঁর শরণাগত হওয়া, তাঁকে যাতে পাওয়া যায়, দেখা যায়, তার জন্যে আকুল হয়ে প্রার্থনা করা। তাঁকে লাভ করলে আর কিছু ভাল লাগে না। মিছরীর পানা পেলে তখন আর চিটে গুড়ের পানায় মন ওঠে না।'

শ্রীরামকৃষ্ণ জীবের কর্তব্য বোঝাচ্ছেন। গুরু রূপে সমস্ত অসার বস্তু ফেলে সার বস্তুকে তুলে দিচ্ছেন। অমৃতের পাত্র এগিয়ে ধরছেন ভক্তদের সামনে। এখন ভক্ত বুঝে নিক কি তার আরব্ধ কর্ম। তিনি বক্তা, বাকী সবই সম্মোহিত শ্রোতা। তাই তিনি পুনরায় বলছেন বঙ্কিমচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে, 'অনেকে ভাবে শাস্ত্র পাঠ না করলে ঈশ্বর পাওয়া যায় না। তারা ভাবে, আগে জগতের বিষয় জীবের খবর জানতে হয়। প্রথমে সায়েন্স পড়তে হয়।' সবাই হেসে উঠল এই কথায়। 'তাদের ধারণা, ভগবানের সৃষ্টির এসব না বুঝলে বুঝি ঈশ্বরকে জানতে পারা যায় না। তুমিই বলো না আগে সায়েন্স না আগে ভগবান ?'

'হ্যাঁ, তা ধরুন আগে পাঁচটা জানতে হয়, এই যেমন জগতের বিষয়। এদিককার কিছুটা জ্ঞান না হলে ভগবানকে জানব কি ভাবে ? আগে পড়াশুনো করে জেনে নিতে হয়।'

ঠাকুর বললেন, 'ওই তোমাদের এক কথা। আগে ভগবান, তারপর তাঁর সৃষ্টি। তাঁকে পেয়ে গেলে দরকার পড়লেই সব জানতে পারবে। তাঁকে জানলে তখন আর সামান্য জিনিস জানবার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। একথা বেদেও আছে। যতক্ষণ না মানুষটাকে দেখা যায় ততক্ষণ তার গুণের ব্যাপারে আলোচনা হয়। যেই সে কাছে আসে তখন ওই আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়। সবাই তাকে নিয়েই মেতে ওঠে। তার সঙ্গে কথা বলে মুগ্ধ হয়; অন্য বিষয় থাকে না।

আগে ঈশ্বর পরে জগৎ, প্রথমটা জানা হলে সব জানা যায়—এক-এর পেছনে পঞ্চাশটা শূন্য বসালে বহু হয়ে যায়; অথচ এক পুঁছে ফেললে সবই শূন্য। এক নিয়ে অনেক, আগে এক পরে বহু, তাই আগে ঈশ্বর তারপর তাঁর সৃষ্টি।

'তোমার প্রয়োজন ভগবানকে পাওয়া; তাহলে তুমি জগৎ সৃষ্টি সায়েন্স ফায়েন্স এসব বলছ কি জন্য? তুমি আম খাবে, বাগানে কত গাছ, কত ডাল কত পাতা এ খবরে কি প্রয়োজন? আম খেতে এসেছ আম খেয়ে যাও—এ জগতে মানুষ ভগবান পাবার জন্যই এসেছে; তা ভুলে নানা ব্যাপারে মন দেওয়া ভাল না। আম খাওয়াই মুখ্য যখন আম খেয়ে যাও।'

'আম পাব কোথায়?' বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন করলেন।

'আকুল হয়ে তাঁকে ডাকলে তিনি সাড়া দেবেন। হয়তো এমন সৎসঙ্গ জুটিয়ে দেবেন যার দ্বারা সুবিধে হবে। কেউ হয়তো বলবে এভাবে চল তাহলেই ভগবানকে পাবে।'

'গুরুর কথা বলছেন!' বঙ্কিমচন্দ্র হাসলেন, 'তিনি নিজে ভাল আমটি খেয়ে খারাপ আমটি আমায় দেবেন।'

'তা কেন!' ঠাকুর বলে উঠলেন, 'সবার পেটে পলুয়া কালিয়া হজম হয় না—যার যা সয় তাকে তাই দিতে হয়। গুরুবাক্যে বিশ্বাস চাই। সচ্চিদানন্দই গুরু, আবার গুরুই সচ্চিদানন্দ—বালকের মতো বিশ্বাস করলে ভগবান পাওয়া যায়। শেয়ানা বুদ্ধি পাটোয়ারী বিচার এসব থাকলে ঈশ্বর দূরঅস্ত। বিশ্বাসের সঙ্গে চাই সারল্য, কপটতা হলে চলবে না। অকপটের কাছে তিনি সহজ, কপটের কাছে তিনি ঢের দূর। শিশুর ব্যাকুলতায়, মা মা কান্নায় সব ফেলে মা যেমন দৌড়ে এসে পড়ে তেমনি ব্যাকুলতা চাই—তিনি অন্তর্যামী, যে পথেই যাও, ভুলপথ হলেও ক্ষতি নেই, ব্যাকুলতা খাঁটি হলে তিনিই ভাল পথে তুলে দেবেন।'

ব্রাহ্ম সমাজের ত্রৈলোক্য গান ধরলেন। গান শুনতে শুনতে শ্রীরামকৃষ্ণ বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন। পূর্ণ সমাধিস্থ। বঙ্কিমচন্দ্র এমন দেখেন নি। তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলে কাছে গিয়ে পলকহীন দেখছেন! একটু পরেই সামান্য চৈতন্য ফিরে পেয়েই তিনি উন্মত্ত হয়ে উদ্দাম নাচ শুরু করলেন। সে এক অদ্ভুত নাচ। ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সঙ্গীরা অবাক হয়ে গেলেন। এই তাহলে প্রেমানন্দ! ভগবানকে ভালবাসলে মানুষ এমন করে মেতে ওঠে! এর ভেতর তো কোনো ভান নেই, ঢং নেই। সর্বত্যাগী এই মহামানব মান নাম প্রচার আলোচনা কিছুই চান না। তাহলে এঁর জীবনের উদ্দেশ্য কি—কোনো কিছুতে মন না দিয়ে শুধু ঈশ্বর ভালবাসা! মার জন্য দিশেহারা হয়ে ব্যাকুলতা? ব্যাকুলতাই ভালবাসার উপায়। ঠিক, ভালবাসা জন্মালেই দর্শন হয়।

নাচ শেষ হলে ঠাকুর বসলেন। সবাই পুনরায় তাঁকে বেষ্টন করে। বঙ্কিমচন্দ্র এবার প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা ভক্তি কেমন করে হয়?'

'ব্যাকুলতা থেকে।' ঠাকুর উত্তর দিলেন। 'ব্যাকুলতাই সব—ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে সব হয়। তার থেকেই ঈশ্বর দর্শন হয়ে যায়। সূর্য ওঠার আগে যখন পুব আকাশ লাল হয় তখন বুঝতে কষ্ট হয় না সূর্য উঠতে দেরী নেই। তেমনি কারো প্রাণ ভগবানের জন্য ব্যাকুল উদ্বেল হয়ে উঠেছে দেখলেই বোঝা যায় ওই লোকের ঈশ্বর দর্শনের দেরী নেই। উপরে ভাসলে হয় না, একটু গভীরে ডুব দাও, গহীন জলের নিচে রয়েছে রত্নরাজি; আসল মানিক ভারী হয় জলে ভাসে না, তাই তাকে পেতে হলে গভীরে ডুব দিতে হয়।'

'কি করি বলুন—' বঙ্কিমচন্দ্র বলে উঠলেন, 'পেছনে শোলা বাঁধা আছে ডুবতে দেয় না।'

'কেউ কেউ কিন্তু ডুব দিতে চায় না।' ঠাকুর স্পষ্ট বললেন, 'তাদের ধারণা ঈশ্বর ঈশ্বর করে বাড়াবাড়ি করলে শেষ পর্যন্ত পাগল

হয়ে যাবে—শুধু তারা এটা বোঝে না সচ্চিদানন্দ অমৃতের সাগর। এ সাগরে ডুবলে মৃত্যু হয় না অমরত্ব প্রাপ্তি ঘটে। তাই বলছি ডুব দাও।'

বঙ্কিমচন্দ্র বিদায় নেবার জন্য প্রণাম করে বলে উঠলেন, 'আপনি যতটা বোকা ভেবেছেন আমি তত আহম্মক নই, বিদায়কালে একটি প্রার্থনা আছে, অনুগ্রহ করে একবার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবেন।'

'খুব ভাল কথা, এ তো ঈশ্বরের ইচ্ছে।' ঠাকুর উত্তর দিলেন।

'সেখানেও দেখবেন, ভক্ত রয়েছে।' বঙ্কিমচন্দ্র বলে উঠলেন।

রসিক অমৃতময় শ্রীরামকৃষ্ণ। মজা করতে তাঁর জুড়ি নেই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি হাসতে হাসতে জবাব দিলেন, 'কি রকম ভক্ত গো, ওই যারা গোপাল গোপাল কেশব কেশব বলেছিল, তাদের মতো!' সবাই হেসে উঠল অপূর্ব এই রসিকতায়।

একজন ভক্ত বলে উঠল, 'গোপাল গোপাল কেশব কেশব—কি ব্যাপার?'

ঠাকুর হাসছেন অনাবিল। হাসি থামিয়ে বললেন, 'এটা একটা গল্প। তবে শোন, এক জায়গায় এক স্যাঁকরার দোকান ছিল। দোকানের সবাই পরম বৈষ্ণব, গলায় মালা তিলক সেবা, সবার হাতে হরিনামের ঝুলি, মুখে হরিনাম, তাদের সাধু বললেই চলে শুধু পেটের জন্য স্যাঁকরার কাজ। মাগ ছেলেদের খাওয়াতে হবে। তা পরম বৈষ্ণব এই কথা শুনে বহু খদ্দের তাদের কাছে আসত। খদ্দেরদের ধারণা এখানে সোনারূপার গোলমাল হবে না। খদ্দের দোকানে ঢুকে দেখে মুখে তাদের হরিনাম আর বসে কাজকর্ম করে যাচ্ছে। খদ্দের যেই গিয়ে বসল অমনি একজন বলে উঠল, কেশব কেশব কেশব! একটু বাদেই অন্য একজন বলে উঠল, গোপাল গোপাল গোপাল! একটু কাজের কথাবার্তা হতে না হতেই আর একজন বলতে লাগল হরি হরি হরি! গয়না গড়াবার কথা যখন প্রায় শেষ তখন একজন

বলল, হর হর হর! এ রকম সব শুনে খদ্দের তো খুব নিশ্চিন্ত, বুঝতে পারল, এরা কখনো ঠকাবে না।

'কিন্তু আসল ব্যাপার কি জান? খদ্দের আসবার পর যে বলেছিল কেশব কেশব, তার মানে এরা সব কে? অর্থাৎ এই খদ্দেররা কে সব? যে বলল গোপাল গোপাল তার মানে এদের দেখছি গরুর পাল। পরবর্তী যে বলল হরি হরি তার মানে যখন দেখছি গরুর পাল তখন হরি অর্থাৎ হরণ করি। শেষ যে বলল হর হর, তার মানে যখন দেখছই গরুর পাল হরণ কর। এই তারা পরম ভক্ত সাধু।' গল্প শুনে সবাই হেসে উঠল মজা পেয়ে।

বহু ভক্তসহ কেশব সেন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দেখতে আসছেন। তিনি আসবার আগেই অনেক ব্রাহ্মভক্ত কালীবাড়ি এসে ঠাকুরের কাছে বসে পড়েছেন। একটি ফুলের তোড়া ও দুটি বেল হাতে কেশব সেন এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণর চরণ ছুঁয়ে কেশব জিনিস-গুলি কাছে নামিয়ে রাখলেন। কেশব সেন ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলেন। প্রতি নমস্কারে ঠাকুরও ভূমিষ্ঠ হলেন। তাঁর মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত আনন্দের হাসি। তিনি শুরু করলেন রসালাপ তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিমায়। হাসিমাখা কণ্ঠে বললেন, 'কেশব তুমি আমায় চাও কিন্তু তোমার চেলারা আমায় চায় না। তাই তাদের বলছিলাম এখন আমরা খচমচ করি তারপর গোবিন্দ আসবেন।' এবার ব্রাহ্মভক্ত, কেশবের শিষ্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঐ যে তোমাদের গোবিন্দ এয়েছেন—আমি তো এতক্ষণ খচমচ করছিলুম। তাতে জমবে কেন?'

সবাই হেসে উঠল। কি সরল অথচ গভীর রসিকতা। আবার তিনি বলছেন, 'গোবিন্দের দর্শন অত সহজে পাওয়া যায় না। কৃষ্ণযাত্রায় দেখনি নারদ ব্যাকুল হয়ে যখন 'প্রাণ হে গোবিন্দ মম

জীবন' বলে গান ধরেছেন তখন কৃষ্ণ এলেন।' রসিকতার মধ্য দিয়ে মূল উপলব্ধি, 'ব্যাকুল না হলে ভগবান দর্শন ঘটে না।' এবার কেশবের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি কিছু বলো—এরা তোমার কথা শুনতে চায়।'

কেশব সেন হাসলেন। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'এখানে কিছু বলা মানে কামারের কাছে ছুঁচ বেচতে আসা।'

হেসে ফেললেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু কথা ঘুরিয়ে দিলেন সুন্দর ভাবে। 'তবে কি জান, ভক্তের স্বভাব গাঁজাখোরের স্বভাব। তুমি একবার গাঁজার কলকেটা নিয়ে টানলে আমিও একবার টানলুম।' পুনরায় সবাই হেসে উঠল খুশিতে।

তখন বিকেল। কালীবাড়ির নবতে সানাই বাজছে। তাই শুনে ঠাকুর কেশবকে বললেন,'দেখছ কি সুন্দর বাজনা। তবে একজন কেবল পোঁ করছে আর একজন অন্য নানা সুরে রাগ রাগিণীর আলাপ করে যাচ্ছে। আমারও ওই ভাব। সাত ফোকর থাকতে আমি শুধু কেন পোঁ ধরব, কেন শুধু সোহহং সোহহং করব। আমিও বহুতর রাগ-রাগিনী বাজাব। শুধু ব্রহ্ম ব্রহ্ম কেন করব? শান্ত দাস্য বাৎসল্য সখ্য মধুর সব ভাবে তাঁকে ডাকব—আনন্দ করব, বিলাপে মেতে উঠব।' কি অপূর্ব বোঝাবার কায়দা। জ্ঞানী কেশব সেনকে কি সুন্দর উপমা তৈরি করে দিলেন। যার তুলনা করা যায় না।

অবাক হয়ে কেশব সেন কথাগুলো শুনলেন। নিজেকেই বলে উঠলেন তিনি, 'জ্ঞান ভক্তির এমন আশ্চর্য ব্যাখ্যা তো আর শুনি নি। প্রকাশ্যে ঠাকুরকে বললেন তিনি, 'আপনি আর কতদিন এমন করে গোপন হয়ে থাকবেন? ক্রমে যে এখানে লোকারণ্য হয়ে যাবে।'

'ও আবার তোমার কি কথা!' শ্রীরামকৃষ্ণ বলে উঠলেন, 'খাই দাই থাকি, তাঁর নাম করি—লোক জড় করা আমি জানি না। কে

জানে তোর গাঁই-গুঁই, বীরভূমের বামুন মুই। হনুমান বলেছিল, আমি বার নক্ষত্র ওসব বুঝি না শুধু এক রাম চিন্তা করি।'

'বেশ লোক জড় আমি করব।' কেশব সেন জবাব দিলেন, 'কিন্তু সবাইকে আপনার এখানে আসতে হবে।'

'আমি সকলের রেণুর রেণু।' ঠাকুরের বিনম্র উত্তর। 'যদি দয়া করে তাঁরা আসেন তো আসবেন।'

'আপনি যাই বলুন, আপনার আসা বিফল হবে না।' কেশব সেন স্থির। আপন বিশ্বাসে একান্ত স্থায়ী।

আলাপ চলছে আনন্দময় জগতে বসে যেন। তিনি বলছেন, শ্রোতা অন্যান্যরা। যত মত তত পথ—ঠাকুর তাই বলছেন, 'সব পথ দিয়েই তাঁকে লাভ করা যায়। এই ধর, যেমন তোমরা এখানে কেউ এসেছ হেঁটে, কেউ গাড়িতে, কেউবা জাহাজে—নিজের সুবিধেমতো, উদ্দেশ্য এক—এখানে আসা, তা কেউ আগে কেউ পরে। এই যা তফাৎ।' কেশবদের দিকে তাকালেন তিনি। চোখে গভীর বিশ্বাস আর মহৎ প্রজ্ঞা। 'যত উপাধি যাবে তত তিনি নিকট হবেন। উঁচু কোনো ঢিবিতে বৃষ্টির জল দাঁড়ায় না। খাল জমিতে জমে। তেমনি তাঁর কৃপাবাড়ি যেখানে অহঙ্কার সেখানে দাঁড়ায় না। তাই তাঁর কাছে দীনহীন থাকাই ভাল। খুব সতর্ক হতে হয়, পরিধেয় বস্ত্রেও গর্ব দেখা দেয়। পিলে রোগী, সেও কালো পেড়ে কাপড় পরে নিধুবাবুর টপ্পা গাইছে, তাও দেখেছি। পায়ে বুট জুতো ওমনি মুখে ইংরেজী বুলি। আধার যদি ছোট হয় তাহলে গেরুয়া পরলেও অহঙ্কার জন্মে; সামান্য ক্রটিতেই রাগ অভিমান।'

সন্ধ্যা সমাগত। আলো জ্বেলে দিল কেউ। এবার কিছু খাবার ব্যবস্থা। তাই দেখে কেশব সেন বলে উঠলেন, 'আজও কি মুড়ি নাকি?'

হেসে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ও হৃদু জানে।' প্রথমে মুড়ি এল।

পরে লুচি তরকারি। সব শেষ হতে রাত দশটা বাজল। ঠাকুর তখনো উপদেশ দিয়ে যাচ্ছেন। 'ভগবান পেলে সংসারে কিন্তু বেশ থাকা যায়। বুড়ি ছুঁয়ে তারপর যত ইচ্ছে খেলা কর না। লাভের পর ভক্ত হয় নির্লিপ্ত ; যেমন পাঁকাল মাছ।'

কথায় কথায় রাত এগারোটা বাজল। কেশবরা বিদায় ছিলেন।

সুরেন্দ্রর বাড়ি। সময় সন্ধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ সুরেন্দ্রকে কৃপা করে তার বাড়িতে এসেছেন। দোতলায় বৈঠকখানা ঘর ভক্তে পরিপূর্ণ, সুরেন্দ্রর বহু প্রতিবেশী। যেন বা অমৃতের হাট। মহেন্দ্র গোস্বামী ভক্তদের বললেন, 'এমন মহৎ জন আমি কখনো দেখি নি। এর মধ্যে যেসব ভাব তা মোটেই সাধারণ নয়।'

আত্মপ্রশংসা শুনেই ঠাকুর তাঁকে বাধা দিলেন, 'তোমার ওসব কি কথা! আমি অতি দীন হীন, আমি তাঁর দাসানুদাস ; কৃষ্ণই মহান।'

সুরেন্দ্র মালা এনে ঠাকুরকে পরাতে গেলেন। তিনি মালা গলায় না পরে হাতে দিয়ে পাশে ফেলে রাখলেন। এতে সুরেন্দ্রর অভিমান হল। তিনি বারান্দায় গিয়ে মনোমোহনের কাছে কেঁদে ফেললেন। কেঁদে কেঁদে বললেন, 'ঠাকুর তাঁর ভালবাসার মর্যাদা দিলেন না।'

ঘরের মধ্যে ত্রৈলোক্য গান শুরু করলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ মত্ত হলেন নৃত্যে। ফেলে দেওয়া মালা হাত বাড়িয়ে গলায় পরলেন। সুরেন্দ্র তাই দেখে আনন্দে ভেসে গেলেন। ঈশ্বর অহঙ্কার চূর্ণ করেন। অভিমান ভেঙে দেন। তিনি ভক্তের মনের কথা টের পান। তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। গান থামল এক সময়। ঠাকুর বসলেন পুনরায়। কথা বলছেন সকলের সঙ্গে। সুরেন্দ্রকে দেখে বললেন, 'ওগো আমাকে কিছু খাওয়াবে না?' তিনি যেন সুরেন্দ্রকে সর্বভাবে তৃপ্ত করতে চাইছেন।

আরেক দিন। এবার মনোমোহনের বাড়ি। গলির সামনে বসার

ঘরে ঠাকুরের পদার্পণ ঘটল। বসবার পর ঈশানের সঙ্গে কথা শুরু হল। ঈশান হঠাৎ বললেন, 'আপনি সংসার ত্যাগ করলেন কেন? শাস্ত্র বলছে সংসারই শ্রেষ্ঠ আশ্রম।'

'ভাল খারাপ জানি না; তিনি যা করান তাই করি। যা বলান তাই বলি।' শ্রীরামকৃষ্ণ জবাব দিলেন। 'সবাই যদি সংসার ছাড়ে তো ঈশ্বর বিরুদ্ধ কাজ সেটা।' ঈশান আবার বললেন।

'সবাই ত্যাগ করবে কেন?' শ্রীরামকৃষ্ণ এবার বললেন। 'আর তাঁর কি এই ইচ্ছে যে সব মানুষ শেয়াল কুকুরের মতো কামিনী-কাঞ্চনে মুখ জুবড়ে থাকবে? কোনটা তাঁর ইচ্ছে কোনটা নয় তুমি কি সব জেনেছ?' একটু থামলেন তিনি। এবার ঈশানকে বোঝাচ্ছেন। 'তাঁর ইচ্ছে সংসার করা তুমি বলছ। যখন স্ত্রী পুত্র মারা যায় তখন ঈশ্বরের ইচ্ছে দেখতে পাও না কেন? যখন খেতে পাও না—দারিদ্র্য—তখন ভগবানের ইচ্ছেয় চোখ পড়ে না?' হাসছেন তিনি। 'তাঁর কি ইচ্ছে মায়ায় তা দেখা যায় না। তাঁর মায়াতেই অনিত্যকে নিত্য বোধ হয় আবার নিত্যকে অনিত্য। সবই ভগবানের মায়া। তাতেই আমি কর্তা এই ভাব—আমার স্ত্রী-পুত্র—সব, সবকিছু। মায়ার মধ্যে দুই-ই থাকে। বিদ্যা অবিদ্যা। তাঁর কৃপায় যিনি মায়ার অতীত তাঁর কাছে বিদ্যা অবিদ্যা সব সমান। সংসার আশ্রম, তবে সে ভোগের আশ্রম। তা সবাই কেন ত্যাগ করবে? জোর করে ত্যাগ হয় না। এক ধরনের বৈরাগ্য আছে তাকে বলে মর্কট বৈরাগ্য। রাঁড়ী পুতি যেমন। মা সুতো কেটে খায়। ছেলের কি কাজ ছিল, সে কাজে গেল। বৈরাগ্য হল, গেরুয়া পরল। কাশীতে গেল। কিছুদিন বাদেই চিঠি দিল, আমি একটা কাজ পেয়েছি। দশ টাকা মাইনে। ওর ভেতরেই সোনার আংটি জামা কেনবার চেষ্টা, ভোগের বাসনা কোথায় যাবে?'

ভাগবৎ পাঠ হল। পাঠ শেষ হলে শ্রীরামকৃষ্ণ কথা শুরু করলেন।

ইতিমধ্যেই কেশব সেন এসেছেন। ঠাকুর বলতে লাগলেন, 'সংসারে কাজ খুব শক্ত,বনবন করে ঘুরলে যেমন মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। কিন্তু খুঁটি ধরে ঘুরলে আর ভয় থাকে না। কাজ করে যাও। খুঁটি ধরে থাক; খুঁটি হল ঈশ্বর—তাঁকে ভুলেও ছেড় না। যদি বলো, যখন এত কষ্টের সংসার তখন উপায় কি। একমাত্র উপায় অভ্যাসযোগ।'

উঠোনে গান শুরু হল। গান শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ আনন্দে মেতে উঠলেন। তিনি নাচতে লাগলেন ভক্তদের সঙ্গে করে। নাচ থামলে পুনবায সংসারে থেকে ধর্ম বজায় রাখবার বিষয়ে বলতে লাগলেন। 'যারা সংসারে থেকেও তাঁকে ডাকতে পারে তারা বীরভক্ত। বলতে পার কাজটা মোটেই সহজ নয়। তা বলে কঠিন হলেও ভগবানের দয়ায কি না হয়। অসম্ভব সম্ভব হতে পারে।'

এবপর জলযোগের আয়োজন। সমস্ত ভক্তসহ ঠাকুর অন্তঃপুরে চললেন সানন্দে ভক্তকে কৃপা করতে। খাবার পর বিদায় গ্রহণ, শ্রীরামকৃষ্ণ বিদায় নিলেন সকলকে পরিতৃপ্ত করে।

ঠনঠনেতে বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রীটে রাজেন্দ্র মিত্র থাকতেন। রাজেন্দ্র মিত্র উৎসবের আয়োজন করেছেন। ঠাকুর সেই উৎসবে যাবেন। কেশবচন্দ্র সেন ও অন্যান্য ব্রাহ্ম ভক্তগণ নিমন্ত্রিত। উৎসবের আগে একদিন রাজেন্দ্রবাবু কেশব সেনের সঙ্গে কথা বলছেন। যে ঘরে কথা হচ্ছে সেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একখানা ছবি টাঙান। সেই ছবি দেখে রাজেন্দ্র মিত্র বললেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসকে অনেকে বলেন চৈতন্যের অবতার।'

'হ্যাঁ, এমন সমাধি কারো ভেতর দেখা যায় না। মহম্মদ যীশুখ্রীস্ট চৈতন্য এঁদের হত শোনা যায়।' কেশবচন্দ্র উত্তর দিলেন।

রাজেন্দ্র মিত্রর বাড়ি যাবার জন্য মনোমোহনের বাড়ি এলেন। সেখান থেকে সুরেন্দ্র প্রভৃতির সঙ্গে বেঙ্গল স্টুডিও হয়ে রাজেন্দ্রর

বাড়ি পৌঁছলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বসে কথা শুরু করলেন। সংসারে থেকেও সাধন সম্ভব এ কথাই আবার বলছেন। তিনি বলতে লাগলেন, 'সংসারে কেন হবে না—তবে খুবই শক্ত। আজ বাগবাজার পুলের ওপর দিয়ে এলাম। কত বাঁধনে বেঁধেছে। একটা বাঁধন ছিঁড়লেও পুলের কিছু হবে না, কেননা বহু শেকল দিয়ে বাঁধা—তারা টেনে ধরবে। তেমনি সংসারীদের বাঁধন অনেক। সে বন্ধনের হাত থেকে ভগবান ছাড়া আর কেউ উদ্ধার করতে পারে না।'

'তাহলে সংসারীরা কি করবে?' জনৈক ভক্ত জানতে চাইল।

'একমাত্র গুরুবাক্যে বিশ্বাস—' শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'গুরুর কথায় খুঁটি ধরে ঘুরে যাও—সংসারের কাজ করে যাও। গুরুকে মানুষ মনে করো না, তিনিই সচ্চিদানন্দ স্বরূপ গুরুরূপে তিনি আসেন। তাঁর কৃপায় ঈশ্বরলাভ হয়। সরল বিশ্বাসে কি না হয়। একটা গল্প বলি তোমাদের।' ঠাকুর গল্প শোনাতে লাগলেন। 'এক গুরু পুত্রের অন্নপ্রাশন হবে—শিষ্যরা যে যেমন পারে উৎসবের আয়োজন করছে। এক শিষ্যা, গরিব বিধবা। তার একটি গরু ছিল, সে এক ঘটি দুধ এনেছে। গুরু ভেবেছিলেন ওই বিধবা সমস্ত দুধের ভার নেবে। এক ঘটি দুধ তাই সে ফেলে দিয়ে বললে, তুই জলে ডুবে মরতে পারিস নি?

'বিধবা ভাবল, এটাই গুরুর আদেশ—সে নদীতে তাই ডুবে মরতে গেল। তখন নারায়ণ দেখা দিলেন, সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, এই পাত্রটা নাও, এতে দই আছে, যত ঢালবে তত বেরবে, তোমার গুরু খুশি হবেন। গুরু তো সেই পাত্র দেখে অবাক। তার চেয়েও অবাক বিধবার মুখে সব খবর শুনে। গুরু বললেন, তুমি যদি আমাকে নারায়ণ না দেখাও তো ওই নদীতেই প্রাণত্যাগ করব। দুজনে নদীতীরে গেল। নারায়ণ আবার এলেন। কিন্তু গুরু দেখতে পেলেন না। তাই দেখে বিধবা নারায়ণকে বললেন, আপনি যদি গুরুদেবকে দেখা না দেন—তিনি প্রাণত্যাগ করলে আমিও আর দেহ রাখব না। তখন নারায়ণ

গুরুকে একবার দেখা দিলেন। দেখ তাহলে গুরু বিশ্বাস থাকলে নিজেরও দেখা হয় গুরুরও দর্শন হয়। গুরু যে নাম দেবেন বিশ্বাস ভরে সে নামটি নিয়ে সাধনা করে যেতে হয়। যে শামুকের মধ্যে মুক্তো তৈরি হয়, সেই শামুক স্বাতী নক্ষত্রের জলের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকে। জল পড়লেই গভীর জলে ডুব দেয় যতদিন না মুক্তো তৈরি হবে।'

গল্পটি শেষ করে আবার অন্য কথায় গেলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। মজা করবার জন্য বলে উঠলেন, 'ব্রাহ্মসভা না শোভা? ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত উপাসনা হয়, বেশ ভাল কথা, কিন্তু একটু গভীরে ডুব দিতে হয়। লেকচার উপাসনায় কিছু হয় না। তাঁকে ডাকতে হয়। যাতে ভোগাসক্তি দূর হয়ে তাঁর পায়ে শুদ্ধাভক্তি জন্মে। হাতির দাঁত জান দু রকমের—ভেতরের ও বাইরের। বাইরের দাঁত শুধু শোভার জন্য, ভেতরের দাঁতে হাতি খায়। তেমনি ভেতরে কামিনী-কাঞ্চন ভোগ করলে ভক্তির ক্ষতি হয়। বাইরে লেকচার দিলে কি হবে—ও তো শোভা। ভোগাসক্তি শেষ হলে শরীর ত্যাগের সময় ভগবানের কথাই মনে আসবে। তা না হলে স্ত্রী পুত্র ঘর অর্থ যশ এই সব। অভ্যেস করে পাখি রাধাকৃষ্ণ বলে কিন্তু বেড়াল ধরলে ক্যাঁ ক্যাঁ করে ওঠে। তাই সর্বদা অভ্যেস চাই।'

একটু বাদে কেশবচন্দ্র সেন এলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে কথায় মেতে উঠলেন স্টুডিয়োয় গিয়ে ক্যামেরা, ফটো তোলার কায়দা যা দেখে এসেছেন তাই বললেন। বলতে গিয়ে জানালেন, 'একটা জিনিস দেখলুম, শুধু কাঁচে ছবি ওঠে না। এক পিঠে কালি মাখিয়ে নিতে হয়। দেখ ঠিক সে রকম ভগবানের নাম শুনলে হয় না—এই শোনে এই ভুলে যায়। তাই যদি ভেতরে ভক্তিরূপ কালি মাখান থাকে তবে সে কথাগুলো ছবি হয়ে যায়।'

সিমলা ব্রাহ্মসমাজে বাৎসরিক মিলনোৎসব। শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন।

উৎসব হচ্ছে জ্ঞান চৌধুরীর বাড়িতে। অনুষ্ঠান শুরু হল কিছু পাঠ দিয়ে। সন্ধ্যের সময় গেরুয়াধারী গৌরী পণ্ডিত এসে হাজির। তিনি এসেই বলে উঠলেন, 'কোথায় গো পরমহংসবাবু ?' একটু বাদেই কেশব সেনও উপস্থিত। সেই সংসারে থেকে পরমার্থ প্রাপ্তি নিয়ে কথা শুরু হল।

'হবে না কেন ?' শ্রীরামকৃষ্ণ বরাভয় হাসি হাসলেন। 'ব্যাপারটা কি জান ? মন নিজের কাছে নেই। মন যদি নিজের কাছে থাকে তবে তো তা ভগবানকে অর্পণ করবে। মন বাঁধা দিয়েছ কামিনী-কাঞ্চনে। তাই তো সব সময় সাধু-সঙ্গ প্রয়োজন। মন নিজের বশে এলে তবেই সাধন ভজন হয়। নির্জনে দিন রাত তাঁর চিন্তা কর নয়তো সাধুসঙ্গ। মন একা থাকলেই আস্তে আস্তে শুকনো হয়ে আসে। যেমন ধরো, এক ভাঁড় জল আলাদা করে রাখলে তা শুকিয়ে যাবে ; কিন্তু গঙ্গাজলের ভেতর ওই ভাঁড় চুবিয়ে রাখলে শুকুবে না। কামারশালে আগুনে তেতে লোহা লাল হল, আলাদা করো, যেমন কালো আবার তেমন। তাই লোহাকে মধ্যে মধ্যে হাপরে দিতে হয়। একেবারে আমি যায় না। এই যায় এই ফিরে আসে। ঈশ্বর দর্শনের পর তিনি যে আমি রেখে দেন তা পাকা আমি। যেমন পরশমণির ছোঁয়া লাগা তরোয়াল। সোনা হয়ে গেছে। তা দিয়ে হিংসের কাজ আর হয় না।'

কথা বলতে বলতে উপাসনার সময় এসে গেল। কেশব সেন উঠে গেলেন। উপাসনার মধ্যেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। একটু পরে তিনি স্বাভাবিক হয়ে এলেন। উপাসনান্তে জলযোগ হল। তারপর আবার কথার আসর। কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর হঠাৎ বলে উঠলেন কেশব সেনকে, 'ছেলের বিয়ের বিদেয় কেন পাঠিয়েছে, ওসব দিয়ে আমি কি করব ? ফিরিয়ে নিয়ে এস।' একটু থেমে আবার বললেন, 'আমার নাম কাগজে ছাপছ

কেন? কাগজে ছাপিয়ে, বই লিখে কাউকে বড় করা যায় না। ভগবান যাঁকে বড় করেন বনে থাকলেও সবাই তার খবর পায়। যেমন গভীর বনে ফুল ফুটলে মৌমাছি খুঁজে ঠিক তার কাছে যায়। অন্য মাছি টের পায় না। মানুষ কি করবে? মানুষের মুখ চেয়ো না। লোক পোক! যে মুখে ভাল কথা বলছে সেই মুখেই আবার খারাপ কথা বলছে। মান্যগণ্য হবার সাধ আমার নেই। যেন দীনের দীন হীনের হীন হয়েই থাকতে পারি।'

এই শ্রীরামকৃষ্ণ। সর্বসাধারণ্যে, জনগণেশের মধ্যে তিনি একক, একজন। কোনো উচ্চাভিলাষ নেই। জাগতিক কোনো আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল না। দীনের উত্তরণ। সর্ব সাধারণের সার্বিক আত্মিক গঠনকে মজবুত করে তুলে ঈশ্বরমুখীন করা। যে ভাবে হোক, যে পথে হোক। সব পথ সব মত তাই তাঁর কাছে গ্রহণীয়। সকল মানুষই সমান আদরের। এই পৃথিবী, এর সর্ব জীবই এক ঈশ্বরের সৃষ্টি।

এমন মজার সাধক, অদ্ভুত নির্বিকল্প নির্লিপ্ত মহাপুরুষ এক অনন্য ব্যতিক্রম। শিক্ষিত আত্মাভিমানী বাঙালীর চোখের সামনে নিরহঙ্কার এক দৃষ্টান্ত হয়ে তিনি লীলা করে গেছেন নিজের জীবনকে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ করে। সামান্য গল্পকে, উপমাকে অসামান্যতায় পরিণত করে আপাত অশিক্ষিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ যে অমৃতকথনের রসভাণ্ডার খুলে ধরেছিলেন; কোনো ধর্মে সাধকের জীবন চরিতে তাঁর তুলনা নেই। তিনি অতুলনীয় তাঁর রসসৃষ্টিতে, তিনি অনতিক্রম্য তার রসময় গভীর ধী-ক্ষমতায়। যেই রসে মন ভেজানর জন্য তদানীন্তন শিক্ষিত বঙ্গ-সন্তানরা পঙ্গপালের মতো তাঁর পায়ে প্রণত হয়েছিল। সবাইকে তিনি কোল দিয়েছেন, সকলকে তিনি আলো দেখিয়েছেন অপূর্ব জ্যোতিচ্ছটায়। তাই তাঁর মানস-সন্তান বিবেকানন্দ তাঁর বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, 'শঙ্করের প্রজ্ঞা ও চৈতন্যের হৃদয় নিয়ে যে মহাপুরুষ

এই পৃথিবীর চরম প্রয়োজনে এসেছিলেন তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণ। আমার সৌভাগ্য যে আমি সেই মহান সাধকের পদতলে স্থান পেয়েছিলাম। যিনি ভারতীয় সাধকদের মধ্যে পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছিলেন। আজ হাজার হাজার ব্যক্তি দ্বারা তিনি পূজিত হচ্ছেন, আগামী ভবিষ্যতে কোটি কোটি বিশ্ববাসী তাঁর শরণাগত হবে।' বিবেকানন্দর সেই বাণী আজ ফলিত সত্য। এমন রসিক, রসবেত্তা গুরু যে এই পৃথিবীর বুকে দ্বিতীয়জন আর আসেন নি। কথায় উপমায় জ্ঞানে বিশ্বাসে ভক্তিতে গভীরতায় সমজদারীতে তাঁর সমকক্ষ অন্য কোনো মানুষ নেই বলেই তিনি অতি-মানুষ। তিনি পরমপুরুষ—রসঘন সচ্চিদানন্দ।

ইংরাজী ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ আগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর মর্ত্যলীলা সংবরণ করলেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে থেকেই তিনি ক্যান্সার রোগে অশেষ যন্ত্রণা পেয়েছেন। তবু সাধারণ মানুষের মতোই সেই যন্ত্রণা সহ্য করে গেছেন। এও তাঁর মহৎ জীবনের আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইচ্ছে করলেই রোগ যন্ত্রণা থেকে তিনি মুক্তি পেতে পারতেন কিন্তু তা ঈশ্বর নির্ধারিত নয় বলেই সে পথে যান নি। তিনি কর্মে ছিলেন বিশ্বাসী, অলৌকিকত্বে নয়। ও দিয়ে চমক দেওয়া যায় মানুষের সার্বিক উন্নতি করা যায় না। যতদিন জীবন ধারণ করেছেন ততদিন রসবেত্তা হয়েই লীলা করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ, ভক্তদের শরণাগতদের মাতিয়েছেন ভক্তি রসধারায়। তাই তিদি ছিলেন রসময় —অমৃত রসের কারবারী। আজ সারা জগৎ তাঁর সেই অমৃতরস আস্বাদনে উন্মুখ। যত দিন যাবে ততই এই রসস্রোত পরিপ্লাবিত করবে বিশ্বকে।

সমাপ্ত